ভাঙাগড়ার পালা

শক্তিপদ রাজগুরু

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাঃ লিঃ
কলিকাতা ৭৩

প্রকাশক :
নিভা মুখোপাধ্যায়
ম্যানেজিং ডিরেক্টার
এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ ১লা বৈশাখ ১৩৬৪

প্রচ্ছদ শিল্পী : শ্রীসুধীর মৈত্র
ব্লক : স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোঃ

মুদ্রাকর :
শ্রীমন্মথনাথ পান
নবীন সরস্বতী প্রেস
১৭, ভীম ঘোষ লেন
কলিকাতা ৭০০০০৬

শ্রীমতী আশারানী চট্টোপাধ্যায়
শ্রদ্ধাভাজনীয়াসু

এক নজরেই জায়গাটাকে দেখে চোখে লাগে বিজ্ঞানের। বড় রাস্তাটা চলে গেছে চড়াই-উৎরাই বেয়ে সামনের রুক্ষ প্রান্তরের বুক চিরে। ওদিকে বেশ কয়েকটা পাহাড় বনের সবুজ দাক্ষিণ্য বুকে নিয়ে এ ওর ঘাড়ে পড়ে যেন দুর্ভেদ্য প্রাচীর রচনা করেছে দিগন্তে। পথটা ওই পাহাড়ের বুক চিরে চলে গেছে দূরে-বহুদূরে—

পথের দুদিকে প্রাচীন অর্জুন অশ্বত্থ শিশু শিরীষ গাছের সারি। ওদের বয়স দেখেই রাস্তার বয়সটা অনুমান করা যায়।

ওই রাস্তা থেকেই দেখা যায় এদিকে ছায়াঘন ছোট বড় বাংলো। চড়াই-এর উপর গড়ে উঠেছে ওই কারখানা শহরের বাংলো। ইংরেজ আমলের বাংলোগুলো।

বড় রাস্তা থেকে পথটা কিছুটা ফাঁক। প্রান্তরের বুক চিরে এসে ওই বাংলো বসতে ঢুকেছে। পথের দুদিকে সাজানো বাংলো। গাছগাছালি ফুলের অভাব নেই। প্রতিটি বাংলোই তার বাসিন্দার পদমর্যাদার মতো সাজানো।

এরা কেউ কারখানার ইঞ্জিনিয়ার, কেউ মেজ সেজ ছোট পর্যায়ের। তাদের বাংলো দেখলেই পদমর্যাদার কিছুটা পরিচয় মেলে।

ওদের বাংলোগুলোও গাছে ঘেরা। আর বড় সাহেব, ম্যানেজার—ওয়ার্কস ম্যানেজার ইত্যাদির বাংলোগুলোর আয়তন—সাজের বাহার আরও বেশি।

বিজন এখানে এর আগেও এসেছিল দু'একবার ওর-কাকার কাছে। কাকা এখানের পুরানো কর্মচারী। অবিনাশবাবু তখনকার দিনে হাওড়ার কোনো কারখানায় ঢালাই সেকশনে কাজ করতেন। ম্যাট্রিক পাস করে টেকনিক্যাল স্কুলে দু বছরের ডিপ্লোমা করে ওই চাকরি পান। সেখান থেকে চেষ্টা চরিত্র করে, শিয়ালডাঙার এই কারখানায় চাকরি পেয়ে কলকাতার বাস ছেড়ে এই রুক্ষ প্রান্তরের মধ্যে মরূদ্যানের মতো সাজানো সবুজ কারখানা শহরে চলে আসেন।

চড়াই একে বলা যায় না। ছোটখাটো পাহাড়ের বাংলোগুলো ওই পাহাড়ের মাথায় গায়ে ছড়ানো রয়েছে। ওদিকে দেখা যায় শহরের জল সরবরাহের জন্য বিশাল একটা দিঘি। পাথরের নীচে কোন জলাধারাকে বিশাল বাঁধ দিয়ে আটকে তৈরি করা হয়েছে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে জলাধার। তার থেকে মোটা পাইপে জল তোলা হচ্ছে অনেক উঁচু ওয়াটার ট্যাঙ্কে। সেখান থেকেই শহরে জল সরবরাহ করা হচ্ছে।

চড়াই-এর নীচের দিকে পথটা নেমে গেছে। নীচের কিছুটা বিস্তীর্ণ এলাকায়। সেখানেও বসতি—তারপর আবার কাছিমের পিঠের মতো উঠে গেছে জমিটা। সেখানে মাঝারি থাকের বাবুদের জন্য কোয়ার্টার। একতলা বাড়িগুলো আয়তনে ছোট। এটাকে বলা হয় বাবুপাড়া।

ওই বাংলো রাজ্যের বাইরের শ্রেণী এঁরা। কারখানার পদস্থ কর্মচারী এঁরা নন। তবু কারখানার অফিসের কাজ—হাজিরার কাজ—হিসাবপত্র, অর্থাৎ কারখানার চালাবার আসল কাজটাই এদের করতে হয়।

তার ওদিকে চলে গেছে রেললাইন। ওদিকে উঠেছে বিশাল কালো পাথরের রুক্ষ পাহাড়, লাইনের ধার দিয়ে চলে গেছে অনেকখানি জায়গা জুড়ে ওই বন্ধ্যা রুক্ষ পাহাড়, ঘাস জন্মে না তাতে। তবু ওই পাহাড়ের ফাঁকফোকরে নীচের দিকে দু'চারটে শিশুগাছ কোনোরকমে পাথর কামড়ে মাথা তুলেছে।

তার ওদিকে বিশাল এলাকা জুড়ে শ্রমিকদের ধাওড়া। টিনের চালের বিশাল একটানা ঘর। তারই খোপে খোপে এক একটি শ্রমিক পরিবার। ওদের রাজ্য আলাদা।

সেখানের পথগুলোও সংকীর্ণ। পথের ধারেই কিল্লী-বিল্লীদের ভিড়। ছোটখাটো চা-মুদিখানা খৈনীর দোকান।

কারখানা শহরের এগুলোই প্রধান বসতি। আর এছাড়া আছে ওদিকে আসল শিয়ালডাঙা গ্রাম। অতীতে এই রুক্ষ প্রান্তরের বুকে এইটাই ছিল আসল জনবসতি। দু'একটা পাকা বাড়ি এখন হয়েছে। তা না হলে এখনও লোহারদের সেই মাটির ঘর আর খাপরার চালই রয়েছে অনেক বাড়িতেই। ওদের চেহারার কোনো মিল নাই এই আধুনিক শহরের সঙ্গে। ওরা যেন এদের থেকে আলাদা, অন্যজগতের বাসিন্দা।

অবশ্য এই সারা এলাকায় আগে ছিল দুচারটে কোলিয়ারি। এখানের মাটির নীচে রয়েছে প্রচুর কয়লা, সেরা উঁচুমানের কয়লা। তখন বৈজ্ঞানিক উপায়ে মাটির সেই সম্পদ লুণ্ঠন করার কাজও শুরু হয়নি। রানীগঞ্জ অঞ্চলে দু' একজন ইংরেজ সবে কয়লা তোলার কাজ শুরু করেছে। সেই মাল কলকাতা নিয়ে যাবার মতো রেললাইনও হয়নি।

এই সময় ঠাকুর পরিবারও এই কয়লার ব্যবসাতে নামেন। কার টেগোর নামে কোম্পানি তৈরি করে।

শিয়ালডাঙা তখন কোন ম্যাপেই ছিল না। রুক্ষ-বন্ধ্যা প্রান্তরের একদিকে পড়েছিল এই ছোট্ট বসতি, বাইরের লোক তার কোন খবরই জানত না।

বিজন এসব কথা ওর কাকার এক বন্ধু, এখানের স্কুলের ইতিহাসের শিক্ষক নিতাইবাবুর কাছেই শুনেছিল। সেও এবার কোনো পলিটেকনিক স্কুলের ডিপ্লোমা নিয়ে পাস করেছে। এখান থেকে কয়েক স্টেশন পর একটা ছোট স্টেশনে নেমে দামোদরের ধারে তাদের গ্রাম, সামান্য জমি-জারাত আছে বিজনদের।

অবশ্য কাকা অবিনাশবাবুকে বিজনের বাবাই পড়িয়েছিলেন, বিয়ে-থা দিয়ে সংসারী করেছিলেন। দেশেও এখন অবিনাশবাবু পৃথক হয়ে নতুন বাড়ি করেছেন, বিদেশে থাকলেও দেশের মাটিকে ভোলেননি, জমিজমা করেছেন। দেশে যাতায়াতও করেন মাঝে মাঝে। তাই বিজনের সঙ্গে যোগাযোগও রয়েছে।

সেই সুবাদেই বিজনের মা বলে অবিনাশকে—ঠাকুরপো, তোমার দাদা চলে গেলেন, ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে বিপদে পড়েছি। জানোই তো জমিজমার আয়ে সংসার চলে কোনোমতে। এদিকে বিজনও পাস করলো। তোমাদের কারখানায় যদি একটা কাজ হয়, একটু চেষ্টা করে দ্যাখো।

অবিনাশ এমনিতে ভাল মানুষ। দাদার প্রতি শ্রদ্ধা-কৃতজ্ঞতা তার আছে। বিজনও ছেলে হিসাবে ভালো। পড়াশোনাতেও ভালো আর গ্রামের নাটকেও ভালো অভিনয় করে।

অবিনাশও ছোটবেলা থেকে নাটকের ভক্ত। সেও গ্রামে অভিনয় করতো, এই শিয়ালডাঙা কারখানাতে এসে এখানেও অভিনয়টাকে ছাড়েনি। বাবুদের ক্লাবে রীতিমতো অভিনয় করে। সেই সুবাদে তার নাম খাতিরও আছে।

এই বিজনকে এখানে পেলে তাদের ক্লাবে একটা ভালো হিরো আসবে। তাছাড়া ভাইপোর জন্য কিছু করা দরকার। তাই অবিনাশ বলে,

—দেখি বৌঠান। সাহেবদের বলি, যদি বিজনের কোনো ব্যবস্থা করতে পারি, নিজেই খুশি হবো।

মিঃ উইলসন ওয়ার্কসপের স্পান পাইপ সেকশনের ওয়ার্কস ম্যানেজার। সুন্দর চেহারা বয়স প্রায় পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই। ওর দেহে খাস ব্রিটিশ রক্ত নেই। ওর মা ছিল বাঙালি।

কলকাতার এলিয়ট রোড, তালতলা অঞ্চলে ছিল এমনি বহু অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের বাস। উইলসনের ছেলেবেলা কেটে ছিল এই অঞ্চলে। বাঙালি স্কুলেই পড়তো বাঙালিদের সঙ্গে। উইলসনের বাবা ছিলেন রেলের গার্ড। তখন ব্রিটিশ আমল। অ্যাংলো ইন্ডিয়ানরাও নিজেদের রাজার জাত ভেবে নেটিভদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলতো। কিন্তু মিসেস উইলসন, অর্থাৎ আজকের উইলসনের মা ছিলেন বাঙালি ক্রিশ্চান। তাদের বাড়িতে মা মেরির ছবির পাশে ছিল মা কালী মা দুর্গার ছবি। সে রামায়ণ-মহাভারত পড়তো। তরুণ উইলসনও মায়ের জন্যই বাংলাও ভালো শিখেছে। আর তালতলা নাট্য সমাজের হিরো। ওদের ক্লাব নাটকেও তার দারুণ নাম।

ওর বাবা মিঃ উইলসন এসব পছন্দ করত না। সন্ধ্যার পর সে ঘরে বসে মদ খায় আর মাতাল হয়ে খিস্তি করে।

—ইউ ড্যাম সোয়াইন...। নেটিভদের সঙ্গে এত মেলামেশা কেন!

উইলসন বলে,

—তোমাদের যা চেহারা দেখছি, তাতে মনে হয় চামড়াটা সাদা হলেই মানুষ হয় না। তার তুলনায় ওই বাঙালি কালচার অনেক বিশাল—মহান।

—"সাট্ আপ্। ইউ সন্ অব্ অ্যা বিচ্।"

উইলসন সরে যায়। ওই সমাজের উপর তার ঘৃণাই জন্মে।

এমনি দিনে সে ওই শিয়ালডাঙার কারখানাতে চাকরিও পেয়ে যায়। অবশ্য সাদা চামড়ার পরিচয়ে। তাই চলে আসে। কলকাতার টেকনিক্যাল স্কুলের পাস করা অ্যাংলো সাহেব তাই এখানে কারখানায় জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার হয়েই ঢোকে।

এমনিতে ভালো ছেলে উইলসন, কর্মঠ। আর মিশুক। সাদা চামড়ার গৌরব-বোধ তার নেই। তাই বাঙালি বিহারীদের সঙ্গে সহজেই মিশে যায়। তাঁদের দোল উৎসব—হোলিতেও যোগ দেয়। বাংলোর বাসিন্দা হয়েও সে এখানে বাবুদের রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভ্য। অফিসারস্ ক্লাবও আছে। সেটা ওই বাংলো পাড়ার একদিকে। সুন্দর সাজানো বাগান, ওদিকে সাহেব মেমসাহেবদের নাচন-কোঁদনের জন্য মোমমাজা কাঠের মেজে। ওপাশে মদ্যপানের জন্য বার। তাসখেলার, বিলিয়ার্ডস্ খেলার ঘর। সেখানে ঢোকার অধিকার ওই বাংলোর সাহেবদেরই। অবশ্য দুচারজন বাঙালি, দু একজন দক্ষিণী ইঞ্জিনিয়ার অফিসারও আছে। তারা বড় একটা যায় না ক্লাবে। লালমুখোদের উৎসবই চলে। অবশ্য...

আর মেমসাহেব হবার জন্য তাদের অতি আধুনিকা বউ-রা যায়। সেখানে বড়সাহেব—মেজসাহেব—ওয়ার্কস্ ম্যানেজারদের খুশি করার চেষ্টাও করে নানাভাবে, যাতে চাকরিতে প্রমোশন হয়।

উইলসনের স্ত্রী নোরাও অ্যাংলো সমাজের মেয়ে। উইলসনের বাবারই এক সহকর্মী অ্যাংলোর মেয়ে নোরা। সে লরেটোতে পড়েছে। সেও ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ে মনে মনে নিজেকে কালো নেটিভদের চেয়েও অনেক উপরের থাকের কেউকেটা বলেই ভাবে। এখানেও নোরা ওই ক্লাবে যায়। লালমুখোদের আপনার জন বলে ভাবে।

উইলসন এখন বাবুক্লাবের নতুন নাটক নিয়েই ব্যস্ত। অবিনাশও সেখানে নামী অভিনেতা। অবিনাশ করছে চাণক্য আর উইলসন চন্দ্রগুপ্ত। নোরা বলে,—ওই নেটিভদের সঙ্গে মেলামেশা করতে ঘৃণা হয় না। উইলসন বলে—হয়, তোমার ওই মাতাল, লম্পট লালমুখোদের সঙ্গে মিশতে।

নোরা বলে—ওরাই তোমার মাথা বিগড়ে দিয়েছে। ছেলেগুলোকেও পড়াচ্ছ বাংলা স্কুলে।

উইলসন জানে দেশের পরিস্থিতির কথা। ইংরেজ সরকারের অত্যাচারের কথাও। জানে বিপ্লবীদের কথা। ইংরেজের বিরুদ্ধে জন আন্দোলনের কথাও। সে বলে—তুমি কি ভাবো যে, ইংরেজ এদেশে চিরকালই থাকবে?

—সিওর! নোরা রাজার জাতের মেজাজে উত্তর দেয়। হাসে উইলসন, দিন আসবে। একদিন ব্রিটিশকেও এদেশ থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে চলে যেতে হবে।

তখন এদেশ হবে বাঙালিদেরই। তাই এদের সঙ্গে মিশি।

কথাটা শুনে নোরা বলে—নো, নেভার, এ হতেই পারে না।

বাঙালিদের হাতে আসবে ক্ষমতা! ইমপসিবল্! হরিবল—নোরা এসব কথা ভাবতেই চায় না।

উইলসনকেই বিজনের কাজের কথা অবিনাশ বলেছিল। সেবার নাটকের পর বিজনকে দেখিয়েছিল অবিনাশ। বসে অবিনাশের গান তো শুনলে সাহেব, তোমার দলে গায়ক-নায়ক নাই, এ এলে দল জমে যাবে।

ক্লাবে নাটকের দলের সেক্রেটারি ওই উইলসন। তার খুব ইচ্ছা সে অ্যান্টনী ফিরিঙ্গি পালাই করবে। একজন বিদেশি এ দেশকেই নিজের দেশ মনে করে তার শিল্প-সংস্কৃতিকে নিজের বলে মেনে নিয়েছিল। কবিগানও করতো দারুণ। এ যেন তার মনেরই কথা। কিন্তু সে গান জানে না, তাই ওই চরিত্র অভিনয় করতে পারেনি। এবার বিজনকে দেখে মনে হয় এবার সে অ্যান্টনী ফিরিঙ্গিই মঞ্চস্থ করবে।

অবিনাশ বলে—ও পলিটেকনিক থেকে পাশ করেছে।

উইলসন বলে—দেখি চেষ্টা করে। স্প্যান পাইপ সেকসন বাড়ানো হচ্ছে, ওকে দরখাস্ত দিতে বলো।

সেইমত বিজন দরখাস্ত দিয়েছিল। জনা পঞ্চাশ ছেলেকে ইন্টারভিউ নিয়েছিল উইলসন সাহেব। বিজনও ইন্টারভিউ দিয়ে গ্রামে ফিরে গেছিল। তার কদিন পরই দেশের বাড়িতে তার নিয়োগপত্র চলে যায়।

মা শুনে খুশিই হয়। তাহলে ঠাকুরপো কথা রেখেছে। মা মঙ্গলচণ্ডীর দয়াতে কাজটা হয়েছে তাহলে। ছোটভাই সুজন এবার মাধ্যমিক দেবে। সেও খুশি হয়। বলে,—এবার তাহলে কলেজে পড়তে পারব, দাদা!

মা বলে—পড়বি রে, সুমির বিয়ে থাও দিতে হবে। অর্থাৎ মা যেন চাকরি পাবার সঙ্গে সঙ্গে ওকে সংসারের দায়িত্বের কথাই মনে করিয়ে দেয়।

বিজন জানে, তাকে এসব দায়-দায়িত্ব পালন করতে হবে। এই চাকরিই তার একমাত্র ভরসা। এই শিয়ালডাঙার কারখানাই তার অন্নদাতা।

তাই প্রথমদিন এসে একে এবার সম্ভ্রমের চোখেই দেখে। ওই বিশাল শেড, বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বড় বড় টিনের উঁচু শেডের নীচে নানা কর্মকাণ্ড চলেছে। বিকট শব্দ ওঠে। নানা রকমের শব্দ। ওই শেডের আশেপাশে বড় বড় বিল্ডিং-নানা অফিস আকাশে মাথা তুলেছে। বিশাল বিশাল অনেক বড়-মাঝারি উচ্চতার চিমনি। ওদিকে ব্লাস্ট ফার্নেসে লোহা গলানো হচ্ছে, তার চিমনি থেকে পিঙ্গল বর্ণের ধোঁয়া বের হচ্ছে। দূরের পাহাড়ের মাথায় নীল আকাশে ছড়িয়ে পড়ছে ওই ধোঁয়া। ওদিকের গেট থেকে একটা ছোট রেলইঞ্জিন ওয়াগন ভর্তি রড, নানা সাইজের পাইপ ভর্তি বেশ কিছু মালগাড়িকে টেনে নিয়ে চলেছে ওদিকে স্টেশনের দিকে। ওসব মাল দূর-দূরান্তরের বাজারে—বিদেশের বাজারেও চলে যাবে বিক্রির জন্য।

অবিনাশের স্ত্রী কমলা অবশ্য স্বামীর চাকরি নিয়ে কম গল্প করে না। ফর্সা রং একটু বেঁটে গোলগাল চেহারা, তাদের দুটি সন্তান কুসুম আর জীবন। জীবন এখানকার স্কুলে পড়ে। পড়াশোনাতে অবশ্য মন তার নেই। বড়দিদি কুসুম এবার

মাধ্যমিক দেবে। কুসুম বাবার ধাঁচ পেয়েছে। শান্ত গান গায়, পড়াশোনাতেও ভালো। জীবন পেয়েছে মায়ের ধাঁচ। কিছুটা স্বার্থপর—আয়েশি।

তখন বেশ বেলা হয়েছে। বিজন বাড়ি থেকে বের হয়ে চার-পাঁচ ক্রোশ মেঠোপথ পার হয়ে স্টেশনে এসে দেখে পরের গাড়ি বেলা এগারোটাতে। সেই গাড়িতে এসে আগেকার স্টেশনে নেমে বাসে করে এসেছে। শিয়ালডাঙা একটা ব্রাঞ্চলাইন ওই লাইনে গাড়ি কমই। তাই জংশন স্টেশনে নেমে বাসে করে এসে জিটি রোডে নেমে মাইল খানেক পথ হেঁটে বাবুপাড়ায় কাকার বাড়িতে এসে যখন পৌঁছেছে তখন কারখানার দুপুরের ভোঁ বাজছে।

ওদের শিফ্‌ট শুরু হয় সকাল ছটা থেকে দুটো। আবার দুটো থেকে রাত দশটা, রাত দশটা থেকে সকাল ছটা অবধি। কারখানার হাজার কয়েক কর্মী এই তিন সিফটে ভাগ করে কাজ করে। আর অফিসের বাবুদের কাজ শুরু হয় সকাল আটটা থেকে বারোটা অবধি। মাঝখানে দু ঘণ্টার খাবার ছুটি।

কমলা অবশ্য আগেই শুনেছিল স্বামীর মুখে যে বিজনের চাকরি হয়েছে এই কারখানাতে। খবরটা শুনে কমলা পচ্ করে পানের পিক ফেলে বলে, —নিজের কাঁথা পরকে দিয়ে দৈবজ্ঞ মরে ঘুটে কুড়িয়ে। তোমার হল তাই। আমার জীবনের কথা ভাবলে না, ভাবতে গেলে পরের কথা।

অবিনাশ বলে—তোমার ছেলেকে মন দিয়ে পড়াশোনা করতে বলো। যা দিনকাল পড়েছে, পড়াশোনা না করলে চাকরিও পাবে না। বিজন চাকরি পেয়েছে নিজের যোগ্যতায়। ম্যাট্রিক ফার্স্ট ডিভিশন পাস, পলিটেকনিকে ফার্স্ট ক্লাস ডিপ্লোমা পেয়েছে।

—থাক্ থাক্! আর ওকালতি করতে হবে না। নিজের কথাও ভাব এবার। কমলা জবাব দেয় বিরক্তিভরা কণ্ঠে। সে যে আদৌ খুশি হয়নি তা ফুটে ওঠে তার কথায়। বলে—চাকরি করবে মাইনে পাবে। মায়ের ডাঁট বাড়বে। আমি বাপু এখানে রেখে ওর অন্ন যোগাতে পারব না। অবিনাশ বলে—আহাঃ শুধু শুধু সে তোমার অন্ন খাবে কেন!

—তবে? মাস কাবারে টাকা দেবে আমাকে?

—খাবার টাকা? তা কত করে দেবে?

কমলা কিছু আমদানির কথায় এবার যেন অন্যসুরে কথা বলে। অবিনাশ বলে,—আহাঃ হাজার হোক নিজের ভাইপো, তুমি তখন কোথায়! দাদাই আমাকে মানুষ করেছিল। আজ তিনি নাই, তার ছেলেকে দুটো ভাত দিয়ে টাকা নিতে পারব না।

—অ! দাতব্যি করবে? দানছত্র খুলেছো? কমলা জানায়—

—যা করার করো। আমি বাপু দুবেলা রান্না করতে পারব না ওর জন্য।

অবিনাশ বলে—হাঁড়ির ভাতেই ওর হয়ে যাবে। আর জীবনকে পড়াবে সকাল-সন্ধ্যা। একটা মাস্টার রাখতে গেলেও তো খরচা আছে। এ পেট-ভাতেই হয়ে যাবে। আর বিজনের মতো ছেলের সঙ্গে থাকলে জীবনের মতিগতিও বদলাবে। আখেরে লাভই হবে।

কুসুমও বলে—বিজনদা থাকলে ভালই হবে মা। কুসুমের কথায় কমলা বলে—থাম তো! যেমন বাপ তেমন পর ঢলানি মেয়ে।

এসব ভূমিকা আগেই হয়ে গেছে। কমলাও বুঝেছে, স্বামী মনস্থির করেই রেখেছে বিজনকে এখানে রাখার জন্য। তাই কমলা এটাকে মেনে নিতে না পারলেও মুখে তেমন কিছু বলেনি।

সেদিন দুপুরে অবিনাশ সাইকেলে করে অফিস থেকে বাড়িতে ফিরেছে। স্নান করতে যাবে, এমন সময় বিজন এসে পড়ে। বাড়ি থেকে এনেছে, বাড়ির গরুর দুধের কিছুটা ক্ষীর।

কমলাও দেখে তাকে। মুখটা তার গম্ভীর হয়ে ওঠে। কুসুম বলে—ওমা! বিজনদা এসেছে।

বিজন অবিনাশকে প্রণাম করে, কাকিমাকেও।

কমলা বলে—থাক্—থাক্!

অবিনাশ বলে তোমার কথাই ভাবছিলাম। কালই জয়েন করার কথা। যাক্, এসে পড়ে ভালোই করেছ।

বিজন বলে—কাকিমা, মা বাড়ি থেকে কিছুটা ক্ষীর পাঠিয়েছেন।

কমলা তেমন গুরুত্বই দেখায় না। কুসুমই বলে,—ওমা! কি মিষ্টি গন্ধ। ও বেলা রুটি দিয়ে খাওয়া যাবে।

অবিনাশ দেখছে কমলাকে। বলে,

—বিজন, তুমি ওই দিককার ঘরে তোমার জিনিসপত্র রেখে স্নান করো, খেয়ে দেয়ে নাও। সন্ধ্যায় অফিস থেকে ফিরে কথা হবে। ক্লাবে তোমাকে তখন নিয়ে যাব। উইলসন সাহেবের সঙ্গেও দেখা হবে।

বাড়িটায় খান চারেক ঘর। মাঝে উঠান মতো, ওদিকে রান্নাঘরের পাশে একটা ছোট ঘরও আছে। বিজনের থাকার ব্যবস্থা হয় ওখানেই।

বিজন ঘরে এসেছে। এ ঘরটা ব্যবহার করা হয় না। তবে একটা তক্তপোশ রয়েছে, ওদিকে জানালা খুললে পিছনের বাড়ির বাগান সবুজ গাছপালা দেখা যায়। গ্রামের ছেলে, গাছগাছালির সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তাই ওই সবুজটাকে ভালো লাগে এখানে।

রান্নাঘরে কুসুমও মায়ের সঙ্গে হাত লাগিয়েছে। গজগজ করে কমলা—বাড়া ভাতে এসে হাজির।

কথাটা কানে যায় বিজনেরও। অবশ্য এখন তার সামর্থ্য নেই। নিজের পায়ের তলে মাটি খুঁজে নিতে হবে। তাই এসব কথায় কান দিতে সে চায় না।

শিয়ালডাঙা কারখানার ইতিহাস অনেক পিছনের। এতদিনে ধরে ব্রিটিশ মালিকরাই প্রধানত এই কারখানা চালিয়েছে। দেশি কর্মচারীর সংখ্যাই বেশি। তাদের খাটিয়ে ইংরেজ কোম্পানি মুনাফা করেছে। তবে তাদের জন্যও ছিটেফোঁটা দিয়েছে। কয়েক হাজার মাঝের শ্রেণীর কর্মীর জন্য অন্ন-আশ্রয় দিয়েছে। আর তাদের মনোরঞ্জনের জন্য তারাই এখানে বেশ কিছু জায়গা নিয়ে লাইব্রেরি ওদিকে নাটকের

স্থায়ী মঞ্চ হল এসব করেছে। ওদিকের লম্বা হলে ক্যারাম টেবিল টেনিস বোর্ড আছে।

সন্ধ্যার পর অনেকেই ক্লাবে আসে। তাস ও টেবিল টেনিস খেলা হয়। ওদিকে নাটকের রিহার্সলও চলে। আড্ডাও হয়। সন্ধ্যায় এই প্রান্তরের মানুষদের অনেকেই এখানে আসে। উইলসনও এখানে আসেন সন্ধ্যার পর। অফিসার্স ক্লাবের পরিবেশ তার ভালো লাগে না। মিঃ মিত্র এখানের প্রোডাকশন সেকশনের চার্জে আছেন। তিনিই বলেন,

—উইলসন, ওই কেরানি সুপারভাইজারদের সঙ্গে আড্ডা দাও কী করে? আমাদের ক্লাবে আসো না।

হাসে উইলসন—মিঃ মিত্র, মিঃ রায়, তোমরা সাহেব সাজতে চাও, সাজো, সাহেবদের আমার ঢের দেখা আছে। ওই ভেতো বাঙালিদেরই আমি ভালবাসি।

মিঃ মিত্র বলেন—বড় সাহেব, ওয়ার্কস ম্যানেজার, মিঃ জন ওখানে গেলে খুশি হতেন। তোমার প্রমোশন ডিউ হয়ে গেছে।

—যোগ্যতা যদি প্রমোশনের মাপকাঠি হয়, তারা বিচার করবেন। তাদের মোসাহেবি করে প্রমোশনের দরকার নেই।

উইলসন সাফ জানিয়ে দেয়। মিঃ মিত্র চুপ করে যায়। মিঃ রায় বলেন,

—ওটা একটা হতভাগা। কে জানে ওখানে গিয়ে ধেনো ফেনো খায় কি না।

অবিনাশই বিজনের সঙ্গে উইলসনের পরিচয় করিয়ে দেয়। উইলসন বলে,

—মন দিয়ে কাজ করো ইয়ংম্যান। কাজে ফাঁকি দিও না, নিজেই ফাঁকে পড়বে।

বিজন-রতন আর তিনচারজন ছেলে স্প্যান পাইপ সেকশনে জয়েন করেছে। এই কোম্পানির স্প্যানপাইপ-এর বাজারে খুবই সুনাম। সারা ভারতে, ভারতের বাইরেও ওদের রকমারি সাইজের পাইপ যায়। জলের লাইন গ্যাসের লাইন করতে ওই পাইপের দরকার। তাই আরব দুনিয়াতেও ওদের পাইপের খুবই কদর।

বিজন দেখছে ওই সেকসনের বিভিন্ন কাজ। বিশাল অটোমেটিক মেশিনে কাজ হয়। ওদিকে ছোট ফার্নেসে মেটাল গলানো হচ্ছে। সেই ফার্নেস থেকে লালাভ তরল গলানো লোহা জলের মতো এসে একটা ঘূর্ণায়মান বিরাট পাইপের আকারের ডাইসে পড়ছে। লাল সেই গলিতধাতু কয়েক মিনিটের মধ্যে ডাইসের পাইপের আকার নিচ্ছে, আর সেই উত্তপ্ত পাইপ চলে যাচ্ছে কুলিং চেম্বারে। সেখানে থেকে মেশিনে সেই পাইপকে ফেলে দিচ্ছে তরল আলকাতরা ভরা বাঁধানো পুকুরের মতো চৌ-বাচ্চায়। পনেরো বিশ ফিট পাইপ তৈরি হচ্ছে কয়েক মিনিটে। বিশাল শেডের নীচে এক-একটা সেকশনে ওই পাইপ তৈরি হচ্ছে বিভিন্ন মাপে।

ওইসব সেকশনে কাজও অনেক। তিন সিফটে কাজ চলে। উইলসন সাহেব নিজেই ঘুরে ঘুরে সব কাজের তদারক করে। শ্রমিক-সুপারভাইজারদের সঙ্গেও ফস্টিনস্টি করে একেবারে খাস্ চলতি বাংলায়। কাউকে একটু ঢুলতে দেখলে এগিয়ে আসেন। বলে,

—আরে এই মদনা, রোলিং মেশিনের সামনে ঢুলছিস, তোর মাগকে দেখছি বিধবা করেই ছাড়বি রে! অ্যাঁ, আর আমাকেও ফাঁসাবি।

—কই, ঢুলিনি তো সাহেব, ঢুলবো কেন গো!

উইলসন ওর কাঁধে থাপ্পড় মেরে বলে—

খোয়াব দেখছিলি, নে মেশিন দ্যাখ্—মাল এসে গেছে। গিয়ার দে।

বিজনের কাজ পড়েছে ক্রেনে। বড় মাঝারি কয়েকটা ক্রেন আছে এখানে। নীচে ইঞ্জিন, একটা নিপুণ ফেব্রিকেট করা লোহার ফ্রেমের মাথায় ক্রেন চেম্বার। নীচে পুলি লাগানো, ওতে চেন লাগানো আছে। ওই বড় বড় নানা সাইজের পাইপগুলোকে চেনে বেঁধে দেওয়া হয়। এবার বিজন আর একজন ক্রেন অপারেটর দুজনে সেইগুলোকে তুলে বিভিন্ন সাইজের পাইপের লাটে তুলে দেয়। বিস্তীর্ণ এলাকা এখানে ফাঁকা, এক এক জায়গায় এক এক সাইজের পাইপ। মানুষের তোলার শক্তি নেই। ওগুলো ক্রেনে তুলতে হয়। ধারেই রেললাইন রয়েছে কারখানার মধ্যে। রেললাইনটা বিভিন্ন বিভাগের শেডের পাশ দিয়ে গেছে। সোলডিং সেকশন, ফারনেস সেকসন, ওই বিশাল উপুড় করা একটা যেন আকাশছোঁয়া গ্লাস। তার মধ্যে আয়রন ওর লাইম স্টোন—কয়লা ম্যাঙ্গানিজ আরও কিছু দিয়ে হাওয়া চার্জ করে জ্বালানো হয়, তখন চিমনিগুলো থেকে নির্গত ধোঁয়া পাহাড়তলির আকাশকে ভরিয়ে তোলে। চব্বিশ ঘণ্টা চার্জিং-এর পর বিশেষ ধরনের মাইকার স্বচ্ছ একটু পথ দিয়ে দেখা যায় ভিতরের গলিত নীলাভ তরলকে। ক্রমশ লোহা বের হয়েছে ওই নলজুত হয়। তরল গলিত লোহার নীচে পড়েছে পাথরের অংশ, সেগুলোতেও কিছু ভাগ আয়রন থেকে যায়। তবে বেশির ভাগ লোহাই তখন তরল হয়ে গেছে। নীচে লাইন পাতা রয়েছে ব্লাস্ট ফার্নেসের। নীচের অংশ খুলে দিতে সেই বাতিল পাথরের প্রায় গলিত অংশ সেইসব টব জাতীয় গাড়িতে পড়ে। তখনও সেসব পদার্থ লালাভ হয়ে রয়েছে, ধোঁয়া বের হচ্ছে।

সেই জ্বলন্ত বাতিল বস্তুকে বলা হয় স্ল্যাগ। ওগুলো দিয়ে তখন কোনো কাজই হতো না। লাইন দিয়ে ওগুলোকে টেনে নিয়ে গিয়ে ফেলা হতো ওই কালো পাথরের পাহাড়ের মাথায়।

বিজন জেনেছিল যে ওই বিশাল পাহাড় গড়ে উঠেছে বছরের পর বছর ধরে ফেলা ব্লাস্ট ফার্নেসের ওই বাতিল স্ল্যাগে। এখানে ওই পাহাড়কে বলা হয় স্ল্যাগ ব্যাঙ্ক। পাহাড়-এর উচ্চতা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। আর ওই গরম স্ল্যাগে ফেলার জন্য তার উত্তাপে এলাকায় কোনো গাছই হয় না। অবশ্য ওদিকের অনেকদিন আগের ফেলা স্ল্যাগ ব্যাঙ্কে দু চারটে গাছ গজাচ্ছে।

ব্লাস্টফার্নেসই কারখানার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। এখানে তৈরি হয় প্রথমে কাস্ট আয়রন। বাতিল স্ল্যাগ ফেলে দেবার পরই সেই আসল তরল লোহার স্রোতকে বের করে আয়রন কাস্টিং করা হয়। লম্বা লম্বা বিশেষ ধরনের লোহা। আর সেই লোহা পাঠানো হয় বিভিন্ন সেকশনে।

কোথাও নানা সাইজের রড, প্লেট, সিট তৈরি হয় তাকে গলিয়ে। স্প্যান পাইপও তৈরি হয় এই লোহাতেই।

কাস্টিং সেকশনে তৈরি হয় বিভিন্ন ধরনের ঢালাই। বিদেশে সেইসব ঢালাই-এর দাম প্রায় লক্ষ লক্ষ টাকা।

বিজন গোটা কারখানাটা এখনও দেখতে পারেনি। তার ইচ্ছা আছে সব সেকশন ঘুরে দেখা। এই কারখানা নাকি ভারতের প্রথম লোহা কারখানা। ভারতবর্ষে প্রথম এই শিয়ালডাঙা কারখানাতেই লোহা নিষ্কাষণ শুরু হয়। ক্রেনের চেম্বারটা প্যান করে মাল বয় সে। চেম্বারটা তখন অনেক উঁচুতে। সেখান থেকে বিজন কারখানার অনেকখানি দেখতে পায়।

এদিকে সবটাই লোহার বিভিন্ন জিনিস তৈরির কারখানা। ওদিকেও বিশাল এলাকা জুড়ে রয়েছে। নন ফেরাস সেকশন। সে এলাকাও বিশাল। সেটাও এই কারখানার অন্য বিভাগ। তার জন্যও নতুন টাউনশিপ আছে। হাট-বাজারও আছে। সেখানের কারখানায় তৈরি হয় পিতলও অন্য ধাতুর নানা ধরনের যন্ত্রপাতি, অন্যান্য দ্রব্যাদি।

নীচে তখন মাল বাঁধা হয়ে গেছে। নীচ থেকে সংকেত দেয় 'মাল তোলো'। কয়েকটা ভারী পাইপকে নিয়ে ছেড়ে দিতে হবে ওদিকে লাইনের উপর রাখা মালগাড়িতে।

বিজন এখন কিছুদিনের মধ্যে নিজের চেষ্টাতেই ক্রেন অপারেটারের কাছে তালিম নিয়ে ক্রেন অপারেট করতে শিখে গেছে। কয়েকটা গিয়ারকে ঠিকমতো টেনে দিলে লম্বা ডাণ্ডাটা স্টিয়ারিং-এর ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরবে—উঠবে—নীচে নামবে ওই ভারি মালপত্র নিয়ে।

বিজনই নিজেই এখন সাবধানে মালগুলো নিয়ে প্যান করে সঠিক ভাবেই ওয়াগনের ভিতর মালগুলোকে প্লেস করে।

—শাবাশ! আরে তুমি তো ফুল স্কেল অপারেটারই হয়ে গেছ ইয়ংম্যান! ভেরি গুড—

মাল প্লেস করে ক্রেন থেকে নামছে বিজন। সামনে তেলকালি মাখা, প্যান্ট-সার্ট পরা উইলসনকে দেখে বিজন বলে,

—গুড মর্নিং স্যার।

—গুড মর্নিং, কাজ কেমন লাগছে? ভয় করছে না তো? উইলসনের কথায় বিজন বলে—প্রথম প্রথম করতো স্যার। মনে হতো আকাশ থেকে ছিটকেই পড়ব, এখন সয়ে গেছে।

উইলসন বলে—গুড! ভয় করবে না। এখনও তোমার কাজটা—ঠিক রপ্ত হয়নি। ক্রেন স্টিয়ারিং প্যান করছিল।

বিজনও সেটা জানে। ওই ভারী মাল নিয়ে ক্রেন চালাতে এখনও মাঝে মাঝে হাত কাঁপে তার। উইলসন বলে—প্রথমে এমন হয়, তবে স্টেডি থাকবে। ক্রেনে বসে ভাববে আই অ্যাম-এ মেসিন। কোন ভুলচুক হতে দেবে না। ক্যারি অন ইয়ংম্যান—চল ওই বড় লটটাই এবার তুলবে তুমি।

ওটা অন্য ক্রেন। ওতে আরও ভারী মাল বওয়া হয়। বিজন যেন ঘাবড়ে যায়।

—স্যার, ওটা পাঁচটনের ক্রেন—

—সো হোয়াট! অপারেশন তো একই। কাম অন—আমি তোমার সঙ্গে ক্রেনে থাকব।

উইলসন ওকে নিয়ে ক্রেনের চেম্বারে বসে দরজা বন্ধ করে দেয়। বলে—গেট আপ—

ভয়ে ভয়ে সুইচ টেপে বিজন। মাটি থেকে এবার লম্বা ক্রেন পিলারটা ওদের চেম্বারটাকে আকাশে তুলেছে। ওই ক্রেন থেকে এর উচ্চতাও অনেক বেশি। দেখা যায় কারখানার শেড পার হয়ে দূরের টাউনশিপ, স্ল্যাগ ব্যাঙ্ক-এর পাহাড় ছাড়িয়ে মূল শিয়ালডাঙা গ্রাম-বসতি, দূরে কোলিয়ারির হেড গিয়ার, কয়লার স্তূপ।

নীচে তখন মাল বাঁধা হচ্ছে। বিশাল পাইপের স্তূপই বেঁধেছে তারা। ওই মালের স্তূপ নিয়ে গিয়ে নামাতে হবে ওদিকের লটে। উইলসন পাশের সিটে। বলে সে, কাম অন, পুল করো—

পুলিং গিয়ার দিয়েছে বিজন। সারা ক্রেন চেম্বারটা যেন কাঁপছে ওই মালের ভারে।

—স্টেডি! নাউ প্যান করো। স্লো প্যানিং, ইয়েস ঘাবড়াও মত, কারেক্ট! গো—

নীচে ওই স্তূপ নিয়ে ক্রেনটা এবার ধীরে ধীরে শূন্যপথে প্যান করে সেই লটের উপর এসেছে।

—নাউ গেট ডাউন, ভেরি স্লো—স্টেডি—ডাউন—

এবার মালগুলো ধীরে ধীরে এসে লটের উপর থামে।

ক্রেনও তখন শূন্যপথে থেমেছে। এবার নীচের কুলিদের কাজ শুরু হয়েছে। তারাই চেন খুলে ভারমুক্ত করে দেবে এদের।

ঘামছে বিজন। সাহেবের পাল্লায় পড়ে আজ আর একটু হলে একটা চরম বিপদ ঘটতে পারত। কিন্তু ঘটেনি। কোনোমতে বেঁচে গেছে।

উইলসন নেমে চলে গেল। এই ক্রেন অপারেটর বিভূতি পুরানো লোক। সেও দেখেছে বিজনের কাজ। বলে বিভূতিবাবু—না, তোমার এলেম আছে হে বিজন। পাগলা সাহেব আজ তোমাকে বাজিয়ে দেখে গেল। আর ওর পরীক্ষায় পাসও করেছ তুমি।

এই ধরনের ক্রেন অপারেটরদের বিশেষ ট্রেনিং-এর দরকার। এদের গ্রেডও আলাদা। বিভূতিবাবু বলে, ছুটি চাইতে গেলে সাহেব বলে, তোমার ক্রেন কে চালাবে। এখন লোক পেয়ে গেছি। আমার কাছেও ট্রেনিং নাও মাঝে মাঝে। ভাল গ্রেডে আসবে।

বিজন খুশি হয়েই ফিরছে বাসাতে। কাকার এখানেই আছে। অবশ্য খুব যে ভালো আছে তা নিজেরই মনে হয় না বিজনের। ভোরে উঠে কুসুমই চা দিয়ে যায়। ওদিকে অবিনাশবাবু ভোরে উঠে আদ্যাস্তোত্র পাঠ করেন জোরে জোরে। তারপর শুরু হয় গুরুস্তোত্র। বাবুপাড়ার মানুষের ঘুম ভাঙে ওর স্তোত্রপাঠ শুনে। কমলার দেরিতে ওঠা অভ্যাস। কুসুমই সকলের চা টা করে মাকে দিয়ে বলে—ওঠো।

কমলা আড়মোড়া ভেঙে বলে,

—দিনভোর খাটাখাটনি করে একটু আরাম আয়েশ করব, তার উপায়ও নেই। ভোর থেকে শুরু হল ওই ওং-বং! হ্যাঁরে, জীবন পড়তে বসেছে?

কুসুম বলে—হ্যাঁ।

দেখিস, ছোঁড়া যেন কাজে ফাঁকি না দেয়। ওই জীবনের কথা বলছি। দুবেলা ঠিকমতো যেন পড়ায়। একটা মানুষের খাবার খরচা তো কম নয়। আর গেলেও তেমনি গাণ্ডে পিণ্ডে।

কুসুম বলে—কী যে বল মা! বিজনদা খুব ভালো ছেলে।

—থাম তো, জীবনের পরীক্ষার ফল আগে দেখি, তারপর ব্যবস্থা করব।

কুসুম বলে—জীবন ওই সকাল-সন্ধ্যা কোনোমতে বসে মাত্র। নিজে মন দিয়ে না পড়লে ভালো রেজাল্ট হবে কী করে। কমলা বলে—সব দোষ ওই জীবনটারই না। বাপ মেয়ে কেউ আমার ওই একটা মাত্র ছেলেকে দেখতে পারিস না। ওকি বানের জলে ভেসে এসেছে লা!

কুসুম জানে মায়ের টেপরেকর্ড করা ভয়েস একবার চালু হলে ক্যাসেট শেষ না হওয়া অবধি বেজেই চলবে। তাই সরে যায় সে।

অবশ্য তাতেও কমলার কথা থামে না। সকাল থেকেই ওর গালবাদ্যি শুরু হয়। চলবে সেই ঘুমোতে যাবার আগে অবধি। তার মতে সংসারে ভালো নেই —কিছুই নেই। সব কিছুর বিরুদ্ধেই, সকলের বিরুদ্ধেই তার মনে অভিযোগ পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে। আর সেগুলো অফুরান প্রবাহে বের হতে থাকে দিনভোর।

জীবন স্কুলে যায়। কোম্পানির টাউনশিপে ছেলেদের স্কুল-মেয়েদের স্কুলও রয়েছে। এখানের কর্মীদের ছেলেমেয়েদের সেখানে পড়ানো হয়। অবশ্য এখন আশপাশের গ্রামের ছেলেমেয়েরাও পড়ে।

জীবন এক এক ক্লাসে দুবার করে থেকে এতদিন ধরে বেশ পোক্ত হয়েই স্কুলের ক্লাস নাইনে এসে ঠেকেছে। পড়াশোনার চেয়ে খেলাধুলা আর পাড়ার মন্দিরতলার চত্বরে আড্ডা দেওয়াই তার ভালো লাগে।

এতদিন ছাড়া গরুর মতোই ছিল। অবিনাশবাবু বিজনকে বাড়িতে রাখার ফলে জীবনও বেশ অসুবিধাতেই পড়েছে। আগে সে বেলা অবধি শুয়ে থাকতো। মা উঠে চা দিলে তবে বিছানা ছাড়তো জীবন। আর বৈকালে খেলার মাঠে দৌড়-ঝাঁপের পর সন্ধ্যার মন্দিরতলায়, নাহয় জি টি রোডের ধারের বাজারের চায়ের দোকানে বসে আড্ডা দিত। এখন সেটা আর হয় না। অবিনাশবাবুই ভোরে ওকে তুলে দেয়। বিজনকেও ভোরে উঠে পড়াতে বসতে হয় জীবনকে। তারপর ওকে ডিউটিতে যেতে হয়। সন্ধ্যায় ক্লাবে যাবার জন্য মন কেমন করে বিজনের।

এখানে তার বয়সি ছেলের অভাব নেই। কারখানাতেই কাজ করে অনেকে। সকলেই ক্লাবে আসে। অবশ্য নাটক হয় পূজার সময়। তার মাসখানেক আগে রিহার্সল শুরু হয়। সন্ধ্যার সময় কমলাই বলে,

—কই রে জীবন, পড়তে বস। বিজন ঘরে রয়েছে। যা বই-পত্তর নিয়ে।

জীবন বলে—আজ মাথাব্যথা করছে।

বিজনই বলে—পড়তে বসলে মাথা-ব্যথা সেরে যাবে। এসো।

কমলা বলে—তাই যা। পড়াশোনা করতে হয় বাবা। কত খরচা হচ্ছে এর জন্য, তা তো জানিস না।

বিজন কথাটা প্রায়ই শোনে। অবশ্য জানে কাকিমা তাকেই ঠেস দিয়ে বলছে। তবু কোনো জবাবই দেয় না।

দুপুরে তার ছুটি হয় বেলা দুটোতে। অবিনাশবাবু তখন খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম করে। তাকেও আবার আড়াইটেতে বের হতে হবে। সকাল থেকে ওই যন্ত্রদানবের সঙ্গে বিজনকে লড়তে হয়। খোলা আকাশের নীচে। শীতকালে এখানে ঠাণ্ডার মাত্রা অনেক বেশি। আর গ্রীষ্মকালে মনে হয় যেন ফার্নেসের সব তাতই তার গায়ে মাথায় এসে লাগছে। সর্বাঙ্গ জ্বলে পুড়ে যায়, তবু কাজ করতে হয়।

ক্যানটিনে চা-খাবার ঠাণ্ডা পানীয় মেলে। দুপুরের সময় বাড়ি ফেরে বিজন। তখন কাকিমা খেয়ে দেয়ে ঘুমাচ্ছে। কুসুমই জেগে থাকে। অবশ্য তারও স্কুল আছে। বেশির ভাগ দিনই বিজন ডিউটি থেকে প্রচণ্ড খিদে নিয়ে এসে দেখে কাকিমা ঘুমাচ্ছে, কাকা ওদিকে বের হবার জন্য তৈরি হচ্ছে। কাকাই বলে,

—তোর কাকিমা খাবার ঢাকা দিয়ে রেখেছে। আমি বের হচ্ছি। তুই বাইরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে স্নান করে খেয়ে নিবি। জীবনও স্কুলে গেছে।

বিজন স্নান করে খেতে বসে। কুসুম-জীবন তখন স্কুলে। কমলা জানে তার স্বামী বের হবার আগেই বিজন ফিরবে কারখানা থেকে। তাই তার বাড়ি পাহারা দেবার লোকের অভাব হবে না। তাই কমলাও এই দুপুরে আরাম করে ঘুমায়।

বিজন এতক্ষণ যন্ত্রদানবের সঙ্গে লড়েছে। ক্যান্টিনে অবশ্য পুরি-তরকারি চা খেয়েছে। কিন্তু ক্রেনে সামলাবার কঠিন পরিশ্রমে তা কখন হজম হয়ে গেছে। পেটে তার আগুন জ্বলছে। ওদিকে খাবার ঢাকা দিয়ে কমলা ঘুমাচ্ছে। বিজন ঢাকা খুলে দেখে দলাপাকানো সামান্য ভাত, একটা ছোট বাটিতে একটু ডালের জল আর কুমড়োর ঘ্যাঁট জাতীয় কিছু পদার্থ। বাড়িতে এমন খাবার হলে সে খেতই না। কিন্তু এখানে তার উপায় নেই। ওই খাবারই খেতে হয় কোনোমতে। পেটও ভরে না। বিজন দেখেছে কাকিমা ইচ্ছা করেই তার খাবার কম রাখে। রাতেও খান চারেক রুটি দিয়ে আর একখানা রুটি দেয়।

বিজনের স্বাস্থ্যও ভালো। বাড়িতে চাষের ধানের চাল, খেতের আলু-কুমড়ো ঝিঙে হয়। একটু বেশি খায় সে। কিন্তু এখানে এসে এই দয়ার অন্নেই আধপেটা খেয়ে থাকতে হয়। আর এই আধপেটা খেয়েও শুনতে হয় কাকিমার হুল ফোটানো কথা। নিজের অভাব কষ্টের জন্যই এসব সহ্য করতে হয়।

মিঃ মিত্র অবশ্য প্রাচুর্য বিলাসব্যসনের মধ্যেই রয়েছে। অতীতে সে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে পাস করে এখানে ওখানে চাকরি করেছে। তারপর এই শিয়ালডাঙা আয়রন ফ্যাক্টরিতে চাকরি পায়। অবশ্য চাকরিটা পায় তার শ্বশুর মশায়ের চেষ্টাতেই।

মিঃ মিত্রের স্ত্রী রীনা বাবা ছিলেন কলকাতার এক চাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট ফার্মের কর্মকর্তা। সেখানে ওই আয়রন কোম্পানির হিসাবকিতাব রাখা হয়। নানা ভাবেই ওসব রাখতে হয় যাতে কোম্পানি এখান থেকে বেশির ভাগ টাকাটাই নানাভাবে ইংল্যান্ডে নিয়ে যেতে পারে, এখানের শ্রমিকদের কর্মীদের বঞ্চিত করে।

তাই কোম্পানির কর্তাদের সঙ্গে মিঃ মিত্রের শ্বশুরমশায়ের একটু যেন নিবিড় সম্পর্ক ছিল। সেই সুবাদে ওর বাড়িতেও যায়। রীনার বাবাও সাহেব ঘেঁষা লোক। মেয়েকেও ইংলিশ মিডিয়ামে পড়িয়ে মেমসাহেব করে তুলেছেন।

রীনার বাবার চেষ্টাতেই মিঃ মিত্র চাকরিটা পায় এই কোম্পানিতে। ওয়ার্কস ম্যানেজারের পদটা লোভনীয়ই। একটা সেকশনের সব কাজের ভার—পরিচালনার ভার আসে তার হাতেই।

বিশাল বাগানওয়ালা বাংলো। চারিদিকে সীমা প্রাচীর, গেটে দারোয়ান, বাগানে মালি আউট হাউসে থাকে বেয়ারা। গাড়িও ফ্রি। জামাই আদরেই এসে পা রাখে মিঃ মিত্র আইভিকে নিয়ে এই শিয়ালডাঙার বাংলোয়। রীনাও খুশি হয়। মিত্র জানাতে চায় এই রাজত্ব পেয়েছে সে এই রীনার দৌলতেই।

এখানে আসার পর অফিসার্স ক্লাবে ওদের রিসেপশন পার্টি দেওয়া হল ক্লাবের পক্ষ থেকে। রীনা সেজেছে দারুণ। আর সে সুন্দরীও। নিজেকে সাজিয়ে গুছিয়ে পুরুষের দরবারে নিপুণভাবে তুলে ধরার কৌশলও সে জানে। তাই ক্লাবে গিয়ে মিত্রকে ছেড়ে সাহেবদের নজর পড়ে রীনার উপরই। ও যেন একটা অগ্নিশিখার মত ঘুরছে আর তার উত্তাপও ছড়াচ্ছে। মিঃ মিত্রও পরিচিত হন জেনারেল ম্যানেজার, বিজনেস ম্যানেজার, ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার, অন্য সব ওয়ার্ক ম্যানেজারের সঙ্গে। সেদিনের পার্টিতে উইলসনও আসতে বাধ্য হয়েছে নোরার চাপে। পারিবারিক অশান্তি এড়াবার জন্য পাগলা উইলসন মাঝে মাঝে রিহার্সল ছেড়ে এদিকে আসে যেন মজা দেখতেই। মিঃ রায় বলে,

—মিঃ মিত্র এই উইলসন। স্প্যান সেকশনের ম্যানেজার। দারুণ অভিনেতা।

রীনা দেখে মাত্র। তার নজর তখন অন্য বড় সাহেবদের দিকে। সে জানে তাকে এখানেই থামলে চলবে না। এই ক্লাবের পুরুষদের সে নাচাবে নানা ভাবে।

মিঃ মিত্রও তার যোগ্য স্বামী। সে জানে তার উন্নতি ওই রীনার জন্য। তাই তাকে চলতে হবে রীনার প্ল্যানেই।

ডিনারের আগে বেয়ারারা মদ দিচ্ছে ট্রেতে করে। মেয়েদের জন্য ওদিকে ট্রেতে করে সফট্ ড্রিংক্স নিয়ে যায়। অর্থাৎ ঠাণ্ডা পানীয়ই। সাহেবরাও রীনার মতো মেয়েকে পেয়ে খুশি। মিঃ মিত্রকে ছাড়িয়ে ওদের নজর রীনার দিকেই।

মিঃ রায় ননফেরাস ডিভিশনের ম্যানেজার। তার স্ত্রী মিসেস রায়ই এতদিন ক্লাবে সাহেবদের একটু বিশেষ নজর কেড়ে এসেছে। এ নিয়ে রিটার গর্বও ছিল মনে মনে। আর এই রিটার জন্যই মিঃ রায় দুতিনজনকে টপকেই ওই ম্যানেজারের পদ পেয়েছিল।

এ নিয়ে ক্লাবে বেশ আলোচনাও হয়েছিল। বঞ্চিত মিঃ ভকত হেড অফিসেও লিখেছিল তার উপর অবিচারের কথা। অবশ্য সেসব ব্যাপার এখানের জেনারেল ম্যানেজারই চাপা দিয়েছিলেন। ভকতকে অন্য সেকসনে প্রমোশন দিয়ে। তাই রিটার সঙ্গে বড় সাহেবের একটা সম্পর্কও গড়ে ওঠে।

রিটা রীনার সঙ্গে অবশ্য হেসেই কথা বলে।—

ওয়েলকাম্ টু দ্য ক্লাব মিসেস মিত্র—।

রীনাও দেখছে রিটাকে। সে অবশ্য বুঝেছে এই রিটাও এখানে বেশ গেড়ে বসেছে। তার রূপ অবশ্য এখন পশ্চিম দিকে ঝুঁকেছে। এবার রীনা-ই হবে এখানে নাম্বার ওয়ান।

আইভি বড় সাহেবের মিসেস-এর সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজারের মিসেস-এরও ভালো লেগেছে রীনাকে।

মিঃ করবেট এখানের তরুণ ম্যানেজার, বিয়ে থা করেনি। সদ্য জয়েন করেছে এখানে। ব্যাচেলর হিসাবে এখনও সে যেন ঠিক এই সমাজে মিশতে পারেনি, রীনা দেখছে তাকে।

করবেটও দেখে রীনাকে। ওর হাতে হুইস্কির গ্লাস, এর মধ্যে দুএক পেগ পান করে রীনার নেশাটাও রঙিন হয়ে উঠেছে।

মিসেস রিটা রায় দেখছে রীনার ওই নতুন মূর্তি। এবার সেও ভাবনাতে পড়ে। মিঃ মিত্রও বুঝেছে এবার এখানে তার থাকাটা সহজই হবে তার জন্য সব পথ পরিষ্কার করে দেবে রীনা। মিঃ মিত্র এখন মোল্ডিং সেকশনের ম্যানেজার। তবে এখানেই থাকলে হবে না। তাকে আরও উপরে উঠতে হবে। ওদিকের বিরাট শেডে বিদেশের কোন পাইপ লাইন থেকে কোম্পানির তিনচারটে আউটলেট দিয়ে একটা বিশাল মোল্ড তৈরি করা হচ্ছে।

আরও ছোটবড় নানা ধরনের মোল্ডিং-এর কাজ চলছে। মাথার উপর দিয়ে ম্যাগনেটিক ক্রেন বিশাল আকারের মাল নিয়ে যাচ্ছে। মিঃ মিত্রর চোখের সামনে ভেসে ওঠে। কারখানার এই ধোঁয়া ধুলো উত্তাপের মধ্যে নয়, সে ওদিকের বিশাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসে ঠাণ্ডা ঘরে বসে আরামে কাজ করছে।

সেই দিনের জন্যই তার রীনাকে দরকার।

—স্যার, খুব ঘামছেন; নিন স্যার কোল্ড ড্রিংক্স এনেছি।

মিঃ মিত্র কার্তিকবাবুর ডাকে চাইল। শেডের একদিকেই তার একটা চেম্বার আছে। এয়ার কুলার-টুলার নেই। অবশ্য পাখা চলে সেখানে। ধোঁয়া-ধুলোও রয়েছে।

কার্তিকবাবু এখানের ঠিকাদার। কার্তিকবাবু এখানে কারখানার বিভিন্ন সেকশনে ঠিকার কাজ করে তার নিজের ঠিকা শ্রমিকদের নিয়ে। তার লোকজন মোল্ডিং-এর কাজের ফেসিং তৈরি করে। মালপত্র আনা নেওয়ার কাজ করে। কার্তিকবাবু বেশ কিছুদিন থেকেই এই কাজ করে এখন হাল ফিরিয়েছে।

শিয়ালডাঙা থেকে মাইল তিনেক দূরে ওই পাহাড়তলির কাছে তার বাড়ি। ওদিকে পাহাড় বনের বুক চিরে একটা ছোট নদী বয়ে গিয়ে বরাকর নদীতে পড়েছে। ওই বনপাহাড়ে সে একটা সুন্দর ফার্ম গড়ে তুলেছে, আর গড়েছে নির্জন একটা বাগান ঘেরা বাংলো। ওই বাংলোটায় কার্তিকবাবু কারখানার সাহেবদের কোম্পানি ম্যানেজারদের নিয়ে গিয়ে বিশেষ ভাবে আপ্যায়িত করে। ফলে সাহেবরাও খুশি কার্তিকবাবুরও ব্যবসা বাড়ে।

মিঃ মিত্রকেও কার্তিকবাবু খুশি করতে চায়। এখানে অনেক কাজই সে দিতে পারে কার্তিককে।

মিঃ মিত্র ঠাণ্ডা পানীয় পেয়ে বলে—বিয়ার নয়?

কার্তিক বলে—আনছি স্যার। একদিন গরিবের ওখানে চলুন। বিয়ার নয়, স্কচই পাবেন। সেইসঙ্গে মানে...

মিঃ মিত্রও রসিক লোক। আইভিকে দিয়ে ঘর সাজানো যায়। কাজ উদ্ধার করা যায়। আইভি যেন মক্ষীরানী—একজন স্তাবক নিয়ে সে খুশি নয়, মিঃ মিত্র তাই কাজ উদ্ধারের জন্য রাশ একটু ছেড়েই রাখে। তার নজর অন্যদিকে। তাই কার্তিকের টোপটাকে সহজেই বুঝতে পারে। কিন্তু সেও গভীর জলের মাছ সহজে টোপ গিলতে চায় না। তাই কার্তিকের কথায় বলে,

—এখন বিজি কার্তিকবাবু।

কার্তিকও সাহেবদের নিয়ে নাড়াচাড়া করেছে তাদের ম্যানেজ করতে জানে। তাই বলে,

—চলি স্যার, পরে আসব। গরিবের কথাটা একটু মনে রাখবেন স্যার।

কার্তিক চলে যায় অন্য সেকশনের কর্তাদের ম্যানেজ করতে। নিতাইবাবু শিয়ালডাঙার পুরোনো বাসিন্দাদের একজন। নিতাইবাবুদের এই এলাকায় বেশ নামডাক। তখন শিয়ালডাঙার এদিকে ছিল ওই জি টি রোড। রেললাইনও হয়নি। চারিদিকে রুক্ষ প্রান্তর। পলাপ বন খেজুরের ঝোপ আর ওই পাহাড় ছিল তখন গহন বনে ঢাকা। চিতাবাঘ নেকড়ে বুনোশুয়োর সবই ছিল।

নিতাইবাবুর বাবা ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী। কোনো বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই বন পাহাড়ে সেই আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। নিতাইবাবু ইতিহাস নিয়ে এম. এ. পাস করেন। তারপর গ্রামে ফিরে এখানে এই শিক্ষাবর্জিত অঞ্চলে শিক্ষার প্রসারের জন্য কাজ করে চলেছেন। নিজেই একটা স্কুল করেন। তখনও জমিদারি চলে যায়নি। জমিদারদের আয়ও ছিল। অবশ্য এখানে চাষের জমিও কম। মাটি বন্ধা অনুর্বর। জলাশয়েরও কোনো ব্যবস্থা নেই। চাষ করতে হয় বৃষ্টির উপর ভরসা করে। বৃষ্টি ঠিকমত হলে কিছু ধান মকাই হবে। না হলে সেবার কোনো ফসলই হবে না। হবে অজন্মা।

তবে তখন এদিকের মাটির নীচেকার অফুরান কয়লার ভাণ্ডার আবিষ্কৃত হয়েছে। আর রেল-যোগাযোগও হয়েছে।

নিতাইবাবুদের ওখানে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে পতিত জমি রয়েছে। এখন সেই জমিতে পাওয়া গেছে কয়লার কয়েকটা স্তর। উপরের স্তরও রয়েছে মাটির কয়েক ফিট নীচে। অর্থাৎ পুকুরের মতো খুঁড়লে কয়লা মিলবে।

ওখানে কোনো কোনো কোম্পানিও কয়লা তোলার কাজ শুরু করেছে। টন প্রতি কয়লার জন্য জমির মালিককে পয়সা দিতে হয়। ফলে নিতাইবাবুদের আমদানিও বেড়ে যায়। জমিদারি থেকে যা পেত, এখন কয়লার থেকে তার অনেক বেশি পরিমাণ টাকাই পাচ্ছে তারা।

কিন্তু নিতাইবাবু তবুও স্কুলের শিক্ষকতা ছাড়েননি। ওটা তার পেশা নয় নেশাতেই দাঁড়িয়েছে। এবার এই শিয়ালডাঙার ইতিহাস, ভারতের লোহা কারখানার ইতিহাস নিয়েই তিনি গবেষণা শুরু করেছেন।

বিজন এখন ক্লাবের লাইব্রেরিতে আসে। পড়ার অভ্যাসটা তার আছে। এখানেই

পরিচয় হয় নিতাইবাবুর সঙ্গে।

তিনি লাইব্রেরির এককোণে রাখা কোম্পানির দু চারখানা পুরোনো দলিল দস্তাবেজ রিপোর্ট দেখছেন। নোট করছেন। ওকে ওই সব পুরোনো নথিপত্র ঘাটতে দেখে বিজনের কেমন বিচিত্র বোধ হয়, লাইব্রেরিতে ওকে এর আগেও দেখেছে। তাই কৌতূহল বশেই জিজ্ঞেস করে বিজন,

—মাস্টার মশাই কদিন ধরেই দেখছি আপনি ওই পুরোনো কাগজপত্র ঘাঁটছেন। কী এত দেখেন ওখানে?

এই প্রশ্ন নিতাইবাবুকে কেউ এখানে করেনি। কারখানা শহরের মানুষরা জানে ডিউটি—ওভারটাইম—প্রডাকশন বোনাস—ইনসেনটিভ এইসব ব্যাপার। তাই নিয়েই হিসাব-কিতাব করে। আর ইদানীং কিছু কর্মচারী এখানের দু-একজন তথাকথিত নেতাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে মিটিং আলোচনা করে। শ্রমিক-স্বার্থের কথা নিয়ে আলোচনা হয়। আর একদল হইচই করে নাটক ফাংশন খেলাধুলা নিয়েই থাকে। নিতাইবাবু এখানে কী করেন তা নিয়ে কেউই কোনো কৌতূহল প্রকাশ করে না।

আজ এই তরুণটিকে হঠাৎ এসব প্রশ্ন করতে দেখে নিতাইবাবু বলেন—এমনিই! দেখছি এসব অতীতের বিচিত্র ইতিহাস। যা ইংরেজ কোনোদিনই প্রকাশ করতে চায়নি, সেই কঠিন সত্যকে প্রকাশ করতে চাই।

উঠে পড়ে নিতাইবাবু। বিজনেরও ভালো লাগে ওই বিচিত্র মানুষটাকে। সেও ওর সঙ্গে বের হয়ে পড়ে।

সন্ধ্যার পর এই বাংলো শহর নির্জন হয়ে পড়ে। পথের দু'দিকে বাগান ঘেরা বাংলো। ওখানে আলো জ্বলে। বাংলোর বাসিন্দারা বাইরে বের হয় কম। পথে লোকও বেশি চলে না।

দু'একজন সাইকেল নিয়ে বেগে চলে যায়। হাওয়া বয় গাছের পাতায়। কারখানার যন্ত্রপাতির শব্দ ভেসে আসে। ওদিকে সেই জলাধারের জলে তারা আভা। ঘুম ভাঙা পাখি ডেকে ওঠে নীরবতা ভেদ করে।

ওদিকে একটা বাতিল বড় কুয়োর মতো। জায়গাটা তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। চারিপাশে গাছগাছালি। বিজন দেখছে ওই বিশাল কুয়োটাকে। অবশ্য ওখানে কোনো মানুষ যায় না, কেউ ব্যবহারও করে না। বিজন বলে—এতবড় কুয়োটাকে ব্যবহার না করে ফেলে রেখেছেন কেন?

নিতাইবাবু চাইলেন, জায়গাটা থমথমে। চারিদিকে গাছগাছালি। নিতাইবাবু বলেন—ওটা কুয়ো নয়।

—তবে, বিজন এর কণ্ঠস্বর যেন একটা বিষণ্ণতার স্পর্শ পায়।

নিতাইবাবু বলেন,

—ওখানে অতীতে কোলিয়ারির চাণক ছিল। চাণক কী জানো?

বিজন বলে,

—মাটির নীচে গভীরে নামার জন্য কোলিয়ারির বড় কুয়ার মতো পথে ডুলি নামানো হতো। ওটা মাটির নীচে নামার পথ।

নিতাইবাবু বলেন,

—তাই-ই। পরে এই কোলিয়ারী পরিত্যক্ত হয়ে যায়। তবে চাণকটা রয়ে গেছে। আর ওখানেই ঘটেছিল এক করুণ ইতিহাস। যার কথা অনেকেই জানে না।

বিজন বলে,

—এদিকে কেউ আসে না স্যার। অনেকে বলে এখানে নাকি ভূতের রাজ্য। অনেকেই গভীর রাতে দেখেছে একজন সাহেব ভূত এই পথে হ্যাট বুট কোট পরে ঘুরে বেড়ায়।

নিতাইবাবু জবাব দেন না। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। চারিদিকে ছায়া অন্ধকারের জটলা। দূরে দূরে দুএকটা আলো জ্বলছে। বাতাসে ভেসে আসে ব্লাস্ট ফার্নেসের এয়ার চার্জিং-এর শব্দ। কোন যন্ত্রপাতির নাড়াচাড়ার আওয়াজ। এদিকে যেন নির্জন নিঃসঙ্গতার রাজ্য। বিজনের মনে হয় সেও যেন দেখছে একটা ছায়ামূর্তিকে—পরনে প্যান্টকোট। ওই অন্ধকারের দিকে যেন জুতোর খটখট শব্দ তুলে সেও চলেছে।

—স্যার। বিজনের কথার স্বরে আতঙ্কের ছাপ। নিতাইবাবু বলেন,

—এ সেই ইতিহাসের এক করুণতম অধ্যায় বিজনবাবু। ইচ্ছে থাকলে বাড়িতে এসো। জানতে পারবে। অবশ্য যদি জানতে চাও।

নিতাইবাবুদের বাড়িটা শিয়ালডাঙা গ্রামের বাইরেই, সহজেই চোখে পড়ে বাড়িটা। অনেকখানি জায়গা জুড়ে পাথর কেটে কেটে ইঁটের মতো তৈরি। যেন অতীতের বহু ইতিহাসের সাক্ষী ওই ছোট কেল্লা। ওই বাড়িটা। অবশ্য এখন ওই প্রাচীন বাড়ির পাশেই নতুন ধরনের একটা বড় দোতলা বাড়ি উঠেছে। এদিকে গেট। সারা এলাকাটা প্রাচীর ঘেরা। ভিতরে বেশ কিছু গাছগাছালিও রয়েছে। আর তার পাশে ফাঁকা জায়গাতে এখন গোলাপ ফুলের বেড, বটল পান এসব গাছও রয়েছে। প্রাচীন ও আধুনিকের সংমিশ্রণ ঘটেছে এখানে।

নিতাইবাবু ঘরটা বাগানের পাশেই। সারা ঘরে আলমারিতে বই কাগজপত্র। দুচারটে পুঁথিও রয়েছে। নিতাইবাবু কিসব লিখছিলেন বিজন যে সত্যিই তার বাড়ি অবধি আসবে তা ভাবেননি। তাই বিজনকে দেখে খুশিই হন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে সাদর অভ্যর্থনা জানান।

—আরে এসো এসো বিজনবাবু।

বিজন বলে,

—আজ ছুটি তাই চলে এলাম আপনার কাছে।

এর মধ্যে বাড়ির ভিতর থেকে একটি মেয়ে ট্রেতে ওদের জন্য দু কাপ চা-বিস্কুট আনে। সুন্দরী বলা চলে মেয়েটিকে। রূপের উদ্ধত প্রকাশ নেই। চোখে মুখে একটা শান্ত শ্রী রয়েছে। নিতাইবাবু বলেন,

—আমার ভাইঝি, সীমা।

মেয়েটি ওকে দেখে নমস্কার করে। নিতাইবাবু বলেন,

—এ বিজন কারখানায় কাজ করে। বড় ভালো ছেলে।

সীমা চলে যায়। নিতাইবাবু বলেন,

—এবার হায়ার সেকেন্ডারি দেবে। বাবা মারা যাবার পর আমিই ওকে মানুষ করেছি, পড়াশুনাতেও ভালো। নাও চা খাও।

বিজন বলে,

—সেই চাণকের কি যেন ইতিহাসের কথা বলছিলেন স্যার।

নিতাইবাবু বলেন,

—সে তো অনেক লম্বা কাহিনী হে! তা লোহা কারখানার কাজ করছ যেখানে অন্ন জুটছে তার ইতিহাস জানতে অবশ্য এখানে কেউ চায় না। হঠাৎ দেখলাম তুমিই এসেছ। তার আগে এই এলাকার অতীতের রূপটার কিছুটা আভাস তোমাকে পেতে হবে।

বিজনও আগ্রহী হয়ে ওঠে। সে বলে,

—তা তো বটেই।

নিতাইবাবু বলেন,

—ব্রিটিশ তখন এদেশে জুড়ে বসেছে। ওদিকে নীলচাষ শুরু করেছে। তরাই-এর ঘন বন কেটে সেখানে চীনদেশ থেকে প্ল্যান্টার এনে চা বাগানের পত্তনও করেছে।

অর্থাৎ এই দেশের যেখানে যত রকম সম্পদের সন্ধান পেয়েছে তাকে আয়ত্ত করে তারা ভারবর্ষকে লুঠ করার কাজ শুরু করে। এদেশে মাটির নীচে কয়লার সন্ধান পেয়ে তারা এদিকেও থাবা গেড়েছিল। ব্রিটিশ কোম্পানিগুলো এবার কয়লা তোলার কাজে লেগে পড়ে। রেলপথও তৈরি করলো রানীগঞ্জ অবধি কয়লা নিয়ে যাবার জন্য।

তখনও লোহা কারখানা তৈরি হয়নি। ওই অঞ্চলের পাহাড়ে কিছু আকরিক লোহা অর্থাৎ আয়রন ওর ছিল। এখানের লোহার সম্প্রদায় সেইসব আয়রন ওর সংগ্রহ করেন কয়লা চুনাপাথরও আছে। দামোদরের ওদিকে সেইসব সংগ্রহ করে মুঠিতে করে হাপরের হাওয়া দিয়ে সামান্য লোহা বের করে তার থেকে হাল লাঙলের ফলা, কুঠার, কোদাল এইসব তৈরি করতো। অবশ্য তার পরিমাণ ছিল কমই। তবু স্থানীয় লোকেদের কাজে লাগতো ওইসব।

হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকাতেই বিজনের খেয়াল হয় দুপুর হয়ে গেছে। সামনে জীবনের পরীক্ষা সকালে তাকে পড়াতে হতো। কিন্তু এখানে এসে একেবারেই ভুলে গেছে।

তবু দুপুরেই বসতে পারবে। তাই বিজন বলে,

—স্যার। আজ উঠতে হবে। বেলা হয়ে গেছে।

নিতাইবাবু এমন মুগ্ধ শ্রোতা পেয়ে বেশ খুশিই হয়ে ইতিহাসের এক অধ্যায়কে তুলে ধরেছিলেন। ওদিকে সীমাও এসে হাজির।

—জেঠুমণি স্নান করবেন?

নিতাইবাবু বলেন,

—আমারও তাড়া এসে গেছে। সীমার টাইম জ্ঞান খুব বেশি হে, আজ তাহলে উঠি। চলে এসো সময় পেলেই। এসব কথাতো কেউ জানতেও চায় না তবু তোমার আগ্রহ রয়েছে দেখছি।

বিজন বলে,

—আসব স্যার। আজ চলি,

কমলা বিজনের উপর মোটেই খুশি নয়। ছেলেটা এখানে এসে চাকরি করছে। মাইনেও পায় ভালো। ওর কাজে নাকি সাহেবরা খুশি। অবিনাশবাবু বলে,

—প্রমোশন পেয়ে যাবে ও। কোয়ার্টারও পাবে।

কমলা বলে,

—কদ্দিন আর থাকবে এখানে। জীবনকে কি পড়ায় বুঝেছি। আজ তো পড়াতেই বসেনি। ছুটির দিন দিনভোর পড়াবে তা নয় গেলেন বন্ধুদের সাথে আড্ডা মারতে।

বিজন অবশ্য তেমন কোথাও বের হয় না। তারই সহকর্মী মানস রতনরা থাকে কোম্পানির মেসে। ওই বাগানের ওদিকে পাশাপাশি তিনচারখানা বড় বাড়ি রয়েছে ওখানে কারিগর কর্মচারীদের অনেকে মেস করে থাকে। কোম্পানি থেকে বাড়িগুলো দেওয়া হয় আর যারা থাকে তারাই নিজেরা মেস সিস্টেমে ঘরটা ভাগাভাগি করে থাকে ওখানে। ঠাকুর চাকরও রাখে তারাই। বিজন ওদের ওখানেও মাঝে মাঝে যায়। দেখে মনে হয় ওরা বেশ ভালোই আছে। শান্তিতে আছে। বিজনেরও মনে হয় কাকিমার ওইসব কথা শোনার চেয়ে সে এদের সঙ্গে মেসে এসে স্বাধীনভাবে থাকবে।

কিন্তু কাকার জন্যই পারেনি কথাটা বলতে। কারণ কাকাই তাকে চাকরিটা করে দিয়েছেন আর কাকাবাবু যে কাকিমাকেও একটু বদলাতে বলেন সেইসব কথাও শুনেছে সে। তাই কাকিমার কথা সহ্য করেই পড়ে আছে এখানে।

বেলা হয়ে গেছে। বিজন ফিরছে বাড়িতে। অবিনাশবাবুর আজ ডিউটি। সে বের হয়ে গেছে। কাকীমা বলেন,

—অ্যাই এলেন আড্ডা মেরে। নাও এবার চান-খাওয়া করে আমাকে কেতাথ করো।

কুসুম বলে—মা!

জীবন তখন খেয়ে দেয়ে ঘুমোচ্ছে। পড়ার জন্য তার কোনো ভাবনাই নেই। বিজন চুপ করে স্নান সেরে এবার তোলে জীবনকে।

—জীবন ওঠো, পড়তে বসো।

কমলা বলে—পড়ার সময় পড়া আর ঘুমের সময় ঘুম। বাছা সবে শুয়েছে অমনি ডাকছ।

বিজন বলে—পরীক্ষার পড়া পড়তে হবে না কাকিমা। ঘুমের সময় এখন নয়।

জীবনকে পাস করানোর দায়িত্ব যেন তারই, বিজনেরই। নাহলে পরে কাকিমা কি মূর্তি ধরবে সেটা কিছুটা অনুমান করতে পারে বিজন।

শিয়ালডাঙা—এত বড় কারখানা শহরকে কেন্দ্র করে আর আশপাশে দুচারটে কোম্পানিকে কেন্দ্র করে এখানে এখন বেশ বড় বাজারই গড়ে উঠেছে। বাংলোর

সাহেবদের—সাধারণ হাজার হাজার কর্মীদের জন্য হাট-বাজার চাই।

অবশ্য হাসপাতাল গড়েছে কোম্পানিই। আর বাজার গড়ে উঠেছে প্রধানত স্টেশনের ওদিকে কারখানার জায়গার বাইরে, গ্রামের জায়গাতেই। এখন গ্রাম আর নয় তিনতলা চারতলা বাড়িও উঠেছে। হবে না বিস্তীর্ণ প্রান্তরে বেশ কিছু গুদাম শহরকে কেন্দ্র করে ব্যবসায়ী মহলও গড়ে বসেছে এখানে, সব রকম দোকানই রয়েছে।

ওই বাজার মহল্লার পিছনেই বিরাট বস্তি। বাইরের বহু লোকজনও এখানে রয়েছে। তাদের মেয়েরাই শহরের বাংলো বিভিন্ন কোয়ার্টারে কাজকর্ম করে। অনেকেই আবার কোলিয়ারি থেকে না হয় ওয়াগন থেকে কয়লা মালপত্র সরিয়ে এখানে-ওখানে বিক্রি করে। না হয় এটা সেটা করে দিন চালায়।

মোহনলাল আগরওয়াল-এর পিতৃদেব বেশ কিছুদিন আগে এখানের বাজারে কাপড়ের দোকান দেয়, তখন তার দোকান ছিল ছোট। স্টকও ছিল কম। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই মোহনলালের পিতৃদেব শেঠজী তার ব্যবসাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তোলে। আর মোহনলাল তখন যুবক। সে একটা মোটর বাইক কিনে ঘুরে বেড়ায়। ওদিকে সেও একটা দোকান দিয়েছে কাপড়ের। কিন্তু মোহনলাল এরই মধ্যে বুঝেছে সোজা পথে ব্যবসা করলে বড়লোক হওয়া যায় না। সে অবশ্য মোটর বাইক নিয়ে সাহেবদের বাংলোতে গিয়ে অর্ডার নিয়ে আসে, মাসকাবারি পেমেন্ট পায় মাল দিয়ে।

আর সে বস্তির বেশ কিছু ছেলেকে নিয়ে এবার অন্য কারবারও শুরু করেছে। বিভিন্ন সাহেবদের সঙ্গে তার খাতির—কারখানাতেও যাতায়াত করে সে। এখন দেখেছে মোহনলাল হাওড়ার অনেক ছোট ছোট লোহা ঢালাই কারখানাতেও লোহার দরকার। ওই স্ল্যাগ-এর পাহাড় পড়ে আছে। হাওড়ার কারখানার লোকজনও আসে মোহনলালের কাছে। তারাই বলে,—ওই যে পাহাড় হয়ে পড়ে আছে স্ল্যাগগুলো। ওতেও লোহার পরিমাণ অনেক। ওই মাল পেলেই আমরা তা গলিয়ে লোহা বের করে কড়াই বালতি—এসব বানাতে পারি। অন্যদের ট্রাকে মাল পাচার করো—ভালো দামই দেব।

মোহনলাল অবশ্য এর মধ্যে একটা ব্যবসা শুরু করেছে। এখানে মাটির নীচেই রয়েছে কয়লা। কোলিয়ারীতেও থাকে কয়লার স্তূপ। তবে মালিকদের কড়া পাহারা থাকে। ওয়াগন করে কয়লাও যায় প্রচুর। ওসব তখন রেলকোম্পানির মাল। মোহনলাল তার দলকে নিয়ে ওই রেলের ড্রাইভারদের কিছু টাকা দিয়ে গাড়িটাকে মন্থর গতি করিয়ে দেয় আর তার লোকজন তখন নির্জন বনের মধ্যে ওয়াগন থেকে কয়লার চাঁই ফেলে দিতে থাকে। তার পরিমাণও কম নয়।

এইভাবেও সে ওই বাহিনীকে দিয়ে থুয়ে কিছু পায়। এবার ওই স্ল্যাগ ব্যাঙ্ক থেকে মালই পাচার করবে। মোহনলাল জানে কোন দেবতাকে কি পূজা দিতে হবে। আর একাজে সে সঙ্গী করে নেয় ওই কার্তিকবাবুকেই।

কার্তিকবাবু কোম্পানির ঠিকেদার, সাহেবদের সঙ্গে তার চেনাজানা। ওই মিত্র সাহেব এখন কার্তিকের হাতের লোকই হয়ে উঠেছে। কার্তিকও মোহনলালের কথা

শুনে খুশি হয়। পাহাড় হয়ে পড়ে আছে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ওই দীর্ঘবছরের বাতিল স্ল্যাগগুলো। ওদিকে কেউ যায় না। নীচের দিকে এখন বুনোগাছের জটলা। সাপের রাজ্য। পিছনেই পাহাড়-বন, কার্তিকবাবু বলে,

—আমার সিকি ভাগ চাই, আর বাকি তোমার। আমি ধরণীবাবুকেও বলে রাখছি। তুমি ওই বনের দিক থেকে একটু সুড়ঙ্গ মত করে মাল তুলতে থাকো। তবে ফাঁকি দিও না আমাকে।

মোহনলাল বলে,

—এ ব্যবসাতে নিজেদের মধ্যে ফাঁকফোকর থাকে না। কার্তিকদা! তবে ধরণীবাবুকে কেন?

—ধরণীবাবু এখন এখানের কারখানার শ্রমিক নেতা। আর বেশ জনপ্রিয় লোক। কার্তিক বলে,

—আর তাছাড়া আটঘাট বেঁধেই কাজ করতে হয় হে! মোহনলাল। এসব কাজে কাকে কখন দরকার লাগে কে জানে? ওকে প্রণামীটা আমিই দোব—তোমার নামও করব না।

মোহনলাল এরপর কয়লার সঙ্গে সঙ্গে কারখানার স্ল্যাগ-এর চালানের কাজও শুরু করে। রাতের অন্ধকারে ট্রাকগুলো আসে ওই পাহাড়ের দিকে। তার আগেই মোহনের লোকজন ওই পাহাড়ের পিছন দিকে স্ল্যাগের পাহাড় থেকে রাশ রাশ মাল কেটে রাখে আর রাতারাতি সেসব মাল পাচার হয়ে যায়।

ধরণীধরবাবু অতীতে এই কারখানার ফিটার হিসাবে কাজ করতো। তবে ধরণী এমনিতে বেশ চালু ধরনের লোক। এর আগে হাওড়ার কোন লেদ কারখানায় কাজ করতো। সেখানে মালিক তাকে ছেলেবেলা থেকে কাজে এনেছিল। হাতের কাজও ভালো শেখে, এমনিতে বেশ বলিয়ে করিয়ে ছেলে। ফলে পার্টিদের সঙ্গে তার যোগাযোগও গড়ে ওঠে, কাজকর্মও ভালোই জানে। মালিকও খুশি। তাকে বিশ্বাস করে কারখানার ভার দেয়। সেই মালিক মান্নাবাবুর অন্য সব ব্যবসাও আছে। সেখানে কড়াই বালতি ইত্যাদি তৈরি হয়। তার এই কারখানা দেখাশোনা করে ধরণী।

প্রথমদিকে মালিককে লাভের মুখও দেখায় ধরণী। আরও অর্ডার আসতে থাকে। কাঁচামালও কিনতে হয় প্রচুর টাকার। দু একবছর মন্দা যায়। কিন্তু তারপর মালিক খোঁজ-খবর নিয়ে দেখে ধরণী তারই পায়ের নীচে থেকে নিজের কাজ গুছিয়ে নিয়েছে এই কবছরে ধরণী প্রচুর টাকার কাঁচামাল মেরে এবার কারখানার চাকরি ছেড়ে দিয়ে বেপাত্তা হয়ে যায়।

মান্নাবাবু অনেক খোঁজখবর করেও ধরণীর আর পাত্তা পায় না। ছেলেটা যেন কর্পূরের মতো উবে গেছে। অবশ্য মান্নাবাবু যথারীতি থানাতেও খবর দেয়। কিন্তু ধরণীর হদিস আর মেলে না। তার কয়েকমাস পরে ধরণী এসে হাজির হয় শিয়ালডাঙার কারখানায়, হাতের কাজ জানে। তখনও কাজের লোকেদের চাকরি হতো। দাদাদের লোকেদের নয়। তাই ধরণী এখানে কাজ পেয়ে যায়।

ধরণী এবার যেন অন্যমানুষ, সে এখন এখানে সহকর্মীদের নানাভাবে সাহায্য করে। কারোও চিকিৎসার দরকার ধরণীই হাজির, সে অবারিত ভাবে তাকে হাসপাতালে আনে, চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। কোনো শ্রমিক কোম্পানি থেকে ঋণের দরকার। ধরণীই তার হয়ে ফর্ম ভর্তি করে তদবির করে অফিসে। কারো মেডিক্যাল লিভের দরকার ধরনী হাজির হয়, হাসপাতালে দৌড়ঝাঁপ করে ছুটির ব্যবস্থা করে।

শ্রমিক ধাওড়ার পানীয় জলের লাইন নেই। ধরণীকেই বলে সবাই। ধরণীও টাউন ডিপার্টমেন্টে গিয়ে ওয়াটার ডিভিসনে হাজির হয়ে ওকে দাদা তাকে ভাই বলে সাহেবদের কাতর নিবেদন জানিয়ে ওসব করে।

কুলি ধাওড়া বাবুপাড়ায় পথে আলো ঠিকমত নেই ধরণী এবার হাটতলায় শ্রমিক কর্মচারীদের সমবেত করে দারুণ ভাষণ দিয়ে তাদেরও সচেতন করে তোলে। ডেপুটি ম্যানেজারের কাছে ডেপুটেশন দিয়ে কদিন পরই সব ব্যবস্থা করে দেয়। ক্রমশ ধরণী শিয়ালডাঙার কারখানার শ্রমিকদের কাছে একটি পরিচিত নাম হয়ে ওঠে। আপদে বিপদে সে সকলের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। শ্রমিকদের স্বার্থ নিয়ে কারখানার পাবলিক রিলেশন অফিসারদের সঙ্গে বৈঠক করে। আর শ্রমিকদের নিয়ে মিটিং মিছিলও করে কারখানার পরিবেশকে সরগরম করে তোলে।

ফলে ম্যানেজার ওয়ার্কস ম্যানেজারও তাদের কিছু দিতে বাধ্য হয়। তবে তারাও বিপদে পড়েছে। কারণ শ্রমিকদের দাবি মেটাতে খরচাও বাড়ে আর তার জন্য ওদের হেড অফিসে নানা কৈফিয়ত দিতে হয়। চিফ লেবার অফিসার মিঃ রবার্টও এ নিয়ে ভেবেছে। এমনিতে বেশ কৌশলী লোক সে। কোম্পানির ম্যানেজমেন্ট গ্রুপের মিটিংও হয়। জেনারেল ম্যানেজার বলেন,

—মিঃ রবার্ট! দ্যাট ধরণীকে একটু সামলাও। ওর জন্য শেষে কারখানায় অশান্তি না হয়।

ডেপুটি ম্যানেজারও বলে—শ্রমিকরা একবার কিছু পেতে থাকলে ওদের পাওয়ার লোভও বেড়ে যাবে। শেষে ওরা ধর্মঘটই না করে বসে। মিঃ রবার্ট বলে—তাই দেখছি স্যার। ধরণীকে একটু সাইজ করতে হবে। বলুন তো ওকে ডিউটিতে অবহেলার জন্য চার্জশিট দিই। তারপর আরও কোনো গ্রাউন্ড দেখিয়ে সাসপেন্ড করব। মিঃ জনসন বলে,

—নো—নো। ওতে ধরণীর পজিশন আরও বেড়ে যাবে। লেবারদের সে খেপিয়ে তুলে অশান্তি বাড়াবে, তার চেয়ে অন্য পথ ভেবে দেখতে হবে।

পাইপের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে জেনারেল ম্যানেজার বলে, —ওর আগেকার রেকর্ড যদি পারো তবে হাতাতে চেষ্টা করো। তারপর এর ব্যবস্থা করতে হবে।

লেবার অফিসার বলে,

—সেসব জেনে নেব স্যার। শুনেছি হাওড়ার এক লেদ ফ্যাক্টরিতে কাজ করত। ওখানেও আমার চেনাজানা লোক আছে আমি খবর নিচ্ছি।

ধরণীর এই নেতাগিরিতে এবার সাহেবরাও ভাবনাতে পড়েছে।

কার্তিকবাবু কারখানার ঠিকাদার। তারও লেবার নিয়েই কাজ। তাই কার্তিকবাবু ধরণীর কোয়ার্টারেও যায়। অবশ্য কার্তিক ঘুঘু ব্যক্তি, জানে প্রতিটি মানুষের একটি

দুর্বল স্থান আছে। তাই কার্তিক সেই জায়গাতেই আঘাত করতে চায়, কাজ হাসিল করার জন্য।

এমনি দিনে আসে কার্তিকবাবু। সঙ্গে এনেছে একটা দামি শাড়ি আর একটা বেশ নধর সাইজের মাছ।

ধরণী চেনে কার্তিককে। সে বলে,

—এসব কি কার্তিকদা।

কার্তিক বলে,—বৌদির জন্য শাড়িটা আনলাম আর পুকুরে মাছ ধরা হচ্ছিল—তাই একটা মাছ।

বাসন্তী বলে,

—ওমা! এ যে খুব সুন্দর শাড়ি। এত বড় মাছ—

কার্তিক বলে,

—ধরণী তো কিছুই নেয় না। বিনি খরচায় জনসেবা করে। আমাদের জন্য ভাবে। তাই ধরণীর জন্য ভাবনা হয়।

ধরণী বলে,

—আমার জন্য ভাবনা!

কার্তিক বলে,

—সকলের জন্য ভাবছ। এবার নিজের আখেরের কথাও ভাব ধরণী। কাজ তো করবেই, তবে এর জন্য উপরওয়ালারাও কিছু নেন কিছু না করে। তুমি সব কিছু করেও কিছু নেবে না কেন?

বাসন্তীও কার্তিকের কথায় বলে,

—ওই কথাটা বোঝান ওকে ঠাকুর পো।

কার্তিকবাবু বলে,

—সব ঠিক আছে বৌদি, সবই বুঝবে, তবে প্রথম প্রথম একটু সমীহ করে তারপর সাইজে এসে যায়।

আরে বাবা নেতা গিরি করছো—তোদের নিজেরও তো সংসার আছে ভবিষ্যৎ আছে। তার কথা তো ভাবতে হবে।

ধরণীও এবার যেন ভাবছে ওই কথাই।

কার্তিক এবার মোহনলালের প্রস্তাবটা দেয়। অবশ্য সঙ্গে হাজার দশেক টাকা এনেছে। বাসন্তী এতদিন পর টাকাটা পেয়ে খুশি হয়। বাসন্তী বলে,

—কোনো গোলমাল হবে না তো?

কার্তিকবাবু বলে,

—না-না, ওরা রাতারাতি বনের পথে মাল পাচার করবে। তাছাড়া কেউ কিছু না বললে কোম্পানিও কিছু বলবে না। ওই স্ল্যাগ তো পড়েই আছে বরং ওসব কিছু তুলে নিতে পারলে গ্রামের লোকের চাষের জমি হবে। ফসল হবে। গ্রামের লোকের উপকারই হবে। ধরণী তুমি শুধু চুপ করে থাকবে, মাসে মাসে দশহাজার টাকা পাবে।

ধরণী ভাবতে থাকে, কার্তিক আরও দম দেবার জন্য বলে,

—অবশ্য তুমি যদি না নাও ঠকবে। কেশবদাই এটা গিলে ফেলবে। তুমি বোকার মতো ঠকবে।

বাসন্তী বলে,

—অনেক ঠকেছ বাপু। এবার একটু হুঁশিয়ার হও।

কার্তিকও জানে ধরণীকে সাইজ করতে পারলে তবেই কাজ হবে। কারখানার সাহেবদেরও হাতে পাবে কার্তিক। তার ঠিকাদারির কাজও বেশি পাবে। তাই টাকাটা দিয়ে এবার খুশি মনে বের হয়ে আসে কার্তিকবাবু, বলে।

—একটু বুঝে সুঝে পা ফেলো ধরণী। তোমার বরাত ফিরে যাবে। ওয়ার্কস ম্যানেজার জনসন সাহেবের বাংলোতে একবার চলো। তিনিও একবার আলোচনা করতে চান।

বাসন্তীও খুশি।

—তাই যাও গো সাহেবদের সঙ্গে জানাশোনা থাকলে ভালোই হবে। লোকজনের কাজও করতে পারবে নিজেদের কাজও হবে।

ধরণী কথাটা শুনতে থাকে, কথাটা তার মরমে বাজতে থাকে। সেই ধরণী আজ হারিয়ে যায়। সদ্য জাগ্রত যেন অন্য এক ধরণী আজ এগিয়ে আসে। বাসন্তী বলে,

—কি গো! যাবে না সাহেবের কাছে।

ধরণী জানে এবার লেবারদের বোনাসের ব্যাপারে সে আন্দোলন শুরু করেছে। ওয়ার্কস ম্যানেজার তাই চাপে পড়েছে। হয়তো এ নিয়েই আলোচনা করতে চায়। ধরণী বলে,—দেখি ভেবে চিন্তে। ওরা তো বোনাস দিতেই চায় না আমরা দাবি করছি।

বাসন্তী বলে,

—তবে যাও! সাহেবদের খুশিই রাখো দেখবে ভালো থাকবে। ধরণী নতুন করে ভাবতে থাকে।

বিজন যা ভেবেছিল ঠিক তাই ঘটেছে। জীবন এবারও স্কুলের পরীক্ষায় তিনটে সাবজেক্টে ফেল করেছে। অঙ্কে পেয়েছে সাত।

বিজন বলে,

—এই তোমার অঙ্কের নাম্বার!

জীবন বলে,

—অন্যরা টোকাটুকি করে পাস করল। আর আমি নাম্বার পেয়েছি নিজের বুদ্ধির জোরে।

অবিনাশবাবু বলেন,

—ওই তোর বুদ্ধি? তাই এবারও গড়ান দে ক্লাস নাইনে। জীবনে তুই পাস করতে পারবি না। লজ্জা করে না তোর? ইডিয়ট।

কমলা ফুঁসে ওঠে।

—ওকে গালাগাল দিচ্ছ কেন? ফেল করেছে ওর দোষ? যে এখানে থেকে গাণ্ডেপিণ্ডে গিলছে তার কোনো দোষ নেই। সে কী করেছে?

কুসুম মাকে থামাবার চেষ্টা করে,

—কী বলছ মা! বিজনদা ওকে বারবার পড়তে বলেছে, অঙ্ক করতে বলেছে। ও কিছুই করেনি—আড্ডা দিতে বের হয়ে গেছে। না পড়লে কেউ পাস করে?

কমলা ফুঁসে ওঠে,

—তুই আর আমাকে পাস করা শেখাসনি। এমন পাস করা ঢের দেখেছি আমি। আমার ঐ জীবন কত বুদ্ধিমান ছেলে। ওই বিজনের জন্যই ওর বুদ্ধি খুলতে পারল না।

অবিনাশ বলে,—যা-তা বলো না।

কমলা বলে,

—অ! গায়ে লাগছে বুঝি! তোমাদের গুষ্টিকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনেছি। ভাই তো নয় শত্রু। আমার ছেলে পাস করলে হিংসা হবে না? তাই জেনেবুঝেই ওকে ফেল করিয়েছে তোমার ওই গুণধর ভাইপো। দুধকলা দিয়ে কালসাপ পুষেছি।

—ওমা—একি সর্বনাশ হল গো।

কমলা প্রকাশ্যে আরও বলে,

—ঢের হয়েছে, আর নয়। এবার নতুন মাস্টার দ্যাখো—ওই শত্রুকে আর পড়াতে হবে না। ঢের হয়েছে।

অবিনাশবাবু ধমকে ওঠেন।

—থামবে তুমি।

কমলাও গলা তুলে বলে,

—কেন থামব! কেন—হক কথাই বললাম। এই আমার সাফ কথা।

বিজনও ভেবেছিল এমনি একটা কিছুই ঘটবে।

আর সেও এমনি ঘটনার জন্য তৈরিই ছিল। মেসে রতন মণিময়দের বলেই রেখেছিল একটা সিটের জন্য। এবার সেখানেই চলে যাবে বিজন। এরপর আর এখানে থাকা কোনোমতেই উচিত হবে না।

সন্ধ্যা নেমেছে। অবশ্য ফেল করার জন্য জীবনের কোন দুঃখই নেই। রিক্রিয়েশন ক্লাবের হলে সপ্তাহে কদিন সিনেমা দেখানো হয়। কি একটা রগরগে হিন্দি ছবি এসেছে। জীবন সেখানে গেছে।

কমলা বকাবকি করে গুম হয়ে বসে আছে। অবশ্য তখনও মাঝে মাঝে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মতো বাক্য বর্ষণ করছে। অবিনাশবাবু ইষ্টনাম জপ করে বাইরের বারান্দায় বসে আছেন। বিজনকে দেখে ডাকলেন তিনি।

বিজন বলে,

—কাকাবাবু, একটা কথা বলব যদি কিছু মনে না করেন।

অবিনাশ মুখ তুলে চাইল। বিজন বলে,

—এখানে থাকা আর ঠিক হবে না, বাড়িতে অশান্তিই হবে। তার সম্ভাবনা যে প্রচুর এটা অবিনাশও জানেন। তাই চুপ করে থেকে বলেন,

—তাইতো দেখছি। তোমার কাকিমা একেবারে অবুঝ মেয়েছেলে। নিজের ভালোমন্দও বোঝে না। জীবনকে লাই দিয়ে মাথায় তুলেছে।

বিজন বলে,

—তাই ভাবছি মেসে গিয়েই থাকব। অবশ্য যদি বলেন আমি জীবনকে পড়াব। দেখি চেষ্টা করে যদি পাস করাতে পারি।

অবিনাশ বলেন,

—তুমি মেসে গিয়ে থাকবে?

বিজন বলে,

—কাছেই তো মেস। ওখানে আমার বন্ধুবান্ধবরাও রয়েছে।

কুসুম কথাটা শোনে। সেও বলে,

—তাই যাও বিজনদা। এখানে এভাবে এসব কথা শুনে পড়ে থেকো না। মায়ের মুখের রাখঢাক নেই।

অবিনাশ নীরব থেকেই সম্মতি দেন। তিনি একান্ত অসহায়। নিজের অক্ষমতার কথা মুখে প্রকাশ করতে পারেন না।

বিজন সেই সন্ধ্যাতেই এসে মেসে ওঠে।

রতনের ঘরে একটা সিট খালি ছিল। দুজনের থাকার ব্যবস্থা একটা ঘরে। এবার বিজন এসে উঠলো।

রতন বলে,

—আর একজন মেষশাবক-এর সংখ্যা বাড়লো। নে-এবার বুঝবি মজা। মেসের ঘ্যাট খেতে খেতে পেটে চড়া পড়ে যাবে। দিব্যি ছিলি কাকার কাছে।

বিজন কেমন ছিল সেখানে সেকথা অবশ্য এদের বলেনি। আজ সেও যেন মুক্তির আস্বাদ পায়।

রতন বলে,

—তুই একটা অকম্মা! ভাবলাম বিয়েথা করে কোয়ার্টার নিয়ে ঘর বাঁধবি। তা কাউকে জোটাতেও পারলি না। ভালোবেসে ভালো একটা বাসা বাঁধতে পারলি না—এলি কিনা এই ভাগাড়ের মেসে।

বিজন বলে,

—তোরা রয়েছিস, আমি তোদের দেখেই এখানে এলাম।

মানিক বলে,

—থাক্। তবে বিজন লড়ে যা। উইলসন তো তোকে খুব প্যার করে। দ্যাখ প্রমোশন যদি পাস।

বিজনও ভাবছে কথাটা। মেসে এসে এবার সময় কিছুটা পায় সে। মনে পড়ে নিতাইবাবুর কথা।

—চাকরি ছাড়াও করার কিছু আছে বিজন।

পেটের খোরাক জুটছে মনের খোরাকও তো চাই। লেখাপড়া শুরু করো।

সকালে ডিউটি। কয়েক ঘণ্টা ধরে কারখানার ওই বিরাট শব্দ উত্তাপ আর কাজের মধ্যে থাকতে হয়। তখন সে অন্য মানুষ। সে আসনের বুকে ক্রেন চেম্বারে বসে গিয়ার দিতে দিতে হাত ব্যথা হয়ে যায়—টনটন মাল নিয়ে তার ক্রেন শূন্যপথে প্যান করে। সেইসময় মেসিনও যেমন টানটান হয়ে থাকে, তেমনি টানটান হয়ে

থাকে তার দেহের শিরা-উপশিরাগুলো। এক নিমেষের ভুলে চরম বিপদ ঘটতে পারে। তাই সব সময় তাকে সাবধান থাকতে হয়। তখন তার নজর থাকে নীচের দিকে। মালপত্তরের দিকে।

ডিউটি সেরে মেসে ফিরে স্নান খাওয়ার পর এখন তার ছুটি। জীবনের মতো একটা গাধাকে আর চরাতে হয় না। মেসের বিছানায় খাওয়ার পর গা এলিয়ে দেয়। মনে পড়ে গ্রামের কথা। মা-ভাইবোনেদের কথা। সেই সবুজ গ্রাম তখন তার স্মৃতিতে সজীব বর্ণময় হয়ে ওঠে। যেন গ্রামের লক্ষ্মণদাদা—কুঞ্জুবাউরি —আরও তুচ্ছ অনেকে তার ফিরে ফিরে আসে। মনে হয় সে এদের কথাই বলবে—তার মধ্যে যেন একটা চেষ্টা শুরু হয়। কাগজ কলম নিয়ে বসে তার মন চলে যায় এই কারখানার জগৎ থেকে সেই শান্ত গ্রামের জগতে। তার লেখার মধ্যে ফুটে ওঠে সেই মানুষেরই কথাই।

নিতাইবাবুকে এই কথাটা জানাতে চায় বিজন। এই কারখানা শহরে কাগজের বুকে গল্প লেখার কথা শুনলে হাসবে অনেক। বিজন দেখেছে এখানের ম্যাগাজিনে দু একজন কবিতা লেখে। তাদের নিয়ে ঠাট্টা তামাসা হয়। কেউ বলে 'কপিবর'। আরেকজন ফোরম্যান সিগ্রেট টানতে টানতে বলে,

—বর্ষাকালে ব্যাঙের ছাতার মত অনেক কবি দেখছি গজাচ্ছে শিয়ালডাঙায় হে।

বিজন তাদের কাছে এসব আলোচনাও করে না।

আজ তাই সে এসেছে নিতাইবাবুর কাছে। নিতাইবাবু তার লেখা গল্পটা পড়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেন,

—এই তোমার প্রথম লেখা গল্প।

বিজন বলে,

—হ্যাঁ। কিছুই হয়নি বুঝি।

নিতাইবাবু বলেন,

—না হে দারুণ হয়েছে। সারা লেখার মধ্যে একটা মাধুর্য-বক্তব্য সবই আছে। তুমি এটা কলকাতার কোনো পত্রিকায় ডাকে পাঠিয়ে দাও। নিশিভোর পত্রিকার সম্পাদক আমার বন্ধু। ওকেই লিখছি—ওখানেই পাঠাও। দারুণ হয়েছে, ওদেরও নিশ্চয়ই ভালো লাগবে।

বিজন ভাবতেই পারে না যে ওর লেখা কলকাতার নামী পত্রিকাতে কোনোদিন ছাপা হবে। বলে সে,

—ওরা কি ছাপবে স্যার।

নিতাইবাবু বলেন,

—দ্যাখ না, সত্যিকার প্রতিভা থাকলে তাকে কেউ চেপে রাখতে পারে না। পাঠিয়ে দাও। ওরে সীমা—

সীমা আসে, নিতাইবাবু বলেন,

—আরে বিজন দারুণ লেখে। দেখবি ওর লেখা কলকাতার কাগজে লুফে নেবে।

সীমা দেখছে বিজনকে। বিজন ওর চাহনির সামনে বিব্রতবোধ করে।

নিতাইবাবু বলে,

—একটু চা নিয়ে আয়। সীমা ইংলিশে অনার্স নিয়ে পড়ছে, ও বাংলা সাহিত্যের একনিষ্ঠ পাঠিকা।

বিজন এসেছে নিতাইবাবুর কাছে। এখানে সে মনের খোরাক পায়। বলে বিজন,

—সেদিন সাহেবের কথা বলছিলেন—এই কারখানার প্রথম প্রতিষ্ঠাতার কথা।

নিতাইবাবু বলেন—হ্যাঁ হ্যাঁ। তার নাম ছিল মিঃ ম্যান। সেই ম্যান সাহেব ছিলেন জাতিতে জার্মান।

নিতাইবাবুর চোখে ভেসে ওঠে কোন দূর অতীতের ছবি। সেই দিনের ইতিহাস। তখন ইংরেজরা ভারতের বুকে তাদের শাসন কায়েম করেছে। তাদের দেশ থেকে আসছে বিলাতি কাপড় জিনিসপত্র লোহালক্কড় যন্ত্রপাতি মায় খাবার নুন অবধি। ভারতকে তারা পুরোপুরি উপনিবেশ বানিয়ে নিয়েছে। এখানে তাদের পণ্যের বাজার গড়ে তুলেছে।

এবার তারা কয়লা তুলতে শুরু করে এদেশের মাটি থেকে, তরাইয়ের বনপর্বতে শুরু করেছে চায়ের চাষ। যন্ত্রপাতি চাই, 'আয়রন এজ' অর্থাৎ যন্ত্রসভ্যতার যুগ শুরু হয়েছে। রেললাইন পাতার সঙ্গে সঙ্গে লোহার চাহিদাও বাড়ছে। এদেশে তখন কোনো লোহার কারখানা গড়ে ওঠেনি। তার সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখে ইংরেজরা।

সময়টা উনিশ শতকের প্রথম দশক হবে। সেই সময় এক জার্মান ইঞ্জিনিয়ার বাংলার এই কয়লাখনি এলাকার বনপাহাড় অঞ্চলে—দামোদর উপত্যকায়—দামোদরের লাগোয়া ও পরে বাঁকুড়ার পাহাড় অঞ্চলে আসেন। ঘুরতে ঘুরতে তিনি দেখেন এই অঞ্চলে প্রচুর কয়লা আছে। আর শুশুনিয়া পাহাড়ে রয়েছে প্রচুর লাইমস্টোন। তার বিজ্ঞানী মন এবার ভাবে অন্য কথা। লোহা তৈরির জন্য এই দুটো উপকরণ লাগে আর লাগে আকরিক লোহা অর্থাৎ এক ধরনের পাথর যাতে থাকবে প্রায় ষাট ভাগ খনিজ লোহা। দুর্গম বনপাহাড়ে ঘোরেন তিনি। আর দেখেন এই শিয়ালডাঙার পর্বত অঞ্চলের আদিবাসীরা সেখানে বড় বড় মুচি পাথরের তৈরি উত্তাপসহনশীল পাত্রে লোহাপাথর, চুনাপাথর আর কয়লা দিয়ে বড় হাপরের সাহায্যে প্রচুর হাওয়া দিয়ে স্থানীয় কামারশালে লোহা বের করে তার থেকে হাল-চাষের জন্য যন্ত্রপাতি—দা, কুড়ুল এসব তৈরি করে নিপুণভাবে।

মিঃ ম্যান ছিলেন বিজ্ঞানের ছাত্র। এবার তার মাথায় পরিকল্পনাটা আসে। তিনটে উপকরণই রয়েছে হাতের কাছে আর বেশ কিছু নিপুণ কারিগরও রয়েছে এখানে—যারা বংশানুক্রমে এই কাজ করে আসছে। মিঃ ম্যান তখন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই ভাবনা-চিন্তা করে এখানের লোহা কারখানা গড়ার সিদ্ধান্ত নেন।

কলকাতায় ফিরে গিয়ে তিনি এবার তাঁর দেশের সঙ্গে যোগাযোগ করে কিছু যন্ত্রপাতি আনাবার ব্যবস্থা করেন। আর সেইসঙ্গে মূলধনও জোগাড় করেন। ইংরেজদের উপনিবেশ তবু মিঃ ম্যান জাতিতে জার্মান হয়েই তাদের সমাজে মেলামেশা করতে থাকেন। আর বিয়ে করেন এক ইংরেজ মহিলাকে। ফলে ইংরেজরাও তাকে কিছুটা মেনে নিয়েছিল।

এরপর মিঃ ম্যান তার কারখানার পত্তন শুরু করেন। এই পাহাড়-বন ঢাকা

পরিত্যক্ত শিয়ালডাঙার প্রান্তরে। এর জন্য প্রথমে ইংরেজরা ওকে পাগলই বলে। তার ওই কারখানা তৈরিতে তারা কোনো গুরুত্বই দেয়নি। মিঃ ম্যান জার্মানি থেকে দু চারজন ইঞ্জিনিয়ারকে এনে এখানে প্রথম লোহা গলাবার জন্য ব্লাস্ট ফার্নেস তৈরি করেন। কারণ লোহার অন্য জিনিস তৈরি করতে গেলে চাই লোহা। সেই লোহাকে ঢালাই করে অন্য সব জিনিস তৈরি হবে।

শিয়ালডাঙার প্রান্তরে গড়ে উঠেছে নতুন কারখানা আর বেশ কিছু বাংলো। ওদিকে লেবারদের কোয়ার্টার।

জনমানসহীন প্রান্তরে শুরু হয়েছে কর্মযজ্ঞ। বড় চিমনি—বিভিন্ন শেড গড়ে উঠেছে। কাছেই বরাকর নদী। সেখানের বড় পাইপ পুঁতে অফুরান জল সংগ্রহ করে এনে ফেলা হচ্ছে। বিশাল এলাকা জুড়ে গড়ে ওঠা জলাধার। ওখান থেকেই কারখানায় শহরে জল সরবরাহ করা হবে।

মিঃ ম্যান সুপরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলেন কারখানা, নতুন টাউনশিপ। ওদিকে চড়াই উৎরাই-এর জমিতে বাবুপাড়া, হাটবাজার ও নতুন স্টেশন হলো। শুরু হলো মিঃ ম্যান-এর কারখানার প্রোডাকশন। জ্বলে উঠলো ব্লাস্ট ফার্নেস সেই লোহা দিয়ে তৈরি হতে লাগল বিভিন্ন সাইজের বড় লোহার পাত, বিম অ্যাঙ্গেল—পাইপ।

আর সেসব জিনিসের খরচাও কম পড়ছে—বিদেশ থেকে ব্রিটিশ এতদিন তাদের ওখানে তৈরি লোহার জিনিসপত্র এনে এখানে তিনগুণ দামে বিক্রি করতো এখানের লোকজন ওই জিনিস বেশি দামেই নিতে বাধ্য হতো কারণ তখন ছিল ওই ব্যবসা ইংরেজদের একচেটিয়া, এখানে তাদের কোনো প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হতে হতো না। এবার মিঃ ম্যানের কারখানার মাল অনেক কম দামে বাজারে আসতে লোকে সেই মাল কিনতে শুরু করলো। আরও আশ্চর্যের কথা মিঃ ম্যানের কারখানার মালের গুণমানও ওই ব্রিটিশদের আমদানি করা মালের গুণমানের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। বরং ভালোই আর দামও কম।

ফলে ওদের ব্যবসাতে এবার মন্দা শুরু হলো। বাজার ধরে ফেললো মিঃ ম্যান-এর মাল। ভারতে তৈরি আর তৈরি করেছে এদেশের কারিগররা। মিঃ ম্যান বাইরে থেকে কিছু ইঞ্জিনিয়ার এনে তাদের দিয়েই এখানের ওই আদিবাসী কারিগর আর কিছু নতুন পাশ করা তরুণদের তালিম দিয়েই কাজে রেখেছেন।

এবার ইংরেজরা পড়লো বিপদে। মিঃ ম্যান যে তাদের বাণিজ্যে এইভাবে হাত বসাবে তা ভাবতে পারেনি ব্রিটিশ। এবার মিঃ ম্যানের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার জন্যই ইংরেজ সরকার নিজেদের লোক দিয়ে এখানেই কারখানা চালু করার কথা ভাবতে শুরু করলেন।

সেই মতো তারাও কারখানা তৈরির কাজ শুরু করেন। ওই এলাকাতেই হরিপুরে তৈরি হলো ইংরেজ বণিকদের কারখানা—তার নামও হলো বাংলার নামের সঙ্গে জড়িয়ে। নামকরণ করা হলো স্টীল কর্পোরেশন অব বেঙ্গল। ওই কারখানা থেকে ম্যান সাহেবের কারখানার দূরত্ব কয়েক মাইল মাত্র। অর্থাৎ ইংরেজরাও ওই জার্মান সাহেবের ব্যবসাকে টেক্কা দেবার জন্য নিজেরাই এবার কারখানা গড়লো।

মিঃ ম্যান অবশ্য সব খবরই পান। ওই হীরাপুরে গড়ে ওঠা কারখানাতেও এবার

এলো অনেক ইংরেজ। তারাও ক্লাব-বার-রেস্তোরাঁ গড়ে তুললো।

মিঃ ম্যানের স্ত্রী পামেলা, জার্মানকে বিয়ে করেছিল সত্যি। কিন্তু নিজের জাত্যভিমানকে ভুলতে পারেনি। সে ভাবত রাজার জাত সে। ভারতবর্ষ তাদের—তাই একটু নাক উঁচু ভাবই ছিল। জার্মানরা এদেশে উপনিবেশ গড়তে আসেনি। মিঃ ম্যান ভারতে এসে ভারতবর্ষকে বাংলাকে ভালোবেসেছিলেন। তাই এখানের উন্নতিকল্পেই কারখানা গড়ে এখানে ছিলেন। আর নিজে হাতেকলমে কাজ করতেন সারা দেহে তেলকালি মেখে। তাই সাধারণ শ্রমিক-কর্মীদের সঙ্গে ছিল তার অবাধ মেলামেশা।

আদিবাসীদের নাচের আসরেও তিনি মাদল বাজাতেন, নাচতেন, সাধারণ কর্মচারীদের বিয়েতেও তিনি পাত পেড়ে পুরি-ছোলার ডাল খেতেন। তাদের সুখ দুঃখে তিনি তাদের পাশে থাকতেন। আনন্দের দিনে হতেন নাচগানের সঙ্গী। যার তার সঙ্গে এই অবাধ মেলামেশা মোটেই মেনে নিতে পারতেন না তার স্ত্রী পামেলা। সে নিজেকে ভাবতো রাজার জাত—ভাবতো এ তাদেরই সাম্রাজ্য। তাই মিঃ ম্যানকে বলতো,

—ওই নোংরা নেটিভদের সঙ্গে নাচতে যাও ড্রিংক্স করো। ওদের বাড়ির ডার্টি পরিবেশে যা তা খেতে যাও। ঘৃণা করে না। মিঃ ম্যান বলেন,

—কী বলছ পামেলা, ওরাও মানুষ। আমার সহকর্মী।

—হোয়াট। পামেলা গর্জে ওঠে—সহকর্মী! ওরা তোমার চাকর। জুতোর টোক্কর দিয়ে ওদের কাম করাবে না হলে ওরা তোমার মাথায় উঠে বসবে। দীজ ভিলেনস—

মিঃ ম্যান বলেন,

—ওরা মোটেই ভিলেন নয়। ওরা গুডম্যান, ভেরি কো-অপারেটিভ ওবিডিয়েন্ট।

—দে আর নাথিং বাট সারভেন্ট। পামেলা বলে ওঠে,

—আমি চাই না তুমি ওদের সঙ্গে মেশো। ক্লাবে আসবে রোজ সন্ধ্যায় বিলিয়ার্ড খেলবে।

মিঃ ম্যান হাসে মাত্র। ইংরেজদের এই প্রভুত্বের প্রতাপটাকে মিঃ ম্যান দেখেছে এখানের কোলমাইনস ক্লাবে। সেখানে নেটিভদের প্রবেশ নিষেধ। সে এটাকে মেনে নিতে পারেনি। সে শ্রমিকদের সঙ্গে মেশে, তাদের মাইনে ছাড়াও লাভের কিছু অংশ দেয়। তাই শ্রমিকরাও মনপ্রাণ দিয়ে কাজ করে নিপুণ ভাবে।

পামেলা বহুবার মিঃ ম্যানকে বলেও শোধরাতে পারেনি। মিঃ ম্যান অন্য ধাতের মানুষ—তার নিজের চেষ্টাতেই সে এতবড় কারখানা গড়েছে। তাই তার ব্যক্তিত্বকে পামেলাও অস্বীকার করতে পারে না। পামেলা সঙ্গ পাবার জন্যই গাড়ি নিয়ে হীরাপুরে সাহেবদের ক্লাবে আসে। আর ইংরেজরাও তাকে নিজেদের জাত ভেবেই সহজে মেশে। হীরাপুরের বড় সাহেবও বিশেষ খাতির করে তাকে। পামেলা তাদের বাংলোতে যায়। ঝাঁকের কই ঝাঁকে মিশে যায়।

মিঃ ম্যানের ঘর করে অবশ্য পামেলা। তবু ওই ইংরেজদের সঙ্গে মেলামেশাটাও

পামেলার মনে মিঃ ম্যান সম্বন্ধে একটা বিরক্তিই আনে। পামেলার মনের এই অতৃপ্তিই আর বিপত্তিই দুজনের মধ্যে নীরব একটা প্রাচীর গড়ে তোলে।

মিঃ ম্যান অবশ্য এ নিয়ে মোটেই ভাবিত নন। তিনি কারখানা প্রোডাকশন—তার মালের আরও উন্নতির কথাই ভাবেন। তাই নিয়েই ব্যস্ত। তার এই নিরলস সাধনা কিন্তু ব্যর্থ হয়নি—ইংরেজ তাকে টেক্কা দেবার জন্য ওই কারখানা করল পাশেই মালও তৈরি করেছে তারা। কিন্তু সেই মালের গুণগত মান তেমন উন্নত ধরনের হয়নি। ফলে বাজার পাচ্ছে না—সর্বত্রই করেছে মিঃ ম্যান সাহেবের মাল। আর লোকসানের অংক বাড়ে ব্রিটিশ সরকারের। আহত বিট্রিশ সিংহ এবার গজরায়, কিন্তু করার কিছু নেই তাদের।

এমনি দিনে হঠাৎ মিঃ ম্যানকে জব্দ করার একটা পথ পেয়ে গেল ইংরেজ বণিকরা, ইংরেজ সরকার ইংরেজ বণিকদেরই প্রতিনিধি। তাদের স্বার্থই সরকার আগে দেখবে তাই সরকার এবার তাদের বণিকদের প্রতিযোগী ওই জার্মান মিঃ ম্যানকে জালে জড়ানোর কাজটা শুরু করে দিল।

—জেঠুমণি! নিতাইবাবু এবার সীমার ডাকে চাইলেন, এতক্ষণ তিনি অতীতের ইতিহাসেই ডুবেছিলেন। সীমার ডাকে এবার হুঁশ হয়। তিনি শুধোন,

—কিছু বলবি মা!

সীমা বলে,

—কত বেলা হয়েছে জানো? ইতিহাস নিয়েই থাকবে?

এবার খেয়াল হয় নিতাইবাবুর।

—তাইতো। আসরটা বেশ জমেছিল রে। বিজনকে বলছিলাম এই কারখানার সেই ম্যান সাহেবের কথা। বিজনও বলে,

—সত্য দারুণ এক ইতিহাস। উপন্যাসের চেয়ে ঘটনাবহুল তথ্যবহুল—নিতাইবাবু বলেন,

—ট্রুথ ইজ স্ট্রেনজার দ্যান ফিকশন্, উপন্যাস তো জীবনকে নিয়েই বিজন। জীবন সত্য বৈচিত্র্যময়। আজ তো তোমার ছুটি।

বিজন বলে,

—হ্যাঁ। কেন?

নিতাইবাবু বলেন,

—আজ দুপুরে এখানেই খেয়ে নাও। বিকালে বাকি ইতিহাস বলব। তুমি এ নিয়ে ভাবো, কিছু পড়াশোনা করো।

বইপত্তর আমি দেব। তারপর দ্যাখ এই কাহিনি যদি লিখতে পারো।

বিজনও ভাবছে সেই ম্যান সাহেবের কথা অতীত দিনের কথা।

সীমা বলে,

—ঠিক আছে আসুন।

বিজনই বলে,

—আবার ওঁকে কষ্ট দেবেন? আমি বরং মেসেই যাই। খেয়ে দেয়ে বিকালে আসব।

নিতাইবাবু বলেন,

—তাল জানো? গানের তাল।

বিজন মাথা নাড়ে—হ্যাঁ।

নিতাইবাবু বলে,

—একবার তাল কেটে গেলে গান যতই ভালো গাও আর জমে না। তেমনি কাহিনির তাল কাটলে সেই কাহিনিতে তার গুরুত্ব হারায় হে। এ নিয়ে সিরিয়াসলি ভাবতে হবে। তাই থেকেই যাও। আমি বারবার চেষ্টা করেও লিখতে পারিনি। তোমার লেখার হাত আছে, যা সীমা খাবার ব্যবস্থা করগে মা।

আগেকার আমলের বাড়ি। বাড়ির ভিতরও বিশাল আলনা। ওদিকে একটা বড় ইঁদারা। পাথর কয়লার স্তর কেটে বহু নীচে থেকে জল তোলা হয় কপিকলের সাহায্য। বিশাল বারান্দায় খেতে বসেছে ওরা দুজনে ঠিক কার্পেটের আসন পেতে বড় কাঁসার থালায় সুগন্ধি চালের ভাত তাতে বাড়ির গরুর দুধের তৈরি ঘি-ভাজা-তরকারি-মাছ-চাটনি শেষপাতে বাড়ির তৈরি দই। মেসের রান্নার তুলনায় এই রান্না যে অমৃত।

সীমাই আর একজন কাজের মেয়েকে নিয়ে ওদের খাবার দিচ্ছে। নিতাইবাবু বলেন,

—খাও হে! বিজন, সীমামা মাছ দে বিজনকে, খাও হে পুকুরের মাছ। এ বাজারের বরফের মাছ নয়, পুকুরের টাটকা মাছ।

বিজন বলে,

—আর দেবেন না।

নিতাইবাবু বলেন,

—সীমাকে আবার আপনি আজ্ঞে করছ যে। অবশ্য তুমি কম খেলে সীমা কিন্তু ভীষণ রাগ করবে। বুঝলে বিজন! আজ তোমাকে পেয়েছি অন্যদিনে সীমা আমাকেই খাওয়াতে চায়। আজ তুমিই আমাকে উদ্ধার করো।

সীমা সলজ্জ ভাবে বলে,

—মিথ্যা কথা বলবে না জেঠুমণি!

বিজন আজ নতুন পরিবেশে এসেই খুশি হয়।

দুপুরের ক্লান্ত রোদ্দুর পাহাড় প্রান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। ওদিকে পাহাড়বনে নেমেছে নিস্তব্ধতা। ওদিকে বনের মধ্যে থেকে কয়েকটা ট্রাককে বের হতে দেখল বিজন। ওদিকে কেউ বিশেষ যায় না। বিশাল স্ল্যাগের পাহাড়গুলো গিয়ে ওই বনপাহাড়ে মিশেছে। দীর্ঘ আশি নব্বই বছর ধরে এই কারখানা চালু হয়েছে। সেই সময় ম্যান সাহেব তার বাতিল স্ল্যাগগুলোকে পাহাড়ের ওদিকেই রেললাইন করে কেবল লাইনে বড় বড় টবে বসিয়ে ওখানে ফেলে আসতেন। সেই আমল থেকেই ওই অঞ্চলে এখন কয়েক দশকের বাতিল স্ল্যাগের পাহাড় গড়ে উঠেছে।

ওদিকে গজিয়েছে ঘনবন পাহাড় আর এই স্ল্যাগের পাহাড়। প্রায়ই এক হয়ে

বনের গভীরে ডুবে রয়েছে। ওখানে সাপ বুনোশুয়োর ও হায়নার রাজত্ব। মানুষজন ওদিকে যায় না। ওদিক থেকে কয়েকটা ট্রাক একনজর দেখা দিয়ে আবার বনের গভীরে ঢুকে গেল।

নিতাইবাবুর কথায় বিজনের খেয়াল হয়। সে আবার সেই অতীতের গভীরে হারিয়ে যায়। ভেসে ওঠে সেই প্রথম মহাযুদ্ধের কথা। জার্মান তখন ব্রিটিশের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করেছে। ইউরোপে শুরু হয়েছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। ইউরোপের বাতাসে বারুদের গন্ধে ভারী হয়ে উঠেছে। সেথায় সব আলোর নিভে গিয়ে নেমেছে সর্বনাশের অন্ধকার।

এবার ইংরেজরা সেই সুযোগটাই নেয়। মিঃ ম্যান একজন জার্মান। যুদ্ধের সময় ইংরেজ সরকার এবার চাপ দিয়ে মিঃ ম্যানকে 'প্রিজনার অব ওয়ার'— অর্থাৎ যুদ্ধবন্দী হিসাবে বন্দী করে নিয়ে গিয়ে জেলেই পুরে দিল। পামেলা ব্রিটিশ নাগরিক। তাই তাকে বন্দী করা হল না। আইনত পামেলাই হল ওই শিয়ালডাঙা কারখানার মালিক।

পামেলা তখন ওই হরিপুর কারখানার কোনো এক পদস্থ ইংরেজ কর্মচারীর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। কারখানার অবস্থাও সঙ্গীন। মিঃ ম্যান জেলে।

বন্দীমুক্তির সম্ভাবনাও নেই। কারণ যুদ্ধ তখন ছড়িয়ে পড়েছে সারা ইউরোপে। ব্রিটিশও জড়িয়ে পড়েছে যুদ্ধে।

ফলে শিয়ালডাঙার কারখানাতেও শুরু হল নানা সমস্যা। কাঁচামাল-এর জোগান নেই। ব্রিটিশের হাতে কয়লা। তারাও যোগান বন্ধ করেছে। ফলে কারখানা বন্ধের মুখে। সাজানো শহরে নামে আতঙ্ক—হতাশার ছায়া।

পামেলাকে বিয়ে করেছে সেই ইংরেজ অফিসার। আর ইংরেজ কোম্পানিই এবার পামেলার কাছ থেকে নামমাত্র মূল্যে শিয়ালডাঙার কারখানা কিনে নিল। তারা জানতো ওই কারখানাতে প্রোডাকশন চালু করলে সবরকম মাল, সবরকম কাস্টিং মোল্ডিং তারা করতে পারবে। সেই সব কারিগর এখানে আছে। আর ভারতের দুটো লোহা কারখানার মালিক হবে তারাই। এখানে তারাই লোহার ব্যবসা করবে বিনা প্রতিযোগিতায়।

তখনও টাটা কোম্পানি তাদের কারখানা তৈরি করে উঠতে পারেনি। ইংরেজরা এই কারখানার দখল নিয়ে এখানে প্রোডাকশন শুরু করে দিল। অবশ্য কারখানা বিক্রি করার পর সেই ইংরেজ অফিসার পামেলাকে নিয়ে ইংল্যান্ডে চলে গেল এদেশ ছেড়ে। অনেকেই বলেন ওই বণিকরাই তাদের এদেশ থেকে সরিয়ে দিয়েছিল যাতে মিঃ ম্যান ফিরে এসে কোনোরকম গোলমাল না করতে পারে।

দুটো লোহা কারখানাই এসে গেছে ইংরেজদের হাতে। বেশ কয়েক বছর কেটে গেছে। যুদ্ধের পর শান্তি নামে। ইউরোপেও শান্তি ফিরে আসে। যুদ্ধ থেমে যায়। তার কিছুদিন পর মিঃ ম্যান ছাড়া পান। ছ'বছর এই জেলজীবন তাকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। তাকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে ভারতের অন্য প্রান্তের কোনো জেলে রাখা হয়েছিল। এখানের কোনো খবরই তার কাছে পৌঁছায়নি। মিঃ ম্যানও পামেলার সঙ্গে কোনোরকম যোগাযোগও করতে পারেনি। কারখানার কোনো খবরই

পাননি। দীর্ঘ দু'বছর জেলবাসের পর মুক্তি পেয়ে বিধ্বস্ত মিঃ ম্যান এসে হাজির হন শিয়ালডাঙার স্টেশনে। আজ এখানের নতুন কর্মচারীরাও তাকে চেনে না। অনেক বিদেশিই এখন এখানে যাতায়াত করে। এরা ম্যানকেও ভেবেছিল তাদেরই একজন। মিঃ ম্যান যে এই শিয়ালডাঙার প্রতিষ্ঠাতা এরা তা জানে না।

মিঃ ম্যান প্রথমে দেখে খুশিই হন। তার কারখানা তাহলে বন্ধ হয়নি। বেশ তোড়জোড় করেই চলছে। পামেলা নিজেই ভার নিয়ে কারখানার উন্নতিই করেছে। মনে হয় নতুন সেকশন খুলেছে। চিমনিও বেড়েছে দুটো। নীল আকাশে তার থেকে কালো ধূসর ধোঁয়ার কুণ্ডলী বের হচ্ছে। ব্লাস্ট ফার্নেসও চলছে। মিঃ ম্যান ফিরেছেন তার নিজের রাজ্যে ছ'বছর পরে। তবুও খুশিই হন।

শহরটাও ঝকঝকে রয়েছে। বাংলোতেও লোকজন রয়েছে পথঘাট সাফসুতরো গাছগাছালির সংখ্যা বেড়েছে। তার আমলে লাগানো গাছগুলো এখন বড় হয়ে পথগুলোকে ছায়াশীতল করে তুলেছে।

তার বাংলোতে বাগানে ফুটেছে অনেক ফুল—ক'বছরেই পথের ধারে বটল পাম গাছগুলো বেড়ে উঠেছে। গেটে ঢুকতে যাবে মিঃ ম্যান। নতুন দারোয়ান বাধা দেয়।

—অন্দর মৎ যাইয়ে সাব।

মিঃ ম্যান চটে উঠতে গিয়েও পারে না। নতুন লোক, তার পক্ষে মিঃ ম্যানকে চেনা সম্ভব নয়। মিঃ ম্যান বলেন,

—মেমসাবকো সেলাম দিও। বলো, মিঃ ম্যান ওয়াটস্ আয়া। অন্য কেউ হলে দারোয়ান তাকে গেট থেকেই বিদায় দিত। কিন্তু হাজার হোক লালমুখ। কে জানে মেমসাহেবের কেউ হলে হবে। তাই তার সঙ্গীকে গেটে রেখে সে জেনারেল ম্যানেজারের মেমসাহেবকে খবর দিতে যায়।

এখানে এখন ব্রিটিশদের রাজত্ব। জেনারেল ম্যানেজার তখন কারখানা থেকে ফিরে চা খাচ্ছেন। দারোয়ানের মুখে মিঃ ম্যান-এর নাম শুনে চমকে ওঠেন।

সেই লোকটা যে মুক্তি পেয়ে এখানেই ফিরে আসবে তা এরা ভাবেনি। এবার জেনারেল ম্যানেজার নিজেই থানাতে ফোন করেন। এখানের দারোগাও তাদেরই হাতের লোক। কারখানা থেকে তাকেই মাসে মাসে মোট টাকার জলপানি দেওয়া হয়।

দারোগাও এবার খোদ জেনারেল ম্যানেজারের মুখে সমস্ত কথা শুনে বলে,

—ওতো এখন এখানের কেউ নয় স্যার। ট্রেসপাসার—আইন তাই বলে।

জেনারেল ম্যানেজার বলেন,

—ওই লোকটা কোনো গোলমাল করতে পারে, সুতরাং তুমি আইনমতো ওর ব্যবস্থা করো।

দারোগা জানে কোন দেবতাকে খুশি রাখতে হবে। তাই বলে সে—আমি এক্ষুনি পুলিস নিয়ে আসছি স্যার। আপনি ভাববেন না। যা করার আমিই করব।

মিঃ ম্যান গেটের ধারে অপেক্ষা করছেন। পামেলার দেখা নেই। মনে মনে রাগ

ও অভিমান হয়। এতদিন পরে তিনি ফিরলেন আর সে খবর পেয়েও পামেলা কেন আসছে না। তবে কি সে কারখানাতে গেছে। অপেক্ষা করছেন তিনি। পুলিশ এসে পড়ে, নতুন দারোগা—সঙ্গে পুলিশ। আর জেনারেল ম্যানেজার সাহেবও পুলিশ দেখে এবার বের হয়ে আসেন বাংলো থেকে। ম্যানসাহেব অবাক হয়ে দেখছেন।

মিঃ ম্যান এই কবছরে ইংরেজ জাত আর তাদের পুলিশ সম্বন্ধে অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতাই অর্জন করেছেন। আজ আবার তাদের দেখে শুধোন,

—কী ব্যাপার অফিসার আমাকে চেনেন না। আমি মিঃ ম্যান। এই শিয়ালডাঙা কারখানার ফাউন্ডার ম্যানেজিং ডিরেক্টর। এবার জেনারেল ম্যানেজার বলেন,

—মিঃ ম্যান, ভেরি সরি। তুমি আর এখানের কেউ নও।

—হোয়াট! মিঃ ম্যান চমকে উঠে।

ব্রিটিশ জেনারেল ম্যানেজার বলেন,

—তুমি যখন জেলে ছিলে তখন তোমার স্ত্রী পামেলা এসব কারখানার জায়গা-জমি আমাদের কোম্পানিকে বিক্রি করে দিয়ে দেশে চলে গেছে।

—নো! এসব মিথ্যা, কোথায় পামেলা?

মিঃ ম্যানের কথায় দারোগা জবাব দেয়।

—শুনলেন তো তিনি ইন্ডিয়া ছেড়ে চলে গেছেন। এসব এই কোম্পানিকে বিক্রি করে, আপনার কোনো দাবিই আর এখানে নেই।

মিঃ ম্যান বলেন,

—আমি এসব জানি না। অল ফলস্—ইউ গ্রিডি ব্রিটিশ কোলাজ দারোগাই বলে,

—যা বলার বলেছি স্যার। আপনি আদালতে যেতে পারেন। সেখানেই যা সত্য জানতে পারবেন। এখন আপনি এখানে ট্রাসপাসার। এখানে প্রবেশের কোনো অধিকার আপনার নেই। মিঃ ম্যানের পায়ে নীচ থেকে যেন মাটি সরে যায়। তার জীবনভর পরিশ্রমের ফসল তার সর্বস্ব এমনি করে ব্যর্থ করে দিয়ে তাকে নিঃস্ব পথের ভিখারি করে চলে যাবে পামেলা তা ভাবতেও পারেনি মিঃ ম্যান।

তিনি তবু বলেন,

—নো। নেভার, ইট ইজ মাই ফ্যাক্টরি—মাই ওন।

দারোগা বলে,

—পাগলামি করবেন না স্যার। কোনো রকম গোলমাল অশান্তি না করে সোজা আদালতে যান। সত্য-মিথ্যা সেখানে জানতে পারবেন। এখানে কোনো গোলমাল করলে অ্যারেস্ট করতে বাধ্য হবে। প্লিজ নাউ গো—

ওই পুলিশদেরও চেনেন মিঃ ম্যান—চেনেন ওই লোভী ধূর্ত ব্রিটিশদের। ওদের অসাধ্য কোনো কাজই নেই।

মিঃ ম্যান-এর চলার শক্তিটুকু যেন হারিয়ে গেছে। রোদের তাপও এখানে প্রচণ্ড। মিঃ ম্যানের আজ সব হারিয়ে গেছে। কারখানা, স্ত্রী, আশ্রয় সবকিছুই। উদ্‌ভ্রান্তের মতো চলেছেন তিনি—কোথায় যাবেন জানেন না। অনেক আশা নিয়ে ফিরেছিলেন

শিয়ালডাঙায়। তার স্ত্রী-ঘর-কারখানায়।

কিন্তু ওই ইংরেজরা আজ তার সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে পথেই ঠেলে দিয়েছে।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামছে বনপাহাড়ে। এদিকে ওই কারখানার কোনো ব্যস্ততা চোখে পড়ে না। এই বাড়ির পরই মাঠ। কিছু শাল মহুয়ার চিহ্ন এখানে অতীতের অরণ্যের স্বপ্ন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওদিকে পাহাড় বন দু চারটে আদিবাসীদের ঘর দেখা যায়।

সব জুড়ে কেমন আগমনী বিষণ্ণতার চিহ্ন, সন্ধ্যার ছায়া।

সীমাও বসেছিল ওদিকে। চা দিতে এসে সেও ওই ইতিহাসের করুণ কাহিনীতে আকৃষ্ট হয়ে বসে পড়েছে। বিজন বলে,

—তারপর!

নিতাইবাবু চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে শুরু করেন কাহিনির শেষ অধ্যায়।

নিতাইবাবুর বাবা ছিলেন ইংরেজ বিদ্বেষী, তাদের এই অপকীর্তির সব ইতিহাসই তিনি জানতেন। নিঃসঙ্গ মিঃ ম্যানকে তিনিই বাড়িতে আনেন।

মিঃ ম্যান বলেন,

—তুমি আমাকে আশ্রয় দিচ্ছ, জানো, এখানের ইংরেজরা তোমাকে বিপদে ফেলতে পারে। আমার জন্য নিজেকে বিপদে ফেলবে?

কিন্তু নিতাইবাবুর বাবা বলেন,

—ইংরেজদের আমি ভয় করি না মিঃ ম্যান। ওদের আজ না হোক কাল এদেশ থেকে তাড়াবই।

—আর অতিথিকে আশ্রয় দেওয়া আমাদের কর্তব্য—এটুকু করতে দাও।

মিঃ ম্যান এখানেই থাকেন কিছুদিন। তবু তার মন পড়েছিল ওই কারখানা—নিজের হাতে গড়া ওই শহরে। দিনের বেলাতেও বের হতেন না। রাতের নির্জন অন্ধকারে মিঃ ম্যান বের হতেন, কারখানার ওদিকে দাঁড়িয়ে দেখতেন কারখানাটাকে।

আজ তাঁর ওখানে ঢোকার অনুমতি নেই, আজ সে নিজের গড়া শহরেই অবাঞ্ছিত। কারখানার সামনে ওই পরিত্যক্ত কোলিয়ারীর অতল গহ্বরের দিকে চেয়ে থাকেন, তার জীবনেও নেমেছে অমনি অতল অন্ধকার। রাত-নির্জন শহরের পথে পথে ঘুরতেন, চোরের মতো—যে শহর তিনি একদিন গড়েছিলেন। নিতাইবাবুর বাবা জানতেন বুঝতেন সাহেবের এই মর্মবেদনা। তাই তিনি তাকে রাতে বের হতে বাধা দিতেন না। ওই করেই যদি সর্বহারা মানুষটা শান্তি পায় পাক।

নতুন আমলের কর্মীদের অনেকেই তাকে চিনতেন না। তারা দেখতো রাতের অন্ধকারে কোনো সাহেব পথ দিয়ে ক্লান্ত পদক্ষেপে চলেছে। মিঃ ম্যান একদিন রাতে বের হয়ে আর ফেরেননি। নিতাইবাবুর বাবা খোঁজ খবর নিতে নিতে কারখানার ওদিকে পরিত্যক্ত কোলিয়ারির ওই অতল প্রবেশ পথের কাছে এসে দেখে ম্যান সাহেবের কোটটা পড়ে আছে। সাহেব ব্যর্থ জীবনের যন্ত্রণা শেষ করেছেন ওই কোলিয়ারির অতল কূপে ঝাঁপ দিয়ে—সেখানে কোনো মানুষ কোনোদিন পৌঁছতে পারবে না।

এই ভাবেই মিঃ ম্যান নিজেকে শেষ করেন আর তার সঙ্গে শেষ হয়ে যায়

ইতিহাসের একটি অধ্যায়।

নিতাইবাবু বলেন,

—বাবা বলতেন, তিনি অভিশাপ দিয়ে গেছলেন এই কারখানাকে। ভয় হয় তার অভিশাপ কোনদিন সত্য না হয়ে ওঠে এই শিয়ালডাঙার বুকে। এখনও নাকি অনেকে দেখেছে রাতের অন্ধকারে নির্জন পথ দিয়ে ক্লান্ত পদক্ষেপে হেঁটে চলেছে এক বিদেশি, কোথা থেকে সে আসে কোথায় যায় তা কেউ জানে না।

বিজন বলে,—আমি অবশ্য তেমন কাউকে দেখিনি তবে দুচারজনকে বলতে শুনেছি তারা নাকি দেখেছে অন্ধকার ছায়ামূর্তিটা আবার কোথায় হারিয়ে যায়।

.

সন্ধ্যা নামছে। এদিকে কারখানা শহরে আলোর সারি জ্বলে উঠেছে। লাইন দিয়ে একটা এক্সপ্রেস ট্রেন ঝড় তুলে তীব্র গতিতে ছুটে গেল। বিজন ফিরছে মেসের দিকে। তার মনে পড়ে তখনও সেই হতভাগ্য এক বিদেশীর কথা। যাকে আজকের এই শিয়ালডাঙার অনেকেই চেনে না। নামও শোনেনি। বর্তমান বড় স্বার্থপর সে অতীতের সবকিছুকে নিজের বৈভব দিয়ে মাটির অতলেই চেপে রাখতে চায়। যাতে নিজের প্রতিষ্ঠা ক্ষুণ্ণ না হয়।

ভবেশ, রাজা, মহীনের দল তখন মেসে জোর তাসের আসর বসিয়েছে। ছুটির দিন তাদের আসর বসে সকাল থেকেই। দুপুরে খাবার জন্য কিছু সময় বন্ধ থাকে। তারপর আবার শুরু হয়, চলে রাত নটা অবধি। সঙ্গে চা আর সিগারেট, আবার মুড়ি চপও চলে। তাসের জয়-পরাজয় নিয়ে চলে নানা তর্জন-গর্জন।

ওরা বিজনকে দেখে বলে,

—কিরে দিনভর কোথায় ছিলি? দুপুরেও খেতে এলি না।

মানিক বলে,

—কাকার ওখানেও যাসনি। তবে—

বিজন বলে,

—নিতাইবাবুর ওখানে গেছলাম।

অবাক হয় ভবেশ,

—ওই বুড়ো মাস্টারের ওখানে, অ্যাঁ ওর দাড়ি ধরে ঝুলছিলি নাকি রে!

মহীন এলাকার অনেক খবর জানে। ওর বাবা এখানের পুরোনো কর্মী, মহীন বলে,

—ধ্যাৎ নিতাইবাবুর একখান ভাইঝি যা আছে না—দারুণ।

এবার বন্ধুরা যেন তাদের কথার উত্তর খুঁজে পায়। মানিক বলে,

—শালা ওখানে চার ফেলেছিস বুঝি। অ্যাঁ! ডুবে ডুবে জল খাওয়ার প্ল্যান।

মহীন বলে,

—লাভ হবে না—সীমার যা ডাঁট। ঝাপটা খেয়ে ফিরে আসবি রে। ওখানে ট্রাই না নিয়ে বরং বাবুপাড়ায় মদনবাবুর বাড়িতেই টিউশনি নে। তিনখানা মেয়ে ওর।

বিজনের এসব আলোচনা ভালো লাগে না।

সে বলে—ছাড়তো এসব কথা। দিনভর ওই আসমানে ক্রেনে ঝুলে থাকার পর আর প্রেম করার মতো অবস্থা থাকে না রে। করতে হয় তোরা কর। তোরা তো অফিসের স্টাফ-বাবুর দল।

চলে যায় বিজন ওর নিজের ঘরে। নিতাইবাবুর দেওয়া বইখানা পড়তে হবে। আর, কেন জানে না ম্যানসাহেবের কথাই মনে পড়ে বার বার। সেও চেষ্টা করবে রাতের অন্ধকারে যদি তাকে কোনোদিন দেখতে পায়।

মিঃ উইলসনের ছেলেবেলা কেটেছিল নানা দুঃখ-কষ্টের মধ্যে দিয়েই। অবশ্য তার ওভাবে থাকার কথা নয়। বাবা ছিলেন ইস্টবেঙ্গল রেলওয়ের পদস্থ কর্মচারী। ছেলেবেলাটা কেটেছিল রিপন স্ট্রিটের একটা ভাড়া বাড়িতে, ওখানে অ্যাংলো সমাজের প্রাধান্য। পরে ওর বাবা প্রমোশন পেতে শিয়ালদহের রেল কলোনিতে কোয়ার্টার পায়।

ক্রমশ জানতে পারে উইলসন তার বাবা মদের নেশায় অনেক টাকা উড়িয়ে দেন। এছাড়া তার মেয়েছেলের দোষও আছে। তাদের সমাজে অবাধ মেলামেশার সুযোগ ছিল তাই মিঃ উইলসন-এর বাবা অনেকের সাথেই মিশতেন। এই নিয়ে মায়ের সাথে অশান্তির সূত্রপাত। ঝগড়া মারপিটও হতো।

উইলসন তখন কলেজে পড়ে। সে বাবার এই বদঅভ্যাসগুলোকে সহ্য করতে পারত না। ফলে বাবার সঙ্গেও তার অশান্তি শুরু হয়। তাদের সমাজের মানুষগুলো ছিল যেন এক অন্য শ্রেণীর মানুষ, তারাও যেন রাজার জাত। তরুণ উইলসন মিশেছে এদেশের ছেলেদের সঙ্গে—ওর বন্ধুত্ব তার সমাজের ছেলেদের সঙ্গে নয়—এদেশের ছেলেদের সঙ্গে।

এমনি দিনে তার মা মারা গেল। উইলসনও জানে তার মায়ের মৃত্যুর জন্য দায়ী তার বাবাই-এর কিছুদিন পর তাদের ঘরে এল মিস ডমোথি। উইলসনকে এর পরই বাড়ি ছাড়তে হয়। টেকনিক্যাল স্কুল থেকে পাস করে সে রেলেই চাকরি পেয়ে আসানসোলে রেলকলোনিতে আসে। কিন্তু এখানেও তাদের সমাজের প্রাধান্য। তবু কোনোমতে টিকে থাকার চেষ্টা করে উইলসন, এখানেই দেখা হয় নোরার সঙ্গে। ওর বাবা ছিল তার ডেপুটি ম্যানেজার। নোরা তখন সুন্দরী যুবতী। উইলসন-এর নিঃসঙ্গ জীবনে ওই মেয়েটিই সেদিন আনে একটু রঙিন স্বপ্নের আভাস। নোরাকেই বিয়ে করে সে।

পরে বুঝতে পারেন—নোরার বাবা চান উইলসনকে তার হাতে রাখতে। তার রোজকার সব দিতে হবে তাকে। তারও ছিল নিদারুণ মদের নেশা। আর টাকা না পেলেই শুরু হত বাবার মেয়ের উপর অত্যাচার।

ওদের হাত থেকে বাঁচার জন্যই উইলসন শিয়ালডাঙা কারখানায় চাকরির চেষ্টা করে। তখন সাহেবদের আমল তাই চাকরি পেতে অসুবিধা হয়নি উইলসনের। উইলসন নোরাকে নিয়ে চলে আসে এখানের বাংলোতে। আশ্রয় নেয় ঘর বাঁধে উইলসন। ছেলেবেলা থেকেই তার জীবনে শান্তির আশ্বাস নেই। সে যেন তাদের সমাজজীবনে মানিয়ে নিতে পারেনি তাই এত সমস্যা। আর এখানে এসেও সেই

সমস্যাগুলো প্রকটই হয়ে ওঠে। মিঃ সলিল মিত্র কলকাতার বনেদি বাড়ির ছেলে। তার পূর্বপুরুষ হেস্টিংস-এর আমল থেকেই সাহেবদের সঙ্গে মেলামেশা করে।

বাড়িতে দোল দুর্গোৎসবের সময় বাইজি নাচের আসরে সাহেবদের নিমন্ত্রণ করে আনেন। মদের ফোয়ারা চলে। বাগানবাড়িও রয়েছে—ওই কর্তাদের বিশেষভাবে মনোরঞ্জন করা হয় সেখানে। আর এই পথেই মিত্র সাহেবের পূর্বপুরুষ কোম্পানিকে নানা মাল তিনচারগুণ দামে সরবরাহ করে তাদের অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেন। জমিদারি কেনা হয়। সাহেব ভজনা করেই এসেছে তাদের পূর্বপুরুষরা, বাড়িতে তাই লালমুখোদের জন্য বিশেষ খাতিরই ছিল।

সেই দিন বদলেছে। এখন সাহেবদের জমানা শেষ হবার মুখে। দেশ স্বাধীন হবে, এবার তাই চারিদিকে শুরু হয়েছে বিপ্লব।

কখনও হিংসার পথে আবার কখনও গান্ধীজীর অহিংসার পথে লড়াই চলছে। এমনি এক ক্রান্তিকালেই মিঃ মিত্র ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে শিয়ালডাঙার কারখানায় সেকশন ম্যানেজার হয়ে আসেন।

তার স্ত্রী রীনাও বড়ঘরের মেয়ে। মিঃ মিত্রদের সেই রমরমা আর নেই। বড়লোকি দেখাতে গিয়ে মিত্র পরিবারের জমিদারি লাটে উঠেছে। ব্যবসাপত্রও প্রায় অচল। কলকাতা শহরে কয়েকখানা বাড়িও একটা বাজার রয়েছে। এদিকে শরিক বেড়েছে তাই আয় উপায় কমে গেছে। তবে উত্তর কলকাতায় তাদের বিশাল বাড়ি বেশ কিছু বাগান জমিও রয়েছে। আর রয়েছে নামটা। তবে নামেই তালপুকুর, ঘটিও তাতে ডোবে না।

রীনার বাবা হালফিল ব্যবসা করে বড়লোক হয়েছেন। ওর কনট্রাকটরি ফার্ম এখন ভালোই চলেছে। রীনাকে তিনি ইংলিশ মিডিয়ামে পড়িয়েছেন। রীনা মানুষ হয়েছে প্রাচুর্যের মাঝে। নিজেকে পুরুষের দরবারে তুলে ধরার মানসিকতাও তার রয়েছে, তাই সাজগোজও করে।

এখানে নতুন বাংলোয় এসে রীনা প্রথমে একটু অসুবিধায় পড়ে। বাংলোটা অবশ্য সুন্দরই। বিশাল প্রাচীর ঘেরা বাংলো গেটে সেন্ট্রীও রয়েছে। ভিতরে সুন্দর সাজানো বাগানমালী, বেয়ারাও রয়েছে। গাড়ি ড্রাইভার ওসব কোম্পানির দেওয়া। আশপাশে আরও কয়েকজন দিশি বিদেশি অফিসারের বাংলো। এদিকটা বেশ নির্জন। কলকাতার কোনো কর্মব্যস্ততা এখানে নেই। এখানে সময় চলে কারখানায় ভোঁ-এর সময় মোতাবেক।

সকালে ব্রেকফাস্ট করে আটটার মধ্যে সাহেবরা গাড়ি নিয়ে কারখানায় চলে যান। ফেরেন লাঞ্চের সময়। ঘণ্টা দুয়েক তখন বাংলোয় থেকে আবার বের হতে হয় কারখানায়। ছ'টার ভোঁ বাজে। তখন কর্মী শ্রমিকরা বের হয়। সাহেবরা ফেরেন বাংলোয়।

তারপর কেউ যায় ক্লাবে—হইচই মদ্যপান করে। তাস খেলার নামে জুয়াও চলে। রাতে মাতাল হয়ে বাংলোয় ফিরে কিছু খেয়ে শুয়ে পড়ে। পরদিন আবার সেই একই জীবনযাত্রা।

রীনা এখানে প্রথমে এসে হাঁপিয়ে পড়ে। কলকাতার মতো হইচই নেই। বাংলোর

সাহেব-মেমরা বিনা নোটিশে কেউ কারো বাংলোয় যায় না। রীনা এর মধ্যে নিজেই ড্রাইভ করে ওই কারখানা শহরটাকে দেখে নিয়েছে। বাবুপাড়াতে থাকে মধ্যবিত্তরা, সেখানে বাড়িগুলোও ঘিঞ্জি। তাই তাদের মেয়েদের মধ্যে অবাধ মেলামেশা হইচই চলে। বাংলোর বাসিন্দারা ওদের সঙ্গে প্রকাশ্যে মিশতে পারে না, চায়ও না। কারণ তাতে পদমর্যাদার হানি হবে। তাই ওরা এই মধ্যবিত্ত সমাজের খোলামেলা পরিবেশ থেকে দূরে থেকে নিজেদের বন্দীই করে রাখে।

রীনা ভেবেছিল এখানে তবু ভালো বাজার মার্কেট থাকবে। কিন্তু এখানের বাজারের চেহারাটাই আলাদা। একটা ফাঁকা মাঠে বেশ কিছু লোকজন রকমারি আনাজপত্র নিয়ে বসে, ওদিকে মাছের বাজার। মাছ ধোয়া জল—আঁশ-কাঁটা পটা-ছড়ানো, গন্ধ ছাড়ে। আর দোকান কিছু আছে জায়গাটার চারিপাশে আরও কিছু এলাকা নিয়ে। মুদিখানা স্টেশনারী কাপড়-চোপড়ের দোকান ওষুধের দোকান সবই আছে। তবে তেমন উন্নতমানের দোকান নয়।

ফলে এখানে মার্কেটিং করার প্রশ্নই ওঠে না। অবশ্য এর মধ্যে রীনা এখান থেকে বেশ কিছু দূরে আসানসোল শহরে যায় মার্কেটিং করতে। ওখানে তবু কিছুক্ষণ ঘোরা যায়।

শিয়ালডাঙা এসে রীনা বোর হয়ে যায়। বলে, মিঃ মিত্রকে।

—এখানে থাকা যায় না। একেবারে পাণ্ডববর্জিত দেশ অসভ্য মানুষের ভিড়। নো সোসাইটি—

মিঃ মিত্রও এখানে কাজে যোগ দিয়ে দেখেছে এখানে এখনও লালমুখো কিছু রয়েছে। দেশের সর্বত্র এখন সাড়া উঠেছে ইংরেজকে বিদেয় নিতে হবে।

কিন্তু যাই যাই করে এখনও এখানে তারা স্ব-মহিমায় রয়ে গেছে। অবশ্য তারাও বুঝেছে যে এরপর আর থাকা যাবে না। তাই এবার বড় সাহেব মেজসাহেবরাও চায় কিছু দমকা বেশি রোজগার করে এখান থেকে বিদায় নিতে। মিঃ মিত্রও চতুর সাবধানী লোক। তাদের রক্তে রয়েছে সাহেব ভজনার অভ্যাস। তাই মিঃ মিত্রও বুঝেছে এই মওকায় সাহেবদের খুশি করে নিজের প্রমোশনটা বাগিয়ে নিতে।

রীনার কথায় মিঃ মিত্র বলে,

—বাংলোতে থেকে থেকে বোর হয়ে গেছ। ক্লাবে চলো সেখানে সোসাইটির অনেকে আসে। সন্ধ্যাটা কোনদিকে কেটে যাবে জানতেও পারবে না।

রীনা অবশ্য প্রথম এসে ক্লাবে দু'একদিন গেছিল। দেখেছিল বেশ কিছু সাহেব বিদেশিনীদের। বেশ কিছু দিশি সাহেব আর তাদের আধুনিক স্ত্রীরাও রয়েছে। তারাও প্রথম পরিচয় তাকে 'হ্যালো' 'হায়' বলেই তাকেও সম্বোধন করে। এদের ক্লাবে সেদিন মিঃ মিত্রকে সকলের ড্রিংক্স-এর খরচাও দিতে হয়। রীনা দেখে মহিলারাও, বিশেষ করে বাঙালির বউরাও দুএকজন বেশ কয়েক পেগ মদ গিলে হইচই করছে।

ওদিকে কয়েকজন মহিলা তাস খেলতে বসেছে। অবশ্য তাস নয়, জুয়াই। ওদিকে সাহেবরা মদ্যপানে ব্যস্ত।

ওর মধ্যে দেখেছিল রীনা তরুণ এক ইংরেজকে। নামটাও মনে আছে। মিঃ জনসন—আরও একজনকে দেখেছিল। মিঃ উইলসন। সেও মদ খায় না। কিছুক্ষণ

পিয়ানোতে সুর তুলে চলেছে আপন মনে। সুরটা শুনে অবাক হয় রীনা। একেবারে খাঁটি রবীন্দ্র সঙ্গীতের সুর। একজন বিদেশিকে ওই সুর বাজাতে দেখে রীনা অবাক হয়, সে নিজে গান জানে। ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ার সাথে সাথে সে রবীন্দ্রসঙ্গীতও শিখেছিল। তাই রীনা ওই মদের আসর ছেড়ে উইলসনের দিকে এগিয়ে যায়।

দেখে, ওই বাজনা মন দিয়ে শুনছেন আরও একজন বিদেশি। সেই তরুণ। দুজনে যেন এখানের গোত্রছাড়া জীব। ওই মদের নেশার দিকে তাদের নজর নেই। তারা সুরের মধ্যে ডুবে গেছে।

রীনা শুধায় ইংরাজিতে—ওই সুর কোথায় শিখলে? উইলসন আপন মনে বাজিয়ে চলেছে।

"খুলিয়া হৃদয় দ্বার খুলিয়ো
ভুলিয়া আপন পর ভুলিয়ো—"

রীনার কথায় চাইল ওর দিকে ওরা দুজন। উইলসন পরিষ্কার বাংলায় বলে—কলকাতায়।

পঙ্কজ মল্লিকের কাছে—

রীনা ওই নাম শুনে অবাক হয়। রবীন্দ্র সঙ্গীতের জগতে একটি সুপরিচিত নাম। বিদেশিদের মুখে ওই নাম শুনে বলে—চেনেন ওকে?

উইলসন বলে—হ্যাঁ, আমি খাঁটি সাহেব নই ম্যাডাম। কলকাতার ভেজাল সাহেব। তবে এই মিঃ জনসন খাস বিলেতের বাসিন্দা। এখানে দলছাড়া মাছের মতো পড়ে আছে। খাবি খাচ্ছে। বাই দি বাই আমাদের পরিচয়টা দেওয়া হয়নি। এখানের ওয়ার্কস্ ম্যানেজার।

রীনা বলে—আমি মিসেস মিত্র। এখানের সেকসন ম্যানেজার মিঃ মিত্রের ওয়াইফ। আমার নাম রীনা।

জনসন দেখছে রীনাকে। বলে সে ভাঙা বাংলায়।

—নমস্কার। খুব আনন্দ হলো হামি।

উইলসন বলে—একটা অনুরোধ করবো ম্যাডাম।

চাইল রীনা—বলুন।

—গানটা আপনি নিশ্চয়ই জানেন। আমি বাজাচ্ছি আপনি গান। দেখি ঠিকমতো বাজাতে পারি কিনা। জনসন ভালো বাংলা বলতে পারে না। তবু বোঝে কিছুটা। সেও বলে,

—প্লিজ ট্রাই ম্যাডাম। ইট উইল বি এ সারপ্রাইজ। রীনা কলকাতায় গাইত এসব গান। এখানে এসে গান ও যেন ভুলে গেছিল এই পরিবেশে। হঠাৎ এমনি জায়গায় তাকে গাইতে অনুরোধ আসায় এবার, রীনা বলে,

—অনেকদিন রেওয়াজ নাই, দেখি গাইতে পারি কিনা। ওই হইচই ওঠা পরিবেশে এবার রীনার গলায় সুর জাগে—"আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে—"

বাইরে তখন শীত শেষে বসন্তের আগমনী। ঝরা পাতার পর ডালে ডালে এসেছে ঝলমলে নতুন পাতা। পলাশের বনে রক্তলাল আভা। ক্লাবের মাঠে কয়েকটা মহুয়া গাছে এসেছে ফুলের মঞ্জরী। রাতের বাতাস ওদের সুবাসে মাতাল।

রীনা গেয়ে চলেছে। বহুদিন পর এই বিজাতীয় পরিবেশে ওই গানের সুর একটা চমক আনে। সাহেবদের বারে হইচই থেমে গেছে। দিশি বিদেশি মেম- সাহেবদের তাসের জুয়া খেলাও থেমে গেছে। অনেকেই উৎকর্ণ হয়ে শুনছে গানটা। দু'একজন উঠে আসে। উইলসন তন্ময় হয়ে বাজাচ্ছে। নোরাও দেখেছে ওই দৃশ্যটা। ওই গানের সুরের জাদু যেন এদের মনের সব উদগ্র কামনাকে শান্ত করে প্রকৃতির রাজ্যে নিয়ে গেছে ক্ষণিকের জন্য.

গানটা থামে। হাততালিতে ভরে ওঠে ক্লাব ঘর। জেনারেল ম্যানেজার মিঃ হাভার্ড এগিয়ে এসে বলে,—মেনি মেনি থ্যাঙ্কস্ ম্যাডাম্। আই থিঙ্ক ইউ আর এ নিউ কামার হিয়ার।

মিত্র ব্যাপারটা দেখে একটু হকচকিয়ে গেছল। এই সাহেব বড় সাহেবদের ভিড়ে মেমসাহেবদের সামনে ওইভাবে বাংলা গান শুরু করবে রীনা, ভাবতেই পারেনি সে। গাইবি তো কোনো ইংরাজী গানই গা তা নয় ও দিশি রবীন্দ্রসঙ্গীত। মিঃ মিত্রও রীনার এই বেয়াদপিতে মনে মনে চটেই উঠেছিল। কিন্তু এবার নিদারুণ সুফলই ফলেছে। মিত্র সাহেবও এবার সুযোগ পেয়ে বড় সাহেব মিঃ হাভার্ডের সামনে এসে নিজের স্বামীত্ব জাহির করে বলে,

—মাই ওয়াইফ রীনা স্যার।

মিঃ হাভার্ড, ডেপুটি ম্যানেজার খুশি হতে ধন্য হয়েছে মিঃ মিত্র। হাভার্ড বলে,

—ভেরি নাইস সং, মিঃ মিটার, ইওর মিসেস ইজ অ্ নাইস সিঙ্গার। গ্ল্যাড টু মিট হার।

ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার মিঃ মরিস বলে,

—ইউ আর এ লাকি ম্যান মিটার। ব্রিং হার টু আওয়ার ক্লাব। সি উইল বি আওয়ার বিলাভড্ গেস্ট ইউ রীনা। মি মরিস ওর হাত বাড়িয়ে দেয় রীনার দিকে। মুখে মদের গন্ধ, হাতটাও লোহার মতো শক্ত। রীনার কেমন যেন বাধো বাধো ঠেকে। তবু ওর সঙ্গে হাত মেলাতে হয়।

রীনার সেই সন্ধ্যার স্মৃতি মনে আছে। ক্লাবের ওই পরিবেশে তার মনে হয় মিঃ জনসন—উইলসনরা কেমন বেমানান।

মিঃ মিত্র এবার যেন একটা পথ পেয়েছে। এগোবার পথ। সেকশন ম্যানেজার থেকে আরও উপরে উঠতে হবে তাকে। ডিভিসন ম্যানেজার হতে পারলে মাইনেও ভালো পাবে অবশ্য সুবিধাও। আরও বড় বাংলো পাবে, আর সে দেখেছে এখন মিঃ মরিসও তার সেকসনে কাজ দেখতে এসে তার চেম্বারে বসে, চা খায়, রীনার খবর নেয়।

মিঃ মিত্রও এখন রীনাকে ক্লাবে নিয়ে যায় সন্ধ্যায়। রীনা দেখেছে এখানে মেশার আর কোনো ঠাঁই নেই এই ক্লাব ছাড়া। এখানে দেখেছে মিসেস রায়, মিসেস প্রধানের বউদের। বয়স হয়ে গেছে, যৌবনও এখন বিগত প্রায়। তবু সেই বিগত প্রায় যৌবনকে আটকে রাখার জন্য নিদারুণ মেক আপ করে মাথায় কৃত্রিম চুলের খোঁপা পরে ক্লাবে এসে মিঃ মরিস-এর পাশে বসে চোখে মুখে সারা দেহে যৌবনের ঢেউ তোলার বৃথা চেষ্টা করে।

মিসেস ঘোষাল ওদের তুলনায় অনেক সহজ সচল। মিঃ ঘোষাল এখানের অ্যাকাউন্টস্ বিভাগের কর্তা। সাহেবদের অনেকের অনেক ভাবেই কোম্পানির টাকা মারার খবর সে জানে। আর সেগুলোকে সামাল দিতে হয় মিঃ ঘোষালকেই। মিঃ ঘোষালকে সাহেবরাও কিছুটা সমীহ করে। তাই মিসেস ঘোষালরাও এখানে স্বমহিমায় বিরাজমান।

মিসেস ঘোষাল বলে,

—বুঝলে রীনা। ওই মিসেস প্রধান-মিসেস্ দত্ত—যূথিকা ওই হতভাগারা এই মরিসটাকে এত তোয়াজ করে কেন জানো? রীনা এসব জানে না। এখানের জীবনেও রাজনীতি আছে। তাই রীনা শুধায়,

—কেন?

মিসেস ঘোষাল বলে—ওর বাংলোতেও যায় ওই মিসেস প্রধান। প্রধানকে ডিভিসনাল ম্যানেজার বানাবার জন্য কোনো কিছু করতেই বাঁধে না ওর। ঢলানির দল, আর ওই মরিস সাহেবও একেবারে নটবর। দু হাতে চুরি করে কোম্পানিকে ফাঁক না করে দেয় পোড়ামুখো।

জনসনকে দেখে রীনা। শান্তশিষ্ট ভদ্রলোক। দেখা হলে দু হাত তুলে নমস্কার করে,

—কেমন আছেন ম্যাডাম?

রীনাও জবাব দেয়—ভালো! আপনি?

—ভালো।

রীনাই শুধায় মিঃ উইলসনকে দেখছি না কদিন।

জনসন বলে—জানবেন ও এখন বিজি।

মিঃ মিত্র ওদিকে মিঃ মরিসকে কি বলতে ব্যস্ত। মিত্রই রীনাকে এদিকে দেখে হাঁক পাড়ে।

—ওখানে কী করছ। এসো এসো, স্যার তোমাকে ডাকছেন। রীনা এগিয়ে যায় মিঃ মরিসের টেবিলের দিকে। তিনি তখন মদ্যপানে ব্যস্ত। ওদিকে বসে আছে মিসেস প্রধান—মিসেস দত্ত, দত্ত সাহেবও। মিঃ মরিস রীনাকে দেখে ওর হাত বাড়িয়ে দেয়।

—কাম অন্ সুইট ডারলিং। তুমি আমাকে ভুলেই গেছ! মিঃ মিটারের কাছে তোমার খোঁজ নিই। সিট ডাউন। হ্যাভ এ স্মল পেগ—

নিজেই একটা গ্লাস মদ ঢেলে বলে,

—অন দি রঅস্ অর সোডা?

মিসেস প্রধান মিসেস দত্ত দেখছে রীনাকে। রীনা বলে,

—ওসব চলে না।

মিঃ মিত্র বলে—আরে সাহেব দিচ্ছেন, না করতে নাই। ঠিক আছে, বেশি জল দিয়েই দিচ্ছি কোন প্রবলেম হবে না।

নিজেই বেশি করে জল দিয়ে গ্লাসটা তুলে দেয় রীনার হাতে।

—আস্তে আস্তে স্প্রিং করো। ভালো লাগবে।

মিঃ মরিসও বলে—টেক ইট মাই ডিয়ার।

রীনাকে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিলতে হয় ওই বিষ। বিশ্রী লাগে। মিঃ মরিস বলে,

—ওসব ঠিক হয়ে যাবে। দ্যাটস্ লাইক এ গুড গার্ল। মিসেস প্রধান মিসেস দত্তের চোখে মুখে কি যেন নীরব হিংসার ছাপই ফুটে উঠে। রীনার রূপ যৌবন আছে। এই শিয়ালডাঙার ক্লাবের সেই মক্ষীরানী না হয়ে ওঠে।

তাই ভাবনাতে পড়েছে তারা।

উইলসন এখন তার দলের নতুন নাটক নিয়ে ব্যস্ত। এবারের নাটক ধরেছে ক্লাব থেকে কেদার রায়। উইলসন করছে কার্ভালো। বিজনকেও অভিনয় করতে হচ্ছে।

উইলসনের বাংলোটা সাহেবপাড়ার মধ্যেই। ওদিকে মিঃ মরিসের বাংলো—এদিকে মিঃ প্রধান ওপাশে আর একজন মাতাল বিদেশি সাহেবের বাংলো। উইলসনের বাংলোর আউট হাউসেই বসে নাটকের মহড়া। অনেকেই আসে। হইচই হয়। এই শান্ত পাড়ার বাসিন্দারা এমনি গোলমালে অভ্যস্ত নয়।

উইলসনের সেদিকে খেয়াল নেই। বেশ জোরে জোরেই রিহার্সেল চলে। মাঝে মাজে ঢোল-তবলা বাজিয়ে গানের রিহার্সেলও চলে।

নোরাও বিরক্ত হয়। বেয়ারাটাও ওখানে ঘন ঘন চা বিস্কুট নিয়ে যায়। আর সেও নাটকের মহড়া দেখতে ওখানেই বসে যায়। তাকে ডেকেও পাওয়া যায় না বাড়ির কাজে। মায় ছেলেমেয়েরাও পাড়া ছেড়ে ওইখানে গিয়ে মজা দেখে। বিশেষ করে তাদের ঢাল তলোয়ার হাতে যুদ্ধ করতে দেখে তারাও হাততালি দেয়। বাড়িতে আসবার সময় ভাইরাও গাছের ডাল নিয়েই নিজেরাই সেই পর্তুগিজ জলদস্যুর ভূমিকায় নেমে পড়ে।

নোরা এসব মোটেই সহ্য করতে পারে না। এ নিয়ে মিসেস দত্তই বলে নোরাকে।

—তোমার কর্তা তো শিং ভেঙে বাছুরের দলে ভিড়েছে। ওই বাজে থার্ডক্লাস লোকদের নিয়ে ওই বাংলোয় হইচই তুলেছে। তুমিও যাত্রায় নেমে পড়ো।

নোরা চুপ করে থাকে।

ওদের রিহার্সালের জন্য এখন এই নির্জন পাড়াতেও যখন-তখন বাইরের লোকজন সাধারণ কর্মচারীও যাতায়াত করে। তাদের লক্ষ্য থাকে আশেপাশের বাংলোর দিকেও।

মিঃ প্রধান নাইট ডিউটি বেশি করে। অবশ্য তাতে মিসেস প্রধানের সুবিধাই হয়। মিঃ প্রধান ইদানীং প্রমোশন পেয়েছে, তাই নাইট ডিউটিই করতে হয়। এদিকে মিসেস প্রধান যায় রাতের অন্ধকারে মিঃ মরিসের বাংলোতে। মিঃ মরিসের জন্যই এই প্রমোশন পেয়েছে। তাই মিসেস প্রধান মিঃ মরিসকে কৃতজ্ঞতা জানাতেই যায়। এতদিন ধরে নিরাপদেই এই কাজটা চলতো। কারণ রাতের বেলায় এদিকে সাধারণ লোকের যাতায়াত ছিল না। তাই এদের অভিসারের খবরটাও গোপনই ছিল।

কিন্তু উইলসনের বাংলোয় রিহার্সাল শুরু হতে এবার মিসেস প্রধানের রাতের

অন্ধকারে মরিস সাহেবের বাংলোয় যাতায়াতের খবরটা ছড়িয়ে পড়ে।

এ নিয়ে ক্লাবেও আলোচনা হয় আর মিঃ প্রধানকেই কে বলে,

—এবার নাইট ডিউটি বন্ধ করো প্রধান, না হলে বিপদ হবে। মিঃ মরিস শেষে তোমাকে দয়ে না মজায়।

প্রধান গর্জে ওঠে,

—এসব মিথ্যা কথা।

—সেন সাহেব বলে—না হে, ওই যে উইলসনের বাংলোতে রিহার্সল দিতে যায়, ওরাই কদিন ধরে ওয়াচ করে এসব দেখেছে।

—হোয়াট, মিঃ প্রধানও চটে ওঠে। তারপরই মিসেস প্রধানকে শাসায়।

—সারা শহরের লোক জেনে গেছে। রোজ রাতে ওখানে যাবে না। নো—

মিসেস প্রধান এবার কথাটা গিয়ে খোদ মিঃ মরিসকেই বলে,

—ওই উইলসনের জন্য আমরাও অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। কোনো প্রাইভেসি থাকবে না বাংলোর? টাউনের ইতর লোকরাও রাত-বিরেতে এখানে ঘুরবে?

মিসেস প্রধান চটেছে তার ব্যক্তিগত কারণে আর উইলসনের স্ত্রী নোরাও উইলসনের এইসব কাজে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। সেও বলে,

—বাংলোতে এসব চলবে না। তুমিও ওদের সঙ্গে যাত্রা করবে না।

উইলসন বলে,

—মদ খেয়ে মাতলামি—অন্যের ঘরের বউ নিয়ে নষ্টামি করা কি—এর থেকে ভালো কাজ নোরা, আমি এদেশের মানুষ, কালচার নিয়েই থাকি।

নোরা গর্জে ওঠে—ড্যাম ইওর কালচার। আই হেট দিস—এখানে ওইসব চিৎকার করো—আশপাশের সবাই কমপ্লেন করছে মিঃ মরিসের কাছে। নিজের সোসাইটিতে মেশো না, এইসব বাজে গোলমালে যাবে—এ আমি বরদাস্ত করি না।

উইলসন ওকে শান্ত করার চেষ্টা করে, কিন্তু নোরা বলে,

—নিজে জাহান্নামে গেছ, তোমার জন্য আমার ছেলেরাও বাঁদর হয়ে উঠেছে। ওরাও নেটিভদের সঙ্গে খেলে—গাছে চড়ে আম পেয়ারা পাড়ে, হরিবল! তুমি সাবধান হও।

উইলসন এসবে কান দেয়নি। ক্লাবে রিহার্সল করা যায়, তবে সেখানে ভিড় বেশি হয়। এখানে সে ভিড় এড়িয়ে রিহার্সল করতে পারে।

কিন্তু সেদিন ক্লাবে মিঃ মরিসই এবার উইলসনকে বলে কথাটা। মিঃ মরিসকে মিসেস প্রধানই সাতখান করে লাগিয়েছে। তবে মিঃ মরিসের বাংলোয় শুধু মিসেস প্রধানই নয় আরও অন্য মেয়েরাও আসে। তার জন্য মরিসের যোগানদার বাহিনীও আছে।

মিঃ মরিস খাস ইংল্যান্ড থেকে এলেও মোটেই কোনো অভিজাত বংশের থেকে আসেনি। ওর বাবা ছিল পেশায় শু মেকার। অর্থাৎ মুচি। ছেলে জুনিয়র মরিস লেখাপড়ায় বেশ ভালো। তাই স্কুল থেকে পাস করে টেকনিক্যাল স্কুলে পড়েছিল, ওখানেই ডিপ্লোমা করে ল্যাঙ্কাশয়ারের একটা কারখানায় কাজ নেয়। মাইনে মোটামুটি, তাতে চলে যায় ওর। বিয়ে থাও করে—তখন থেকেই মরিস মদের

নেশায় ডুবতে থাকে আর মেয়েদের দিকেও তার নজর বাড়তে থাকে। ওর স্ত্রী তবু মরিসকে শোধরাতে চেষ্টা করে কিন্তু কে কার কথা শোনে। ফলে শুরু হয় অশান্তি। মারধরও করে মরিস তার স্ত্রীকে। আকণ্ঠ মদ গিলে বাড়িতেই অন্য মেয়েদের নিয়ে আসে, নোংরামি করে।

অতিষ্ঠ হয়ে ওর স্ত্রী ডিভোর্স নিয়ে চলে যায়। মরিসও এবার মুক্তবিহঙ্গ। এমনি দিনে এই দেশের চাকরির খবর পায়। শিয়ালডাঙা কারখানার চাকরিটা, মরিস বলে—আমি তো ডিপ্লোমাধারী জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার। ওর এক বন্ধু বলে—আরে, রাজার জাত তুমি, তোমার কাজ তো ওখানের নেটিভ ইঞ্জিনিয়ার স্পেশালিস্টরাই করে দেবে। এই বিদ্যে বুদ্ধি নিয়েই তুমি সেখানের বিগ বস্ হবে। টাকা—বাংলো—উপরি—মদ আর নেটিভ মেয়ে যত চাও পাবে। রাজার রাজত্বি করবে সেখানে। লুটেপুটে এদেশে ফিরে বাকি জীবনটা আরামে আয়েসেই থাকবে।

ওর বন্ধু যে মিথ্যা কথা বলেনি তা মরিস এখানে এসেই বুঝতে পেরেছে। বিলেত থেকে একেবারে ওয়ার্কস ম্যানেজার হয়ে এসেছিল সে।

সুন্দর বাংলো কারখানার সাপ্লায়াররা সাহেবকে মানে-গনে। ওদের মাল পাস করতে হয় মরিসকে। লাখ লাখ টাকার মাল, তার থেকেও ভালো কমিশন বিলাতি মদ ভেট এসবও আসে। আবার যারা মাল কিনতে চায় তারাও সময়ে মাল পাবার জন্য সাহেবকে খুশি করে। কার্তিক বাবুদের মতো লেবার কনট্রাকটার তো দুবেলা সাহেবকে ফাদার-মাদার বলে তার পায়ের ধুলো নিজেদের মাথায় নিয়ে ধন্য হয়।

মিঃ মরিসও শিকারি বিড়াল। তাই শিকারের সন্ধান পেতে দেরি হয় না। ক্লাবেও এখন তার খাতির ব্যাচেলার বলে। অনেক জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারদের প্রমোশন দরকার। তাদের মিসেসরাও সাহেবকে খাতির করে।

মিঃ মরিসের জন্য ওই কার্তিকবাবুও রাতের গভীরে লেবার কলোনি পাশের কোলিয়ারী ধাওড়া থেকে মেয়েদের ভেটও পাঠায়। ওই মাটির গন্ধ মাখা আদিম মেয়েদের প্রতি মরিসেরও দুর্বার টান আছে। ওদেরও অনেককে নজরে ধরে মরিসের। কার্তিকবাবু জানে মরিসকে খুশি রাখতে পারলে তার ঠিকাদারির কাজ ভালোই চলবে।

তাই মিঃ মরিস বলে দেয় কার্তিককে,

—কার্তিক! দ্যাট ফুলিকে আমার চাই।

কার্তিক বলে,

—হয়ে যাবে স্যার।

অবশ্য কার্তিক জানে ওই ফুলিকে। ধাওড়ার মধ্যে সবচেয়ে মারমুখো মেয়ে ও। ওর মুখের ভাষাও তেমনি ধারালো। ওর মরদটাও একগুঁয়ে লোহা কাটার কাজ করে। মানুষ কাটতে তার বাধে না। ওয়াগন চেকিং করে, দরকার হলে হ্যামার কাটারি নিয়ে খুনখারাপি করতেও ওর হাত কাঁপে না। ওই মেয়েটাকে পাওয়া সম্ভবই নয়। খুনখারাপি হয়ে যেতে পারে। ওদিকে সাহেবের চাই ওকেই।

কার্তিকবাবু আসে রাতে। মরিস সেদিন ফুলির অপেক্ষাতেই মদ্যপান শুরু করেছে। কার্তিককে দেখে বলে,

—লেড়কি কাঁহা!

কার্তিক বলে,

—একটু রাত নিশুতি হোক সাহেব। আমি সব ব্যবস্থা করে রেখেছি। ও আসবে।

মরিসের দৈনিক আমদানি কম নয়। কাঁচা টাকার বান্ডিল ড্রয়ারেই থাকে। একতাড়া নোট বের করে দিয়ে বলে,

—কার্তিক দেও উসকো। জলদি আসতে বলো।

কার্তিক টাকাটা নিয়ে বলে,

—যাচ্ছি স্যার।

কার্তিকবাবু তার সাইকেলে সওয়ার হয়ে চলে আসে বাজারের চায়ের দোকানে। সেখানে একটু গল্পটল্প করে চা খায় আর ঘণ্টাখানেক পর হাজির হয় সাহেবের বাংলোয়।

—লেড়কি কাহা! ইউ কার্তিক।

কার্তিক বলে—ডরাইছে স্যার। ডরাইছে মেয়েটা—

মরিসকে মেয়েরা ভয় পায় শুনে তার নিজের পৌরুষে খুশিই হয় মরিস। তখন একটা বোতল মদ গিলে আর একটা বোতল বের করেছে, কার্তিক দেখে সাহেবের অবস্থা। সাহেব খুশি হয়ে আর একতাড়া নোট দিয়ে বলে,

—গো। বলো হম বাঘ না ভালু আছি। লাও—

টাকাটা নিয়ে আবার বের হয় কার্তিক। তখন রাত হয়েছে। দোকান বন্ধ হচ্ছে, কার্তিক কিছুক্ষণ-এর মধ্যে ফেরে তখন সাহেবের অবস্থা—কথা ঠিক বের হয় না, টেবিলে মাথা নামছে। তবু বলে—লেড়কি কাঁহা?

কার্তিক আরও জোর দিয়ে বলে,

—আজ্ঞে বড় ডরাইছে সাহেব। কাঁদছে বড্ড কাঁদছে।

সাহেব তার বীরত্বে এবার মোহিত হয়ে আরও কিছু টাকা দিয়ে বলে—যাও, বলো ডরো মৎ। জলদি লাও লেড়কী কো—যাও। সাহেব নেতিয়ে পড়ে। তার অবস্থাটা দেখে নেয় কার্তিক। এখন আর তার ফুলি না সৌরভী ওসব বিচার করার শক্তি নেই। কার্তিকের হাতে এমন দু-একটা মেয়ে মজুত থাকে। এবার নেশার ঘোরে এলিয়ে পড়া সাহেবের ঘরে তাদেরই একজনকে ফুলি বলে এগিয়ে দেবে। সাহেবও খুশি।

মরিসের এইসব নাটকও ওই উইলসনের নাটকের জন্য মার খাচ্ছে তাই এবার মরিসই উইলসনকে তার চেম্বারে ডেকে কথাটা বলে,

—উইলসন, আশপাশের বাংলোর অনেকেই তোমার নামে কমপ্লেন করছে। ওই শান্ত পরিবেশ তোমার যাত্রার জন্য বিঘ্নিত হচ্ছে।

উইলসন বুঝেছে শুধু নোরাই নয়। অনেকেই সাহেবের কাছে নালিশ করেছে। আর সাহেবের খবর উইলসন জানে। তাই বলে,

—বাংলোর কারা অভিযোগ করেছে জানি না, তবে আপনারও অসুবিধা হচ্ছে তা বুঝেছি।

মরিস বলে, ডোন্ট টক রাবিস উইলসন। তুমি একজন অ্যাংলো, ওই নেটিভদের

সঙ্গে এত মেলামেশা করো কী করে? অন্য কেউ তো করে না। এটা মানসম্মানের ব্যাপার—বিহেভ ইয়রসেলফ।

উইলসন বলে,

—ওটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার মিঃ মরিস। বাংলোর অন্যদের অসুবিধা করে থাকলে আমি দুঃখিত। ওখানে আর রিহার্সাল হবে না। ওদের শান্তি নাই। মিঃ মরিস, আমি ওখানে রিহার্সাল বন্ধ করছি, তবুও ওদের শান্তি কোনদিনই ফিরবে না। শুধু ওদের নয় আপনারও, প্রকৃত শান্তি কি তা কোনোদিন জীবনেও চাওনি—বাই।

উইলসন বের হয়ে আসে। মিঃ মরিস অবশ্য শান্তি টান্তির ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টাও করেনি। সে দুহাতে নানা ভাবে টাকা লুঠছে আর ভোগ করছে। ওরা এদেশে লুঠতেই এসেছে। বিলেতে থাকলে কোনোদিনই এই মুচির ছেলে এভাবে রাজত্ব করতে পারত না।

কিন্তু রিচার্ড জনসন জানে ওদের এদেশের রাজত্বের দিন শেষ হয়ে আসছে। তার দেশও ইংল্যান্ডের ল্যাঙ্কাশায়ার অঞ্চলে। উইলো ম্যাপল পাইন গাছ ঘেরা একটি উপত্যকা থেকে দূর প্রবাসে এসেও জনসন তার দেশের কথা ভোলেনি। তার বাবা ছিলেন স্কুলের নামকরা শিক্ষক। জনসন ও অর্থনীতি নিয়ে পড়াশোনা করে এদেশে আসে আর এখানে আসে পাবলিক রিলেশন অফিসার হিসাবে। সাহিত্য সঙ্গীত সম্বন্ধেও তার আগ্রহ রয়েছে। এদেশের মানুষের উপর ইংরেজদের অবিচার অত্যাচারকে প্রত্যক্ষ করেছে আর নিজেও লজ্জা পেয়েছে।

জনসন দেখেছে মিঃ মরিস মিঃ হাভার্ডদের। যোগ্যতার তুলনায় অনেক পেয়েছে তবু খুশি নয়। তাদের তুলনায় জনসনের তাই উইলনকেই বেশি ভালো লাগে। সদাহাস্যময় পুরুষ কাজও করে নিষ্ঠার সঙ্গে, জীবনকে উপভোগ করে এদের পথে নয়। অন্য পথে জনসনও মাঝে মাঝে আসে রিহার্সাল দেখতে।

সেদিন উইলসন বলে,

—জনসন, মরিস সাহেব ওখানে রিহার্সাল হোক চান না। ওদের নাকি শান্তিভঙ্গ হচ্ছে—অসুবিধা হচ্ছে। আর ইত্যিজনদের আসা যাওয়ার ফলে তাদের মানসম্মানেরও ক্ষতি হচ্ছে।

জনসন অবাক হয়ে বলে—স্ট্রেঞ্জ।

উইলসন বলে,

—তাই ওখানে রিহার্সাল আর হবে না। ক্লাবেই রিহার্সাল করব।

খবরটা অনেকেই জেনেছে, বিজনও। সেও অবাক হয়। বলে,

—ওই বাংলোর রাজত্ব ওদের। ওখানে অন্যদের নো অ্যাডমিশন। এদেশ কি আমাদের নয়।

জনসনও ভাবছে কথাটা। এই প্রশ্ন যে এবার ভারতীয়দের মনে জাগছে সেটাও বুঝেছে সে।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর এতদিন পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। এবার দীর্ঘকালের

মধ্যে হিটলার আর নাৎসি জার্মানির জন্ম দিয়েছে। ইউরোপে বেজে উঠেছে যুদ্ধের দামামা। ইংরেজও এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে। আর তাই তার রাজত্ব এই ভারতেও ঘনিয়ে এসেছে যুদ্ধের ছায়া। ইতিহাস বলে এক একটি মহাযুদ্ধ এক এক উদ্ধত জাতির দেশের চরম সর্বনাশই ডেকে আনে। শুধু জীবনহানি আর রক্তক্ষয়ই ঘটায় না এই যুদ্ধ।

জনসন এদেশে এসে দেখেছে এদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে। দীর্ঘ অনেকগুলো বছর ধরে এদেশের মানুষ এবার ইংরেজের বিরুদ্ধে সরব হয়ে উঠেছে। শুরু হয়েছে আন্দোলন। তরুণদের অনেকেই বিপ্লবের পথে গেছে। অত্যাচারী ইংরেজের হত্যার চেষ্টাও করেছে।

কংগ্রেসও এবার স্বাধীনতা আন্দোলনে নেমেছে। দেশের বিভিন্ন প্রদেশে শুরু হয়েছে অহিংস ও সহিংস আন্দোলন। বালগঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপত রায়, গোখলে, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, সুরেন্দ্রনাথ, যতীন সেনগুপ্ত, সূর্য সেন তারপর সুভাষচন্দ্র আরও বহুনেতাই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। গান্ধীজীর নেতৃত্বে এবার কংগ্রেস প্রকাশ্যেই ভারত ছাড়ো আহ্বান দিলেন ইংরেজকে। জনসন দেখে— উত্তাল হয়ে ওঠে ভারতবর্ষ। নেতারা ব্রিটিশের জেলে তবু সাধারণ মানুষ এই আন্দোলনকে সফল করতে এগিয়ে এল। সারা ভারত জুড়ে শুরু হল আন্দোলন। ট্রেনলাইন উপড়ে ইংরেজের বিভিন্ন দপ্তরে কাজ বন্ধ করে জীবনযাত্রাকে স্তব্ধ করে দিয়ে জানালো ভারতবাসী তারা ইংরেজদের আর সহ্য করবে না।

আর এই সময়ই যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়েছে। তখনই ইংরেজদের বন্দিদশা থেকে বের হয়ে চলে গেলেন সুভাষচন্দ্র ভারতের বাইরে। আকাশে যেন মেঘ ঘনীভূত হচ্ছে এটা এই শিয়ালডাঙার ইংরেজ সমাজ বুঝতেই চায় না।

এই শিয়ালডাঙার নিভৃত শহরেও শুরু হল আন্দোলন। রেলবন্ধ, সড়কপথও বন্ধ। স্কুলের ছাত্রদের নিয়ে জনসাধারণকে নিয়ে নিতাইবাবু মিছিল করেন। এই অঞ্চলের শ্রদ্ধেয় মানুষ তার নেতৃত্বে শুরু হল আন্দোলন। কারখানা বন্ধ করতে চায় তারা, জনতা এগিয়ে আসছে মেন গেটের দিকে। জেনারেল ম্যানেজার মিঃ হাভার্ড, ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার মিঃ মরিস-এর ইংরেজ রক্তে মারণ ধরে। নেটিভদের এই দুঃসাহসকে তারা মেনে নেবে না। উচিত শিক্ষাই দেবে। পুলিশও ওদের হাতের কেনা গোলাম, এবার ওই মিছিলের ওপর ইংরেজের গোরা পুলিশ বাহিনী আক্রমণ শুরু করে। অহিংস জনতাকে প্রচণ্ড প্রহার করে। নিতাইবাবুসহ আরও বেশকিছু লোককে অ্যারেস্ট করে তখনকার মত আন্দোলনকে চাপা দেয় হাভার্ড মরিসের দল।

এসবই দেখেছে জনসন।

এখন অবশ্য বাঁচার তাগিদে কারখানার কাজ শুরু করেছে শ্রমিকরা শহরের দোকান-পাটও খুলেছে। আবার শুরু হয়েছে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা। ক্লাবে সাহেব মেমদের নাচগানও চলছে। কিন্তু ইতিহাসের ছাত্র জনসনের মনে হয় বদ্ধমুখ এক আগ্নেয়গিরি এখন শান্ত। তবে যে কোন সময় ঘটতে পারে বিস্ফোরণ ছড়িয়ে পড়বে জ্বলন্ত লাভাপ্রবাহ আর সেই অগ্নিস্রোতে ইংরেজকে ভেসে যেতে হবে

এখান থেকে।

অবশ্য দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জন্য কারখানাতে অনেক বেশি মাল এখন তৈরি হচ্ছে। পুরো তিনশিফট কাজ করেও মালের চাহিদা মেটাতে পারছে না। শ্রমিকদের আয় পয়সাও আসছে প্রচুর আর মরিস হাভার্ডদের আমদানিও বাড়ছে।

এমনি দিনে মরিস যেন এদের জানিয়ে দিল ওই রিহার্সাল বন্ধ করে, যে ইংরেজদের এলাকায় ভারতীয়দের নিজের মতো করে চলার কোন অধিকারই নেই—

খবরটা নিয়ে ক্লাবেও আলোচনা হয়। এখন রিহার্সাল হচ্ছে ক্লাবেই। অভিনয়ের দিন ঘনিয়ে আসছে। বিজনেরও বড় রোল রয়েছে এই নাটকে। সেও ব্যস্ত। হঠাৎ সেদিন বিজন কারখানা থেকে বের হয়ে আসছে মেসের দিকে। হঠাৎ বাজারের ওখানে সীমাকে দেখে চাইল। সীমা বাড়ির একজন কাজের লোককে নিয়ে বেরিয়েছে।

ওকে দেখে এগিয়ে আসে বিজন।

—তুমি বাজারে—

সীমা বলে,

—জেঠুমণির শরীরটা ভালো নেই। তাই ওষুধ কিনতে এসেছি।

—তাই নাকি। কেমন আছেন?

সীমা বলে,

—একটু ভালো। তবে খুব দুর্বল।

বিজন বলে—কদিন যেতে পারিনি। আজ বিকালে যাবো। বাজারের এখানে ওখানে এর মধ্যে পোস্টারও পড়েছে। উইলসন সাহেব-এর এসব পরিকল্পনা। নাটকের খরচও এই ভাবে দর্শকদের কাছ থেকে চাঁদা হিসাবে তোলেন। তাই প্রচারটা ভালোই হয়। সীমা একটা পোস্টার দেখিয়ে বলে,

—এখনও নাটক নিয়ে খুব ব্যস্ত। পোস্টারে বড় বড় করে নামও ছাপা হচ্ছে।

বিজন হাসে,

—ছাড়ো তো। চলি। আজ বিকেলে যাবো স্যারের কাছে।

নিতাইবাবুর এখন সময় নেই। এই এলাকার মানুষের সুখ-দুঃখের সঙ্গে তাদের পরিবার পুরুষানুক্রমিক ভাবে জড়িত। ওর বাবা জমিদারির আয় থেকে পরে কোলিয়ারির আয় থেকে স্কুল দাতব্য চিকিৎসালয়, পথঘাট এসব করেছিলেন এই অঞ্চলের অনেক গ্রামে। নিতাইবাবুও বাবার সেই প্রতিষ্ঠানগুলোকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। আর সেবার কাজ করে চলেছেন। গান্ধীজীর নীতিকে তিনি সমর্থন করেন তাই কংগ্রেস নিয়েই রয়েছেন। এখন তাদের প্রকৃত আন্দোলনই শুরু হয়েছে। সারা এলাকাতে ঘুরেছেন। সংগঠন শক্ত করে তুলেছেন। বহুমানুষ এখন স্বপ্ন দেখে তারা স্বাধীনতা পাবেই।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ইংরেজ তার প্রাধান্য হারাবে ভারতবর্ষ থেকে বিদায় নিতেই হবে তাদের। তাই নিতাইবাবুও ভারত ছাড়ো আন্দোলনে শামিল হয়েছেন।

বেশ কিছুদিন জেলে কাটিয়ে এসেছেন। অবশ্য এর আগেও কোন বিপ্লবীদের আশ্রয় দেবার জন্য তাকে কয়েক বছর জেলবাস করতেও হয়েছিল।

কদিন প্রচণ্ড ঘোরাঘুরির জন্য শরীরটা ভালো নেই। বিকালে বিজন এসেছে। আর সেদিনই ডাকে নিতাইবাবুর ঠিকানায় পত্রিকাটা এসেছে। নিতাইবাবু পত্রিকাটা খুলে দেখে অবাক হন। বিজনের সেই গল্পটা ছাপা হয়েছে আর সেই সঙ্গে সম্পাদকের একটা চিঠিও রয়েছে। এই লেখকের গল্প তিনি আরও ছাপাতে চান। এর সম্ভাবনা আছে নিতাইবাবু যেন ওকে আরও গল্প আরও লেখা পাঠাতে বলেন।

নিতাইবাবু ডাক পাড়েন,

—সীমা! ওরে সীমা শোন।

সীমা জেঠুমণির ডাক শুনে এঘরে আসে।

—কি হল জেঠুমণি! এত হাঁকডাক কিসের?

নিতাই পত্রিকাটা দেখিয়ে বলে,

—দ্যাখ কী কাণ্ড!

সীমা অবাক হয়—কী হয়েছে?

নিতাইবাবু বলেন,

—বিজনের লেখা ছাপা হয়েছে। কলকাতার এই নামী কাগজে। আর সম্পাদক কী লিখেছেন দ্যাখ। ওঁর আরও গল্প চাই।

সীমাও দেখছে চিঠিটা। বিজনকে সেও চেনে। শান্ত, ভদ্র, বিনয়ী ওই ছেলেটাকে তার ভালো লাগে। কারখানার ওই হাড়ভাঙা খাটুনির পরও সে লেখার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। সীমা বলে,

—অনেক দেশসেবক চ্যালা তো তৈরি করলে, এবার দ্যাখো একজন লেখক তৈরি করতে পারো কি না। তোমার চ্যালারা তো এক একটি রত্ন। নামেও রতন—কাজেও।

নিতাইবাবু হাসে—কেন রে!

—ও! ওই রতনের কথা বলছিস।

শিয়ালডাঙার এই কারখানা তৈরি হবার পর এখানে বাইরের অনেক লোকই এসেছিল কারখানার কাজে। এখানের পরিবেশে দীর্ঘ তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর কাজ করে রিটায়ার করে অনেকেই তাদের দেশে ফিরে গেছে আবার অনেকে তাদের দূর-দূরান্তের গ্রামে না গিয়ে এখানেই বাড়িঘর করে রয়ে গেছে। তাদের ছেলেরা অনেকে এখানে কাজ করছে—কেউ বা ব্যবসা-বাণিজ্য না হয় অন্য কোনো কাজ করছে।

রতনের বাবা প্রশান্তবাবুও এই কারখানার ফোরম্যান ছিলেন। ফিটার হিসাবে জয়েন করে পরে ধাপে ধাপে উঠে ফোরম্যান হয়ে রিটায়ার করেন। প্রশান্তবাবুর বড় ছেলে মানিক কারখানায় কাজ করে আর ছোট রতন ছেলেবেলা থেকেই বাবুপাড়ায় সর্দারি করতো। পড়াশোনায় তেমন মনো যোগ ছিল না। তবে কোনমতে টুকে না হয় কোনোমতে টেনেটুনে ক্লাস টেন অবধি উঠে বার তিনেক ঠোক খেয়ে পড়া ছেড়ে দিয়ে এবার পাড়ার ভোটের সময় নিতাইবাবুর দলের হয়ে কাজ করে।

এর মধ্যে রতন অবশ্য বেশ কিছু ছেলেকে রাতের অন্ধকারে কোলিয়ারির স্টক ইয়ার্ড থেকে কয়লা চুরি করায়। আর সেসব মাল থেকে শেঠের গুদামে বিক্রি করে তারা। রতন অবশ্য প্রকাশ্যে থাকে না। তার দলের ছেলেরা ওসব যা করার করে। রতন পরে মোহনলালজীর ওখান থেকে কমিশন পায়।

কারখনার আশপাশে একপ্রকার অন্ধকারের জীব গজিয়ে ওঠে। তারা অন্ধকার জগতেরই বাসিন্দা। এদিকে কারখানার বহু বাতিল মালের ব্যবসাও চলে নানা পথে। আর এছাড়া এখানের মাটির তলে রয়েছে কালো হিরে অর্থাৎ কয়লা। এক ঝুড়ি তুলতে পারলেই নগদ দামে কিনে নেবার লোকও আছে। তাই সহজেই এখানে অনেক কিছু করা যায়। রতন ও পথগুলো ভেবেছে। কিন্তু তবে সে জানে বাইরে তাকে অন্যরূপে থাকতে হবে। তাই সে নিতাইবাবুর দলেই ভিড়েছে আর তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সাহসের জন্য দলের মধ্যে পরিচিত হয়ে উঠেছে। একটা সাইকেল তার সঙ্গী, তাই নিয়ে কারখানার বাবুপাড়া—কুলি বস্তীতে ঘোরে। আশপাশের গ্রামে আরও কোলিয়ারীতেও তার যাতায়াত আছে।

সেবার ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময়, প্রথম সারিতে থেকে জেলও খেটে এসেছে। তাই লোকে তাকে বিশ্বাসও করে। নিতাইবাবু সীমার কথায় বলেন,

—নারে, রতন কাজের ছেলে। কাজেও ফাঁকি দেয় না। দলের কাজে ওর খুব নিষ্ঠা।

সীমা জবাব দেয় না। নিতাইবাবু প্রসঙ্গ বদলাবার জন্য বলেন,

—বিজনের গল্পটা পড়ে দ্যাখ। দারুণ লিখেছে রে ছেলেটা।

সীমা পত্রিকাটা নিয়ে যায় তার ঘরে।

বিকেলে বিজনও এসেছে। নিতাইবাবু ওকে দেখে খুশিই হন।

—এসো বিজন। ওরে সীমা বিজন এসেছে।

সীমা এর মধ্যে বিজনের গল্পটা পড়েছে। সীমা পত্রিকাটা আনে, নিতাইবাবু বলেন,

—বিজন, তোমার গল্পটা ছাপা হয়েছে হে। আর দ্যাখো সম্পাদকের চিঠি।

বিজনকে সীমাই পত্রিকাটা দেয়। বিজন বিশ্বাসই করতে পারে না যে তার লেখা ছাপার অক্ষরে কোনোদিন রূপ নেবে। বারবার নিজের নামটা পড়ছে, দেখছে. লেখাটা।

একরাতে মেসের ঘরে বসে লেখাটা তৈরি করেছিল। সেদিন তার গ্রাম—সেইসব মানুষদের সুখ-দুঃখের কথা যে এইভাবে বৃহত্তর জগতের আলোয় আসবে ভাবেনি। এরপর ও দু'একটা গল্প লিখেছে কিন্তু সাহস করে আর নিতাইবাবুকে দেখাতে পারেনি। বলেওনি। আজ এই লেখাটা প্রকাশিত হতে আর সম্পাদকের কাছ থেকে লেখার জন্য আমন্ত্রণ আসতে এবার বিজনও উৎসাহ পায়।

নিতাইবাবু বলে,

—ওরে সীমা বিজনকে চা দে। মিষ্টিমুখ করা। আজ থেকে ও আর বিজন নয়। লেখক শ্রীবিজন।

সীমা বলে,

—তোমার এই চ্যালাকে আর বেশি গ্যাস দিও না জেঠুমণি। বেলুনে বেশি গ্যাস পুরলে সেটা হয় উপর দিকে উঠে যায় না হলে ফেটে যায়।

বিজন চুপ করে থাকে। নিতাইবাবু বলেন,

—নারে! বিজন তেমন নয়! ও জানে পরিশ্রম আরও করতে হবে, সহজে কোনো কিছু পাওয়া যায় না। ওকে এখানেই থামলে চলবে না। ওকে আরও অনেক দূর অবধি যেতে হবে। আরও উপরে উঠতে হবে। আরও অনেক কিছু শিখতে হবে।

—তোমার রাজনীতির কথা! সীমা বলে,

নিতাইবাবু বলেন,

—না রে! ভারত স্বাধীন একদিন হবেই। আজকের রাজনীতি করি আমরা ঘরে থেকে সর্বস্ব দিয়ে। দেশকে ভালোবাসি বলে, মানুষকে ভালোবাসি বলে। ভয় হয় দেশ স্বাধীন হলে রাজনীতির এই রূপটা তার ত্যাগের দিকটা সম্পূর্ণ হারিয়ে না যায়। তখন লোক আর ত্যাগের জন্য নয় ভোগের জন্য রাজনীতি করবে। কারণ স্বাধীন দেশের শাসনভার তুলে নেবে রাজনৈতিক দলই, তারা এই ত্যাগের কথা দেশের মঙ্গলের কথা কতটা ভাববে কে জানে? তাই ওকে বলব রাজনীতির আসরে যেন না আসে।

বিজন ভাবছে কথাটা। ভবিষ্যৎ এ সমাজের কি রূপ হবে তা সে ঠিক ভাবতে পারে না। বিজন আশা করে তবু দেশ স্বাধীন হলে তারা নতুন করে বাঁচবে। পদে পদে বঞ্চনা, অপমান সইতে হবে না। তাই বলে,

—এসব কেন ভাবছেন স্যার? স্বাধীন হলে দেশের মানুষের ভালোই হবে।

—হলেই ভালো, সেই আশা নিয়েই রাজনীতি করছি বিজন।

নিতাইবাবুও সেই আশা পোষণ করেন।

শিয়ালডাঙায় খবরের কাগজ আসে দুপুরে, কলকাতা থেকে সকালের ট্রেনে আসানসোল। ট্রেন আসে দশটা নাগাদ। সেই গাড়িতে কাগজ আসে। আর সেখানে থেকে হকাররা কাগজ নিয়ে লোকাল ট্রেনে এসে দুপুরের মুখে কাগজ বিলি করে। বাজারের দোকানি হাঁকে দেশের আজকের খবর নিয়ে।

মহাযুদ্ধ তখন বাংলার ঘরেও এসে পড়েছে। বার্মার দিক থেকে জাপানিরা এসে কলকাতায় বোমা ফেলেছে। কলকাতা থেকে লোকজন পালাচ্ছে। ভীতত্রস্ত লোকজন গ্রামে ফিরছে কলকাতা ছেড়ে জাপানি বোমার ভয়ে। বাইরের শহর থেকে গ্রামে এসেছে তারা, কলকাতা থেকে এখানে অনেক কর্মীর আত্মীয়স্বজনও চলে এসেছে এই শান্ত পরিবেশে। কাগজে খবর বেরিয়েছে জাপানি ফৌজ বার্মা দখল করে এবার ভারতের দিকে আক্রমণ করবে। ইউরোপেও জার্মান শক্তি হানা দিয়েছে ইংরেজদের বাসভূমিতে। লন্ডন শহরে বোমা ফেলছে তারা। শক্তিমান ব্রিটিশ এবার পরাজয়ের মুখেই।

শিয়ালডাঙারই নয় এদিকের বহু কোলিয়ারীর বিদেশি সাহেব-মেমদের দলও ক্লাবে সমবেত হয়। তারা দেখেছে ভারতের যে সব সাধারণ মানুষদের তারা এতদিন

ধরে শাসন শোষণ করে এসেছিল। পায়ের নীচে রেখেছিল আজ তারা ব্রিটিশের এই বিপদে খুশিই হয়েছে।

হাভার্ড বলে,

—ব্লাডি ইণ্ডিয়ান নিগারস্ অল আনগ্রেটফুল।

মরিস মদ গিলে গর্জন করে,

—দ্যাট গান্ধী—সুভাষ বোস অল দি ব্লাডি ফেলোজ আমাদের সর্বনাশই দেখতে চায়। ওদের এবার এমন শবক শেখাব।

মটন সাহেব বলে,

—মরিস এখন ওসব করতে যেও না। উই আর ইন ট্রাবল।

মরিস বলে,

—আমরা বিপদে পড়েছি আর দ্যাট উইলসনের কাজ দেখেছ। ব্যাটা কিনা ওই নিগারদের সঙ্গে মিশে ওদের নববর্ষ উৎসব করছে। নাটক করছে। হাভার্ড বলে—তাই দেখছি। ওই অ্যাংলোগুলোকে এতদিন সুযোগ-সুবিধা দিয়েছি নিগারদের চেয়েও বেশি। আর ওরা ওই ইন্ডিয়ানদের দিকেই ঝুঁকেছে। চুপচাপ দেখে যাও এখন, দিন এলে এসবের জবাব দোব।

এতদিন ধরে শিয়ালডাঙা স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাবের নানা উৎসবে এরা বহু সাহেব-মেমসাহেবদের নিমন্ত্রণ করেছে। নাটকের উৎসবে তারাও এসেছে। বড়সাহেব অন্যরা দুচার কথা বলে উৎসবে অংশ নিয়েছে। এবারও নববর্ষ উৎসবের আয়োজন করেছে ক্লাব থেকে। এখন এদিকে বেশ গরম পড়েছে। শক্ত পাথুরে জমিতে যেন আগুনের তাপ ওঠে। তবু বসন্তের ছোঁয়া কিছু রয়ে গেছে। এখন পলাশ কিছু রয়ে গেছে লাল আভা নিয়ে।

কৃষ্ণচূড়ায় এসেছে পুঞ্জিভূত রক্তিম আভাস। সারা শহরের অজস্র গাছে গাছে নতুন পাতার সাজ। বাইরের যুদ্ধ-বোমার ভয় এখানে নেই।

ক্লাবের সামনের খোলা জায়গায় একটা স্টেজ করা হয়েছে। ওখানেই উৎসব শুরু করা হবে, ভাষণ-নাচগানের মধ্যে। সন্ধ্যায় হবে কেদার রায় নাটক।

উইলসনের সময় নেই। বাড়িতে খেতে যায় মাত্র। কারখানার চাকরির পর কিছুক্ষণ বাড়িতে থাকে। আর সেই সময়টা কাটে নোরার একটার পর একটা অভিযোগ শুনে।

উইলসন জানে কথা বললেই বিপদ হবে। নোরাও দশ কথা শুনিয়ে দেবে। তাই সে চুপচাপই থাকে। এখন নাটকের ভাবনা তার মাথায়। এখানের আজকের নাটক ভালোভাবে উৎরালে কালীপাহাড়ী বাঁশপোতা কোলিয়ারিতেও এই নাটক ওরা করতে যাবে। উইলসন-এর নাটকের দলের নাম এই এলাকাতে সুপরিচিত। লোকে বলে পাগলাসাহেবের দল।

উইলসন বিকেল থেকেই ক্লাবে এসে সবদিক দেখাশোনা করছে। ড্রেসাররা ঠিকমত ড্রেস এনেছে কি না দেখতে হবে। ওদিকে লাইটের ছেলেদেরও সিনগুলো আগেই বুঝিয়ে দিয়েছে। সেই তাদের বলেছে কোন সিনে কেমন আলো হবে। তারপর মিউজিক-এর লোকেদের নিয়ে বসেছে সুর, ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক নিয়ে।

বিজনই এখন তার প্রধান সহকারী হয়ে উঠেছে। ছেলেটা নাটক সম্বন্ধে কিছুটা বোঝে। নিজেও ভালো অভিনয় করে। চেহারাটাও আছে, আর আছে অভিনয় সম্বন্ধে জ্ঞান।

উইলসন বলে,

—বিজন, তুমি ওই ভূপেনবাবুকে যিনি কেদার রায় সাজছেন তার মেকআপটা দেখে দিও। ওদিকে ওই ভায়োলিস্টদের বল ঠিকমতো যেন ওরা বাজায় না হলে সিন ম্যাসাকার হয়ে যাবে। অ্যাই কানাই তোর ঢোল ঠিক আছে তো!

কানাই কারখানার ফোর্জিং সেকশনে কাজ করে। তবলা ঢোল ও ভালোই বাজায়। কানাই ঢোলে দুহাতে দুতিনটে জোর চাপড় মেরে গড়াগুম গড়াগুম শব্দ তুলে বলে,

—দ্যাখেন সাহেব ঢোল আমার যুদ্ধের সিনে মাত করে দেবে।

ওদিকে সকালের অনুষ্ঠানে কোনোসাহেবই এবার আসেনি। বড় সাহেব অবশ্য জানিয়েছেন তার জরুরি মিটিং আছে। মরিস সাহেব এড়িয়ে গেছে—অন্যরাও কেউ আসেনি। এসেছিল মিঃ জনসন। উইলসন তখন কারখানায়।

প্রথমে ওরা ব্যাপারটা ঠিক খেয়াল করেনি। ভেবেছিল সন্ধ্যায় নাটক দেখতে আসবে অনেকে। তাদের জন্য আপ্যায়নের ব্যবস্থাও করেছিল।

সকালের অনুষ্ঠানে রীনাও এসেছিল। উইলসন ছেলেদের মিঃ মিত্রের বাংলোতে পাঠিয়েছিল ওকে বিশেষ করে বলতে। ছেলেদের দেখে মিঃ মিত্র ঠিক খুশি হননি। ওদের বাংলোয় ঢুকতে দেখে তিনি বলেন,

—তোমরা!

অর্থাৎ এখানে যেন তারা অবাঞ্ছিত। রীনা এর মধ্যে এদের ক্লাবে দুচারদিন এসেছে। লাইব্রেরি থেকে বাংলা বইও নিয়ে যায় সে, তাই এদের মুখ চেনে। রীনাই ওদের অভ্যর্থনা করে।

—এসো। এসো—বসো।

ওরা সাহেবের সামনে বসে ড্রইংরুমের সোফায়। মিঃ মিত্র স্ত্রীর জন্য কিছু বলতে পারে না। তবে খুশি যে সে হয়নি সেটা ওর মুখ দেখলেই বোঝা যায়। ছেলেরা বলে,

—ক্লাবে আমরা নববর্ষ উৎসব করছি। আপনাকে আমন্ত্রণ জানাতে এলাম। আর একটা অনুরোধ নিয়েও এসেছি। যদি কথা রাখেন খুশি হবো আমরা সকলে।

মিঃ মিত্র বলেন,

—তোমাদের ক্লাবে আমরা তো অফিস থেকেই টাকা দিই। আবার ডোনেশনের জন্য অনুরোধ করছ কেন? ইট ইজ নট ফেয়ার।

ছেলেদের মধ্যে বিজনও ছিল। সে বলে,

—ডোনেশনের জন্য আসিনি স্যার।

অবাক হন মিত্র সাহেব, বলেন—

—তবে?

বিজন বলে,

—ম্যাডাম খুব ভালো রবীন্দ্রসঙ্গীত গান। নববর্ষ উৎসবে যদি উনি দয়া করে কিছু রবীন্দ্রসঙ্গীত গান।

মিঃ মিত্র সাহেবদের ক্লাবে যান। এখন তিনি মিঃ মরিস সাহেবদের পেছনে পড়ে আছেন। চেষ্টা করছেন যদি প্রমোশনটা পাওয়া যায়। তাই ওদের খুশি রাখতে চান। মিত্র সাহেব জানেন সাহেবরা এখন খুবই মানসিক অশান্তিতে আছে এই যুদ্ধের জন্য। ওদের দেশেও বোমা পড়ছে। ইংরেজরা কোণঠাসা হয়ে গেছে এখন। আমেরিকার দাদাদের দিকে চেয়ে আছে। এমন সময় এদের ঘটা করে উৎসব করাকে ওরা ভালো চোখে দেখেনি। তাই মিত্র সাহেব বলেন,

—এই সময় তোমরা উৎসব করছ। ইংরেজরা এখন বিপদের মধ্যে রয়েছে। এখন উৎসব গান এসব ঠিক নয়।

বিজন শুনছে ওর কথা। এবার বুঝতে পারে সাহেবরা কেন খুশি নয়।

রীনাও সব কথা শুনেছে। সেই-ই বলে বিজনকে,

—তোমাদের উৎসবে আমি যাব।

মিঃ মিত্র স্ত্রীর দিকে চাইলেন বিস্মিত চাহনিতে। তার স্ত্রীর সাহেবদের প্রতি এই নির্মমতায় তিনিও সচকিত হয়েছেন। কিন্তু রীনা বলে—

—রেওয়াজ এখানে ঠিকমতো করতে পারছি না। দুখানার বেশি গান কিন্তু গাইতে পারব না।

বিজনরা খুশি হয়। বলে—তাই হবে ম্যাডাম। কাল সকালে নটায় প্রোগ্রাম।

রীনা বলে,

—আমিই চলে যাব ঠিক নটাতেই।

ওরা চলে যেতে মিঃ মিত্র স্ত্রীর এই অবাধ্যতায় চটে ওঠে বলেন,

—এটা কি ঠিক করলে? সাহেবরা কেউ উৎসবে যাবেন না আর তুমি যাবে গান গাইবে।

রীনা বলে,

—আমি সাহেব-মেমসাহেব নই যে বিলেতে বোমা পড়ছে বলে এখানে ঘরে ঢুকে থাকব। ওরা এতদিন সকলকে শাসন করেছে।

এবার জানুক তাদের শাসন করা চিরদিন অন্য লোকে সহ্য করবে না।

—রীনা! মিত্রসাহেবের কণ্ঠস্বর বেজে ওঠে।

কোনো জবাব না দিয়েই রীনা ভিতরে চলে গেল। ওর দিকে—অবাক হয়ে চেয়ে থাকেন মিঃ মিত্র, মিঃ মিত্র কি করবে বুঝতে পারছে না।

তার স্ত্রী ওদের উৎসবে গাইবে এখবর ওই মিঃ প্রধান মিঃ দত্ত, হাভার্ড মরিসদের কানে তুলে দেবে। মিঃ মিত্রের প্রমোশনও ঝুলে থাকবে। রীনাকে সম্বল করে চাকরির প্রতিযোগিতা জিতে যাবে ভেবেছিল মিঃ মিত্র এখন সব চাল ফসকে না যায়। ওদিকে মিঃ দত্ত তো হাত পেতেই বসে আছে সাহেবদের কাছে।

মিঃ মিত্র অবাক হয় রীনার এই ব্যবহারে। সকালে গিয়ে সে ওই মঞ্চে গান গিয়ে এসেছে। মিঃ মিত্রও খবর পেয়েছে ওখানে কোনো পদস্থ অফিসাররা যাননি। ওখানে গেছল মাত্র দুজন, ওই জনসন। ওটা একটু গোঁয়ার বেপরোয়া। আর

উইলসন, আধা সাহেব—ওটার কথাই আলাদা।

সেইদিনই ক্লাবের অভিনয় দেখতে এখানের বহু লোকজন এসেছিল। নিতাইবাবুও এসেছিলেন—এসেছিল বিজনের কাকা অবিনাশকাকু, কুসুম, কমলও। সেই রাতে নাটকও বেশ জমেছিল।

কেদার রায়—কাভার্লোর—বিজনের চরিত্রের অভিনয়ও সুন্দর হয়েছিল। উইলসন-এর কাভার্লোর অভিনয় দর্শকদের মন জয় করে।

ঘনঘন হাততালির শব্দ ওঠে আসরে। সেই শব্দ সাহেবদের ক্লাব অবধি পৌঁছায়।

মরিস তত চটে ওঠে।

—দ্যাট ব্লাডি উইলসন। একটা ট্রেটার।

হাভার্ড বলে,

—জনসনও তো গেছে শুনেছি।

জনসনকে মরিস সহ্য করতে পারে না। জনসন লেখাপড়া জানে ও এদের নানা পথে টাকা হাতানোর খবরও জানে। ওদের বলেছিল,

—এভাবে কারখানাকে লুঠ করো না মিঃ মরিস। তোমার মাইনে তো কম নয়। তবে এসব কেন করো? ইংরেজ জাতের সুনাম এতে বিপন্ন হবে।

মরিস জানে ওকে চটালে বিপদ হতে পারে। ওর সহকারী মিঃ ঘোষালও যেমন—লোকটা ঘুসও নেয় না। তেমনি হয়েছে ওই জনসন। তাই মরিস অসহায় রাগে শুধু গজগজই করে। ওদের নাটক ঠিকই অভিনীত হয়ে চলেছে। দর্শকদের উল্লাসধ্বনি শোনা যায়।

হাভার্ডরা ততই চটে। এ যেন ওরা ইচ্ছে করেই ওদের বিপদের দিনে সমবেত ভাবে আনন্দ করে তাদের বিরোধিতা করছে। হাতে পেলে ওদের সবগুলোকে সে উচিত শিক্ষাই দেবে।

ওদের নাটক চলছে ক্লাবের প্রাঙ্গণে। সেই রাতে সকলেই নাটক নিয়ে ব্যস্ত। এখন কার্তিকবাবুও ব্যস্ত অন্য নাটক নিয়ে। সেই নাটকের চরিত্রগুলো আলাদা। তারা সকলেই অন্ধকারের নায়ক। কার্তিকবাবুর কাজ কারবার বিচিত্র ধরনের। এমনিতে লোকটা বেশ শান্ত ধরনের। এদিকেই কোনো গ্রামে বাড়ি। ব্রাহ্মণ, গলায় পৈতা আছে, ত্রিসন্ধ্যা নামজপ করে। সন্ধ্যা-আহ্নিকে বসে দেবদেবীদের খুশি করার চেষ্টা করে।

কোলিয়ারি তখন সরকার অধিগ্রহণ করেনি। কোলিয়ারি চলতো ব্যক্তিগত মালিকানায়। কেউ বা অন্য কোনো কোম্পানিকে জমি লিজ দিত, সেই কোম্পানি কয়লা তুলে বিক্রি করতো আর টন প্রতি একটা টাকা দিত জমির মালিকদের।

কার্তিকবাবু প্রথমে কোনো কোলিয়ারিতে স্থানীয় লেবারদের জোগান দিত। লেবার পিছু তার একটা কমিশন থাকতো। সেই তার ব্যবসার শুরু। তারপর নিজেই লোকজন নিয়ে কোনো কোলিয়ারির কয়লা তোলার কাজ নেয়। তাতেও বেশ ভালো টাকা রোজগার করে। সেই ব্যবসা ধরেছে আরও লোকজন সংগ্রহ করে সে এবার লোহা কারখানার ঠিকাদারির কাজ করে এখন এই এলাকাতে পরিচিত হয়ে উঠেছে।

গ্রাম্য কার্তিকবাবু সাহেবদের সঙ্গে ওঠাবসা করে। তাদের নানাভাবে খুশিও

করে। কার্তিকবাবু এবার আর একটা কাজেও নেমেছে। অবশ্য এর জন্য হাভার্ড—মিঃ মরিসকেও সে প্রণামী দেয়। ওই কার্তিকবাবু জানে এখন স্ক্র্যাগের চাহিদা বেড়েছে। হাওড়ার বহু লোহা কারখানা ওর থেকে চার্জিং করে লোহা বের করে লাখ লাখ টাকার ব্যবসা করছে। রাতের অন্ধকারে ওখানে রতনের দল আগে থেকেই স্ক্র্যাগ পাচার করছে। কার্তিকবাবু কৌশলী লোক, তার লোকজন ট্রাক অনেক। কার্তিকবাবু রতনের ব্যাপারটা জানে। ছেলেটা সাহসী, তাই কার্তিক ওকে শত্রু করতে চায় না। বরং তাকে হাতে রাখতে পারলে আরও শান্তিতে আরও বেশি কাজ করা যাবে। কার্তিকবাবুর বাগানবাড়িতে ওই রতনকে ডেকেছে কার্তিকবাবু।

কার্তিকবাবু হাওয়া বুঝে চলতে জানে। জীবজন্তুদের একটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় থাকে তাই নিয়ে ওরা ঝড়ের পূর্বাভাস টের পায়, কার্তিকবাবুও এই মহাযুদ্ধের গতিপ্রকৃতি দেখে বুঝেছে এবার একটা আমূল পরিবর্তন আসবে। একটা বিরাট ভাঙাগড়ার পালা শুরু হবে।

এই ওলটপালটের মধ্যে নতুন একটা শ্রেণী গড়ে উঠবে তারাই হবে সমাজের কর্তা। এমনি ঘটনার মুখোমুখি হবার জন্য তৈরি হতে হবে।

কার্তিক মোহনলালের সঙ্গে সম্পর্কটা রেখেছে, মোহনলালের বাড়িতেও যায়। ওর স্ত্রীকেও হাতে রেখেছে। মোহনলালও কার্তিকের দিকে একটু বেশি নজর দিয়েছে। চাকরি থেকে রিটায়ার করেছে মোহনলাল তবে এখানে তার খুবই সুনাম। মোহনলালের সেই বনানী এখন এলাকার পরিচিতা তার আসল নামটাই ভুলে গেছে অনেকে। বৌদি বলেই সে বেশি পরিচিত। এবার কার্তিকই বলে,

—মোহনবাবুর এতদিন চাকরি ছিল দেশসেবাও চলছিল। এবার মাস মাইনেও গেল।

—তা সত্যি!

কার্তিক বলে,

—ব্যবসাপত্র কিছু করুন। তার সঙ্গে দেশসেবাও চলবে, অনেকেই তো করে।

মোহনলাল ভাবছে কথাটা।

কার্তিকবাবু বুঝেছে টোপ গিলবে এবার। বৌদিও এতে রাজি।

কার্তিক বলে,

—আমার ওখানে এসো। কথা হবে।

সেইমত মোহনলালও এসেছে এই রাতে বাগানবাড়িতে। রতনও এসেছে। মোহনলাল চেনে রতনকে। মোহন অবশ্য ইদানীং শ্রমিক সংগঠন নিয়ে পড়েছে। সে ওই নিতাইবাবুর মতো এলাকার মানুষের মঙ্গলের কথা ভাবে না—সে সময় তার নেই। সে কারখানার শ্রমিকদের দাবিদাওয়া নিয়েই আন্দোলন করে। তার দৃষ্টিভঙ্গি স্বতন্ত্র এবং একটা ক্ষেত্রেই সীমিত। রতনের কাজের ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত আরও বিচিত্র। ইদানীং রতনও ওই অন্ধকারের পথে ভালোই আমদানি করছে। আর সেই কারণে কিছুটা বেপরোয়া ধরনের হয়ে উঠেছে।

কার্তিকবাবু বলে, এখন কারখানার সাহেবদের অবস্থা ভালো নয়। ওরাও মনে

মনে ভয় পেয়ে গেছে।

কার্তিকবাবুর সাহেবমহলে বেশি যাতায়াত। তাই সে এসব খবর সঠিক জানে। মোহনলাল বলে,

—ব্যাটাদের এবার এদেশ ছেড়ে যেতে না হয়।

কার্তিক বলে,

—ওরা চলেও যদি যায়। স্বাধীনতার পর নতুন সরকার হতেও সময় লাগবে। সেই সময়টায় একটা কর্তৃত্ব পরিবেশ গড়ে উঠবে। আর সেই মওকাতে আমরা যদি উপরে উঠতে পারি তাহলে আমাদেরই লাভ হবে।

মোহনলালও ভাবছে কথাটা। তারও মনে হয় তখন রাজনীতির খেলাটা ভালোই চলবে। তাদের হাতেই ক্ষমতা আসবে। তাই দলের মধ্যে তার বিশেষ ঠাঁই করে নিতেই হবে। রতন ভাবছে তার কথা। এই ডামাডোলের সময় যদি আরও বেশি রোজগার করা যায় সেই পথই বের করতে হবে। আর তখন ক্ষমতায় থাকবে নেতারাই। তাকে সেই ক্ষমতা পেতে হবে। কিন্তু রতন জানে একা অন্যদের বঞ্চিত করে এসব করতে গেলে বাধাই আসবে। তাই তারা তিনজন এখন একত্রিত হয়েই কাজ করতে চায়।

রতন বলে—তাহলে এখন থেকেই তার জন্য তৈরি হতে হবে। আর কাজ করতে গেলে লোকজন চাই। টাকারও দরকার। কার্তিকবাবু বলে,

—টাকার জন্য ভাবতে হবে না। লোকজন তোমার আমার দুজনারই আছে। তাদেরই দিয়ে আমি কোম্পানির কয়লা চুরি করাব আর তুমি ওই স্ল্যাগ ব্যাঙ্কের মাল পাচার করো। মোহনবাবু দেখবেন যাতে লেবাররা এ নিয়ে কোনো গোলমাল না করে। অবশ্য তার জন্য মোহনলালকে খরচা বাবদ টাকাও দিতে হবে মাসে মাসে।

রতন বলে,

—এসব ঠিক আছে। তবে এতে তো বেশি টাকা আসবে না। আরও টাকার দরকার। আর সে টাকার আসার পথও করতে হবে।

মোহনলাল এখন টাকার গন্ধ পেয়ে মনে মনে খুশিই হয়। সে বলে—কী ভাবে?

রতন জানায় তার প্ল্যানটা, অবশ্য অনেক ভেবেচিন্তেই রতন এটা বের করেছে। কারখানার তৈরি দামি দামি বড় লোহার বিম লোহার অন্যসব মাল ওয়াগন করে চারপাঁচ কিলোমিটার দূরে মেনলাইনের একটা স্টেশনে গিয়ে মিশেছে। প্রান্তরের মধ্যে ছোট নিরিবিলি স্টেশন। লোকালয়ও অনেক দূরে। ওখানের সাইডিং লাইনে মালভর্তি ওয়াগনগুলোকে রাখা হয়। পরে ওখানে রেল ইঞ্জিন এসে সাইডিং টেনে নিয়ে গিয়ে মালগাড়ির সঙ্গে জুড়ে দেয়। সেগুলো চলে যায় তাদের গন্তব্য স্থলে, এর জন্য দামি মাল বোঝাই রেকগুলো দুতিনদিন ওই নির্জন সাইডিং-এ পড়ে থাকে।

অবশ্য দুতিনজন সেন্ট্রি পাহারা দেয়। রতন নিজে গিয়ে সব খোঁজখবর নিয়েছে। দেখেছে পাহারার নামে তারা খৈনি খেয়ে ঘুমোয় প্ল্যাটফর্মে। দু-একজন মাঝে মাঝে একবার ঘুরে আসে। আবার রেকগুলো ওই প্রান্তরেই পড়ে থাকে। রতন বলে ট্রাক নিয়ে গিয়ে রাতারাতি ওই সব মাল পাচার করতে পারলে লাখটাকা আমদানি হবে।

এমন কাজ-এর আগে কেউ করেনি। তখন পুলিশ সম্বন্ধে এদের একটা ভীতিও ছিল। ব্রিটিশ পুলিশ অবশ্য তাদের হুকুমেই ইংরেজদের দিকটা বেশি করে দেখতো। কিন্তু অন্যক্ষেত্রেও কর্তব্য ঠিকমতো করতো। এমন চুরি-ডাকাতির ঘটনা তাই কমই ঘটতো। এই নতুন ধরনের কাজের কথা শুনে মোহনবাবু বলে,

—এ যে ডাকাতি হে! কোম্পানির মাল ডাকাতি করবে!

কার্তিকবাবু সেই কাজটা আগে থেকেই শুরু করেছে। তবে এমন ভাবে করেনি। আর কার্তিকবাবু জানে এসব মাল বাইরের মহাজনরা ভালো দামই দেবে। আমদানির পরিমাণও কম হবে না। তাই বলে কার্তিকবাবু—প্ল্যানটা তো দারুণ করেছো হে রতন! কিন্তু ঝুঁকিও কম নেই।

তাছাড়া এসব মাল রাতারাতি কোথায় পাচার করবে। কে নেবে এসব ব্যবস্থাও করতে হবে। তবে এসব লাইন ঠিকমতো করতে পারলে লাখ লাখ টাকা আমদানি হবে।

মোহনলাল বলে,

—কোম্পানির মাল এভাবে চুরি হলে কোম্পানির প্রচুর লোকসান হবে। লেবারদের ক্ষতি হতে পারে।

কার্তিকবাবু বলে,

—ওই লালমুখো ব্যাটারা নানা পথে কোম্পানির লাখ লাখ টাকা সরায় তা তো জানি হে। সেটা বন্ধ করতে পারলে লেবারদের কত লাভ হতো! তা তো পারনি। ওরা খাচ্ছে—আমরাও ডামাডোলের বাজারে কিছু খাব। তুমিও ভাগ পাবে। মোট কথা যা করার এই তিনজনেই করব চুপ করে কি ভাবছ মোহনলাল তার সামনে অনেক পাবার দিগন্ত যেন খুলে যাচ্ছে।

মোহনলালের মনে পড়ে তার ঘরে অধিষ্ঠিতা যৌবনবতী শ্যালিকার কথা। মেয়েটাও তাকে বারবার বলতো,

—নিজেদের ভবিষ্যতের কথা ভাব। ভাষণ দিলেই হবে না। উপরে উঠে শাসন করতে হবে।

সেই পথই সামনে দেখছে মোহনলাল।

মোহনলাল বলে,

—আমি এক শেঠজীকে জানি তার লোহার ঢালাই কারখানা আছে। সে মাল পেলে নগদ দামে কিনে নেবে,

রতন বলে,

—শালা আবার ব্যাপারটা ফাঁস করে আমাদের পথে বসাবে না তো। জানে চোরাই মাল, আধা দামে নিতে চাইবে চাপ দিয়ে। মোহনলাল বলে,

—না, না। তোমরাও যাবে। সেসব কথা পরিষ্কার করে নেবে।

তবে লোকটা বিশ্বাসী।

কার্তিক বলে,

—ওদিকের পুলিশ রেল পুলিশকেও সামলাতে হবে। মালকড়ি পেলে তারাও খুশি হবে। দেখি ওদিকের লাইনও করতে হবে। হয়ে যাবে হে।

এদিকে কার্তিকবাবু খানাপিনার আয়োজনের ত্রুটি করেননি। কার্তিকবাবু বলে,

—রতন, এখন সাহেবরা অন্য চিন্তায় ব্যস্ত। তুমি আরও বেশি করে স্ল্যাগ পাচার করো, বাজারে তো খুবই চাহিদা। ট্রাক আমিই দেব। এদিকে কয়লাও যাবে। আর নতুন কাজের জন্য ওই শেঠজী আর পুলিশকে সামলে নিয়ে ওর প্ল্যান প্রোগ্রাম করো। কি মোহনদা!

মোহনলাল এবার বদলে গেছে। সেও এবার সায় দেয়। সেই রাত ক্লাবের মাঠে বিশ্বাসঘাতকের সাহায্য নিয়ে মানসিংহ বাংলার কেদার রায়কে দখল করার প্ল্যান করছে, আর এদিকে কার্তিকের বাগানবাড়িতে বসে এখানের আগামী নেতা—সুযোগসন্ধানীর প্ল্যান হয়ে গেল তাদের লুণ্ঠনপর্বের সুষ্ঠুভাবে চালাবার জন্য। একটা অতীতের ঘটনা আর একটা ভবিষ্যতের। সেই ভবিষ্যতের পথ সন্ধানের ষড়যন্ত্র সূচনা হল আগামী দিনের অস্থিরতার সুযোগ নিতে।

এই খবর অবশ্য বাইরের কেউ জানলো না, এরা তিনজন ছাড়া।

পরদিন নাটকের সাফল্য নিয়ে শিয়ালডাঙার বাজার ক্লাবের কারখানায় ক্যান্টিনে আলোচনা শুরু হলো। উইলসন দারুণ করেছে আর বিজনের অভিনয়ও অনেকের মন ছুঁয়েছে।

ক্যান্টিনে বিজয় বলে,

—না হে বিজন তোমার ট্যালেন্ট আছে। লেখকও হয়েছো, কলকাতার কাগজে লিখছো। এদিকে অভিনয়ও দারুণ। তা এখানে কারখানায় মরতে পড়ে আছ কেন? কলকাতায় যাও ফিল্মে লেখো। অভিনয় করো। নাম ফাটবে।

বিজন হাসে, বলে—

—এই ভালো আছি বিজয়দা।

এর মধ্যে উইলসন সাহেবের চেম্বারেও ডাক পড়ে বিজনের। সেখানে বসে আছে মিঃ জনসন। আরও তিনচারজন লোক। সাহেবের চেম্বারে রাখা আছে একটা ঢোল ওটা কলকাতা থেকে আজই আনিয়েছে। কারণ দলের ঢোলটা ঠিক বাজছে না।

জনসন বলে,

—কনগ্রাচুলেশন বিজন! ওয়েলডান।

—ধন্যবাদ স্যার।

উইলসন বলে,

—বিজন! এরা কালীপুর কোলিয়ারি থেকে এসেছেন। সামনের রবিবার ওদের ওখানে আসর। কেদার রায় করতে হবে। গেট রেডি কাল দু একজায়গায় তোমার ভুল হয়েছিল আজ রিহার্সালে এসো—ঠিক করে নিতে হবে। সকলেই আসবে।

বিজন বলে,

—ঠিক আছে স্যার।

নমস্কার করে এসে আবার ক্রেনের চেম্বারে ঢোকে আর সেটা তৈরি।

বিজন এখানের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। মেসের জীবনে কিছুটা অবকাশ পায়। তাই লেখাপড়ার কাজটাও চালাতে পারে ঠিকমতো, লাইব্রেরিতে এখানে

পুরোনো বইও রয়েছে, তাই পড়াশুনার কাজও চলে। তাছাড়া নিতাইবাবু ব্যক্তিগত সংগ্রহেও বই কম নেই সেখানেও যায়। এখন সে কলকাতার আরও দু একটা পত্রপত্রিকাতে লিখছে। একটা উপন্যাসও জমা দিয়েছে বিজন। তার দেখা জীবন সেই গ্রামীণ পরিবেশও এখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে বদলেছে। সমাজের রূপ বদলের আভাসও ধরা পড়েছে তার সাহিত্যে। সেই সঙ্গে বদলেছে মানুষ তার আদর্শও আজ বদলে যাচ্ছে পরিবেশ পরিস্থিতির চাপে। এক্ষেত্রে সে অসহায় দর্শক মাত্র। তার করার কিছুই নাই। শুধু অনেক কিছু হারানোর বেদনাটাই তাকে ব্যথিত করে মাত্র। কিন্তু কিছুই ধরে রাখতে পারে না। হারিয়ে যায়।

বিজন মাঝে মাঝে অবিনাশকাকার বাড়িতেও যায়। অবিনাশকাকা রিটায়ার করে ওদিকের বাজারে একটা স্টেশনারি দোকান দিয়েছে। জীবন এবার মাধ্যমিক দেবে। তবে পরীক্ষা নিয়ে ওর কোনো মাথাব্যথা নেই। অবিনাশকাকাও আর দেশে ফিরতে পারেনি। কারণ এখানের জীবনে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। গ্রামেও ভাগাভাগির পর যে সামান্য জমি পেয়েছে তা দিয়ে দিন চলবে না। সেখানে রোজগারের আশাও নেই। তাই এখানেই রিটায়ার করার পর দেশের সামান্য জমি বিক্রি করে সেই টাকায় ওদিকে একটা ছোট বাড়ি করে দোকান দিয়েছে।

অবশ্য কুসুমের বিয়েটা দিয়ে দিয়েছে এখানেই। কুসুমের স্বামী নন্দলাল কারখানাতেই কাজ করে। কোয়ার্টারও রয়েছে। কুসুম সেখানে—তবু দেখাসাক্ষাৎ হয়। অবিনাশকাকাকে দেখে দুঃখ হয়। মানুষটা যেন তার নিজের মাটি থেকে উৎখাত হয়ে গেছে। বিজন এখনও বাড়ি যায়। দেখে—ওদিকে অবিনাশকাকার মাটির বাড়িটা ছাউনির অভাবে খসে পড়ছে। উঠানে গজিয়েছে আগাছা। আজ সেখানে কেউ নেই।

অবিনাশকাকাকে দেখে তার মনে হয় তিনিও অমন একটা ধ্বংসস্তূপেই পরিণত হয়েছেন।

জীবনটা ঠিকমতো পড়াশোনা করলে এতদিনে কবেই মাধ্যমিক পাস করে যেত। জীবন পাস করতে পারলে, অবিনাশবাবু চাকরিতে থাকাকালীন সাহেবদের ধরে করে কোনোমতে ওকে চাকরিতে ঢোকাতে পারতেন। রিটায়ার করার পর অফিসে তার কোনো মূল্যই থাকে না।

সুতরাং জীবনের চাকরিও আর হবে না। সেটা অবশ্য জীবনও জানে। কিন্তু তার এসব নিয়ে কোন মাথাব্যথা নেই। এর মধ্যে সে রতনদার দলে ভিড়ে ওদের ভোটের সময় দিনরাত জিপে করে ঘোরে, মিটিং মিছিলে শান্তি বজায় রাখার কাজ করে। অবিনাশবাবু বলে বিজনকে,

—ভেবেছিলাম জীবনটা পাশে দাঁড়াবে। কিন্তু ওটা হল কিনা বখাটে, অপদার্থ।

বিজন বলে,

—না—না, জীবন দেখবেন এবার ঠিক পাস করবেই।

অবিনাশবাবু বলেন,

—বিয়ে ফুরিয়ে বাজনা। কিস্তি ফুরিয়ে খাজনা। কী হবে এখন পাস করে। চাকরির যা হাল। দোকানে বসতে বলি—তাও বসবে না। কমলা এখন ওই নতুন

বাড়িতে এসেছে। এখানে বাবুপাড়ার পরিবেশ নেই। পাশাপাশি অনেক নতুন পরিবার এসেছে তাদেরই মতো। আর এদিকের পুরোনো বাসিন্দারাও রয়েছে। কমলা এখন অফিসবাবু না হয় কাজের মেয়ের সঙ্গেই কারণে অকারণে গলা তুলে ঝগড়া করে। কমলা বলে অবিনাশবাবুকে।

—তোমার মুরোদ বোঝা গেছে। জীবনের চাকরিও করে দিতে পারলে না।

অবিনাশবাবুও মাঝে মাঝে ধৈর্য হারায়। ওই মহিলাকে নিয়ে সারা জীবন জ্বলে পুড়ে মরেছে। অবিনাশবাবু বলেন,

—তোমার ছেলে কি লেবারের চাকরি করবে? এদিকে পড়াশোনা করবে না কে দেবে চাকরি?

কমলা বলে,

—ও ব্যবসা করবে। ওকে ব্যবসার জন্য টাকা দাও।

অবিনাশ বলে,

—দোকানে বসে ব্যবসা দেখতে বলো। এটা দেখাশোনা করলে তবু একটা কাজ হবে।

জীবন চায় রাতারাতি বড়লোক হবে, বেশি পরিশ্রম করতে সে নারাজ। তেমন ধৈর্য তার নেই। সে দেখেছে এখানের নতুন গজিয়ে ওঠা কনট্রাকটর, কয়লার ব্যবসায়ী, সাপ্লায়ার নামক নতুন একশ্রেণীকে—এদের হাতে অনেক পয়সা আসে নানা পথে। এদের ছেলেদের দেখে দামি মোটবাইক হাঁকাতে। দামি পোশাক পরে, আরামে আয়েসে থাকে।

বাবার ওই একফালি মনোহারী দোকানে বসে টুকটাক বিক্রি করে তেমন মোটা টাকা কোনোদিনই আসবে না। তাই বাবার কথায় জীবন বলে—ওই দোকানে কী এমন আয় হয়?

অবিনাশবাবু বলে,

—এখন কম হয়, তবে ব্যবসা বাড়াতে পারলে ভালো স্টক রাখতে পারলে কোনো কোম্পানির এজেন্সি নিতে পারলে রোজগার ভালোই হবে। গোবিন্দবাবু তো এই করেই পয়সা করেছে। ওর ছেলেরাও ব্যবসা দেখছে।

গোবিন্দবাবুকে চেনে জীবন, ওর ছেলেদেরও। গোবিন্দবাবু একটা খাটো ধুতি পরে ফতুয়া গায়ে জীবন কাটিয়ে দিল। ছেলে দুটোও হয়েছে তেমন। ওরা দোকানে বসে কখনও গুদামে কাপড় গুটিয়ে কাজ করে।

আরাম আয়েস কি তা জানে না। পয়সা থেকেও ওরা থাকে হতদরিদ্রের মতো, জীবন বলে,

—ওর নাম বড়লোক, দোকান করলে জিন্দগীই বরবাদ হয়ে যাবে। তাই অন্য ব্যবস্থা করব।

কমলা বলে,

—তাই ওকে টাকা দাও। একটা মাত্র ছেলে চাইছে দেবে না?

অবিনাশবাবু ছেলেকে চেনে, আর এখন ভয় হয় যে ওই ছেলে তাদের জন্য ভাবে না। ওকে দেবার মতো টাকাও নেই। যা আছে তা ভবিষ্যতের জন্য ব্যাঙ্কেই

রাখতে হবে।

তাই অবিনাশ বলে,

—আগে পাস কর। তারপর ওসব কথা ভাবা যাবে—

জীবন বিরক্ত হয়ে চলে যায়। তারপর শুরু হয় কমলার বাক্যপ্রবাহ, ঝরনার জলের মতো অনর্গল বয়ে চলে—কখনও তোড়ে কখনও ধীরে। অবিনাশবাবুও বের হয়ে যায় দোকানে।

বিজনও দেখে ব্যাপারটা। কাকিমা এখনও তাকে ঠেস দিয়ে কথা বলতে ছাড়ে না। তবে বিজন এসব নিয়ে তেমন কিছু মনে করে না। তবে তারও ভয় হয় আগামী দিনের এমনি নিম্নবিত্তদের জন্য। সেও তো এই দলে। তার ভবিষ্যৎও অন্ধকারে ঢাকা।

জীবন এখন পড়াশোনার দিকে তেমন আগ্রহ দেখায় না। খেলাধুলা নিয়েই ব্যস্ত। রতনবাবুর পাড়ার টিমের স্টপার।

রতন ওদিকে তার এলাকার ছেলেদেরকে হাতে রাখার জন্য কোম্পানির খানিকটা জায়গা দখল করে ক্লাব করেছে। ওদিকে এখনও বেশ কিছু মাঠ প্রান্তর শূন্যই পড়ে আছে। এসব কোম্পানির এলাকা। ওদিকে বেশ কিছু ফ্ল্যাটবাড়ির মত বিল্ডিং করে সেখানে কর্মচারীদের এক একটা ফ্ল্যাট দিয়েছে। এছাড়াও বিশাল এলাকা পড়ে আছে। তারপরই শিয়ালডাঙা গ্রাম—ওদিকে কিছু ধানজমি সবজির খেতও রয়েছে গ্রামের মানুষদের। ওদিকে পাহাড় বনের শুরু হয়েছে। সীমানার পাশে গা থেকেই।

কোম্পানির ঠিকেদার কার্তিকদা। সেই কার্তিকবাবুকে ধরে রতন ক্লাবঘরও বানিয়েছে আর পাশেই তাদের খেলার মাঠও গড়ে উঠেছে। যে কোনো কারণেই হোক কর্তৃপক্ষ এসব নিয়ে উচ্চবাক্য করেনি। টাউন প্ল্যানিং বিভাগ থেকে ইন্‌সপেকটার এসে অবশ্য প্রথমে বাধা দিতে গেছল। রতনই কিছু পয়সা দিয়ে বলে,

—কার্তিকবাবু মরিস সাহেবকে বলে রেখেছেন আপনি এ নিয়ে ভাববেন না।

সেই ক্লাবের নিয়মিত প্লেয়ার এই জীবন। ভোটেও খাটে রতন তাকে ভালবাসে। মাঝে মাঝে তার বিশেষ কাজও করতে হয় জীবনকে। কখনও আসানসোলে কোনো শেঠের কাছে কখনও ধানবাদে কোনো অফিসের কোনো বড়বাবুর কাছে না হয় কোনো হোটেলে কোনো পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের কাছে গিয়ে চিঠিপত্র দিতে হয়। তারাও কি সব কাগজপত্র দেয়। সেসব এনে রতনদাকে দিতে রতনদা তাকেও দু পাঁচশো টাকা বের করে দিয়ে বলে,

—এটা তোর।

জীবন এইভাবে ভালোই রোজকার করে। আর মনে মনে ভাবে রতনদার মত সেও একদিন রোজগার করবে অনেকটাকা। আর তাকে রতনদার রোজগারের পথটাও দেখতে হবে।

এর মধ্যে জীবন রতনদার রোজগারের কিছুটা পথের সন্ধান পেয়েছে। সেদিন সন্ধ্যা থেকেই বৃষ্টি নেমেছে। ঠাণ্ডাও পড়েছে বেশ। একেবারে হাড়কাঁপানো শীত।

রতনের শরীরটা ভালো নেই। দুদিন থেকে জ্বর, অথচ এমন বৃষ্টির রাতে তাদের ওই স্ল্যাগ ব্যাঙ্ক থেকে আজ চার ট্রাক মাল পাচার করতে হবে। কদিন ধরে লোকজন ওই পাহাড় বনের দিকে স্ল্যাগ ব্যাঙ্কে শাবল গাইতি ছেনি দিয়ে কঠিন স্ল্যাগের স্তূপ কেটে প্রচুর মাল সংগ্রহ করেছে।

ব্লাস্ট ফার্নেসের বুকে গলিত লোহার বাতিল মাল ওইগুলো। ওগুলোর মধ্যেও প্রচুর লোহা থাকে। সেগুলোকে বহুদিন ধরে ওই বিস্তীর্ণ নির্জন এলাকার ফেলা হয়েছে আর সেগুলো পাহাড়ের মতো স্তূপ হয়ে পাহাড়ে পরিণত হয়েছে।

উপরটা বাতাসের সংস্পর্শে লোহার মত কঠিন কিছুটা কেটে সুড়ঙ্গের মতো করে ঢুকলে ভিতরে তখন অপেক্ষাকৃত নরম টুকরো মাল মেলে ছোটবড়। ওরা বাইরের দিক থেকে কম মাল তোলে। সুড়ঙ্গ করে ওই পাহাড়ের নীচে ঢোকে আর ভিতর থেকে মাল বের করে। স্ল্যাগের পাহাড়ের অতল থেকে ওরা কোনো অতীতের সম্পদ আহরণ করে আনছে। বাইরে থেকে কেউ টেরও পাবে না যে ভিতরে এইসব চলছে।

আজ সেই মাল নিয়ে যাবে মহাজনের লোক। কিন্তু রতন বেরোতে পারছে না। না গেলে টাকাও ঠিক আসবে না। তাই রতন এবার জীবনকে বলে,

—একটা কাজ করতে হবে তোকে। এসব কাজের কথা বাইরে কাউকে বলবি না।

জীবন তার বিশ্বস্ত সহচর। জীবন বলে,

—না—না।

রতন বলে,

—আজ রাতে দশটায় তুই মোটর বাইক নিয়ে ন্যাপাকে সঙ্গে নিয়ে যাবি। তেঘরিয়ার মোড় থেকে বাঁহাতে ওই জঙ্গলের মধ্যকার পথ দিয়ে ওই ঝর্নার ধারে—অশ্বত্থগাছ আছে সেখানে গিয়ে দেখবি তিনচারখানা ট্রাকে মাল উঠছে। তুই ওখানে অপেক্ষা করবি একজন জিপ নিয়ে আসবে। তাকে এই চিঠি দিলে সে তোকে টাকা দিয়ে ট্রাক নিয়ে চলে যাবে। তুই এসে টাকাটা ওই রাতেই আমাকে দিয়ে যাবি। পারবি তো?

জীবন এমনিতে বেপরোয়া, মোটর বাইক চালাতেও তাকে শিখিয়েছে রতনদা। জীবন বলে,

—হ্যাঁ—হ্যাঁ, মাল না পেলে ট্রাকও ছাড়ব না।

রতন খুশি হয় ওর এলেম দেখে। বলে,

—হ্যাঁ। পঁচিশ হাজার টাকা দেবে। দেখে নিবি।

জীবন এমনি কাজই পছন্দ করে। এর মধ্যে সে হিরোর মতই সাজপোশাক করেছে। প্যান্ট সার্ট জ্যাকেট মাথায় টুপি পরে ওই বৃষ্টির মধ্যে হিমরাতে চলেছে মোটর বাইক নিয়ে। যেন কোনো অ্যাডভেঞ্চারে চলেছে। বড় রাস্তা ছেড়ে ছোট মোরাম ঢালা পথে পড়েছে। হেডলাইটে বনভূমি কেমন যেন রহস্যাবৃত হয়ে উঠেছে। ওই অশ্বত্থ গাছের নীচে চারটে ট্রাকে বোঝাই করা হয়েছে ওই স্ল্যাগের টুকরো। মাল বোঝাই চারটে ট্রাকও তৈরি। ওদের মধ্যে একজন ড্রাইভার জীবনের

চেনা। সেও বলে,

—বস এল না জীবন?

জীবন বলে,

—রতনদার শরীর খারাপ। আমাকে পাঠিয়েছে।

এমন সময় জিপটাও এসে পড়ে। সিট থেকে একজন লোক নামে। এদিক ওদিক চেয়ে যেন সে রতনেরই সন্ধান করছে। ড্রাইভার চেনে তাকে। সেই বলে,

—সাহুজী বস আজ আসতে পারেনি। একে পাঠিয়েছে।

জীবনকে দেখছে সাহুজী। চোখ দুটো ওর যেন কোটর থেকে জ্বলছে। জীবন ওকে চিঠিখানা দিতে টর্চের আলোয় সেটা দেখে সাহুজী বলে জীবনকে—

—পঁচিশ হাজারই আছে। দেখে লাও।

জীবন দেখে নেয় টাকাটা। সাহুজী বলে,

—হুঁশিয়ারি সে চলো ভাই।

সাহুজী টর্চ জ্বেলে ট্রাকের মালপত্র দেখে বলে,

—আরে এতনা কমতি লোডিং কাহে?

ড্রাইভার বলে—আউর লোড হোনেসে গাড়ি নেহি যায়গী সাহুজী। ইয়ে তো স্রেফ লোহা হ্যায় লোহা। কিতনা ওজন জানতে হে। সাহুজী ট্রাকগুলোকে নিয়ে চলে গেল।

রাত হয়েছে বৃষ্টির রিমঝিম সুর চলেছে দূরে দেখা যায়। কারখানার আলো। বাতাসে ভেসে আসে ব্লাস্ট ফার্নেসের ক্রুদ্ধ গর্জন। রকমারি মেসিনের শব্দ।

যুদ্ধের জন্য আলো কিছু কমানো হয়েছে। তবু ব্লাস্ট ফার্নেসের থেকে লোহা স্ল্যাগ বের করার সময় রাতের বিস্তীর্ণ আকাশ লাল আভায় ভরে ওঠে, তখনও জীবন ফেরেনি, রতন ভাবনায় পড়ে। কে জানে কোনো গোলমাল হল কি না। কারণ পুলিশও এর মধ্যে টের পেয়েছে তাদের এই কাজের। অবশ্য তাদের দুচারজনকে প্রণামী দিচ্ছে তবু তাদের বিশ্বাস নেই। না হয় শেঠজীই হয়তো আসেনি। তাহলে বিপদ হবে। টাকাও মিলবে না—ট্রাকও ছেড়ে দিতে হবে। মাল তোলার মজুরিও জলে যাবে। এমন সময় জীবন ফেরে।

—এসেছিস!

জীবন ব্যাগটা দিয়ে বলে,

—পঁচিশ হাজারই আছে। দেখে নাও।

রতন টাকাটা দেখে তার থেকে পাঁচখানা নোটই ওর হাতে দিয়ে বলে,

—এটা।

জীবন খুশি হয়ে বলে,

—তাহলে চলি দাদা।

অবিনাশবাবুর জ্বর চলেছে দুদিন ধরে। দোকানও বন্ধ রাখতে হয়েছে। বিজন সেদিন সন্ধ্যায় গিয়ে দেখে জ্বরটা বেড়েছে কত। কমলা বলে,

—ডাক্তারকে খবর দিতে হবে। জীবনও নেই।

অবিনাশ বলে,

—সে থেকেও না থাকা। আমাদের দেখার কেউ নেই। এমনি করেই ভুগতে হবে।

বিজন বলে—আমি ডাক্তার আনছি কাকাবাবু,

বিজন সেই রাতে ডাক্তার আনে। ওষুধপত্রও কিনে আনে রাতে। আর মেস থেকে খেয়ে রাতে এ বাড়িতেই আসে। বলে,

—আমি থাকছি আজ রাতে এখানে। ওষুধগুলো ঠিকমতো দিতে হবে। কমলা বলে,—তাই থাক বাবা। জীবনের কাল নাকি খেলা আছে। বললে ফিরতে দেরি হবে।

অবিনাশ বলে,

—কী খেলা খেলছে তোমার ছেলে কে জানে? এত রাত অবধি কি খেলা হয়?

কমলা চুপ করে থাকে। বিজন থেকে যায় রাতে, ছিপছিপ বৃষ্টি চলেছে। চারিদিক স্তব্ধ। বাতাসে ওঠে যন্ত্র দানবের গর্জন। হঠাৎ দরজায় কড়া নড়ে ওঠে।

বিজন চাইল। রাত তখন প্রায় তিনটে। জানলা দিয়ে পথের অল্প আলোয় দেখা যায় জীবনকে। জ্যাকেট পরা মূর্তিটা এগিয়ে আসে। বিজন দরজা খুলে দিতে জীবন ভিতরে ঢোকে। পায়ের জুতোয় লাল কাদা মাখা—ভিজে গেছে সে। বিজন বলে,

—কোথায় গেছলি এতরাতে?

জীবন বিজনদাকে এখানে দেখবে ভাবেনি। তাই অবাক হয়। তবে কোনো কথা না বলে ভিতরে চলে গেল। অবিনাশবাবুর ঘুম ভেঙে গেছে। জ্বরটা এখন কম। সে বলে,

—দ্যাখ কেমন জীবদের নিয়ে সংসার করছি। কখন ফেরে তার ঠিক নেই। কি করে তাও জানি না। সামনে পরীক্ষা হুঁসও নেই।

কমলা অবশ্য ছেলের পথ চেয়েই ছিল। এতরাত্রে উঠে সে খাবারে দিতে যাবে। জীবন বলে,

—খেয়ে এসেছি, এখন শুতে দাও তো, যা ধকল গেছে।

শুয়ে পড়ে জীবন।

সময় থেমে থাকে না। সে তার নিজের গতিতে এগিয়ে চলে ইতিহাসের এক একটি অধ্যায় রচনা করে এই মহাকালের বুক চিরে জাতির ইতিহাস। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হয়েছে কোনোমতে ক্ষতবিক্ষত দেহ নিয়ে আমেরিকার লেজুড় হয়ে এতদিনের বিজয়ী ইংরেজরা কোনো মতে মানপ্রাণ বাঁচিয়েছে। কিন্তু তাদের পায়ের তলায় মাটি সরে গেছে। ভারতের বুকে—এই মহাযুদ্ধ একটি স্বপ্ন গড়ে তুলেছে আর সেই স্বপ্ন সত্যিই হতে চলেছে। এতদিন ধরে ভারতবাসীকে ইংরেজ জানিয়ে এসেছিল তোমরা ভীরু কাপুরুষ দেশের জন্য লড়বার শক্তি সামর্থ তোমাদের নেই। আমরা আছি তাই তোমরা আছ।

কিন্তু এই মহাযুদ্ধে ভারতীয় সেনারাই এবার বিদ্রোহ করে আজাদ হিন্দ ফৌজ

গড়ে ভারতের মাটিতেই প্রবেশ করেছিল। নেহাত এই সময় আমেরিকা অ্যাটম বোমা ফেলল জাপানে, যুদ্ধ তখনকার মত বন্ধ হলো। না হলে ভারতীয়রা যদি এ খবর জানতে পারত তাহলে ইংরেজদেরই কবর দিত তারা এখানে।

সে হয়নি। ব্যাপারটা ততদূর গড়ানোর আগেই যুদ্ধ থেমে গেল। তবে ভারতীয়রা খবরটা জানার পর থেকেই ব্রিটিশও বুঝতে পারে তাদের দিন ফুরিয়ে এসেছে। তাই এবার তারা ভারতের মধ্যেই চরম অশান্তি দাঙ্গার সৃষ্টি করে দিল হিন্দু আর মুসলমানদের মধ্যে। আর এই ব্যাপারটাকে ইংরেজ কৌশলে এতদূর নিয়ে গেল যে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক নষ্ট করে দিয়ে ভারতকে দু টুকরো করে দিল।

ইংরেজ ভারত ছাড়তে বাধ্য হলো। কিন্তু যাবার আগে ভারতবর্ষকে খণ্ডবিখণ্ড করে দিল। স্বাধীনতা এল অখণ্ড ভারতে নয় খণ্ডিত ভারতে। এতকাল ধরে ভারতীয়রা দুই সম্প্রদায় এক হয়েই স্বাধীনতার জন্য লড়েছিল। সেখানে কোনো বিভেদ ছিল না। তারা জানতেন আগে ভারতবর্ষ পরে ধর্ম।

কিন্তু ইংরেজ এই ঘায়েতেই আঘাত হেনেছিল আর কিছু স্বার্থপর নেতা নিজেদের হাতে স্বাধীনতার নামে কর্তৃত্ব পাবার জন্য এই ভারতবর্ষকে খণ্ড-বিখণ্ড করতে বাধা দিল না। গান্ধীজী এটা চাননি—অনেকেই চাননি; কিন্তু তাদের কথাও শোনা হল না।

স্বাধীনতা এল ভারতের বুকে এই ভাবেই। বিদায় নিল ইংরেজ ভারতের বুকে চির অশান্তির আগুন জ্বেলে রেখে। সারা দেশের জনসাধারণ এই স্বাধীনতাকে তবু বরণ করে নিল। শুরু হল স্বাধীনতার উৎসব। স্বাধীনতার উৎসব শিয়ালডাঙাতেও অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এবার নিতাইবাবুও তার দলবল নিয়ে প্রভাতফেরি বের করেন। সারা কারখানা শহর পরিক্রমা করছে ওই দল। স্কুলের ছেলেমেয়েরাও শামিল হয়েছে শোভাযাত্রায়। আজ ওরা ভারতের জাতীয় পতাকা তুলেছে।

ছেলেমেয়ের দলও গান গাইছে।

—"বল বল বল সবে; শতবীণা বেণু রবে,
ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।

উইলসনও যোগ দিয়েছে এই শোভাযাত্রায় তার নাটকের দল নিয়ে—আজ রাতে তার দলের নাটক হবে। 'সিরাজদৌল্লা', উইলসন নিজে করবে সিরাজ, বিজন করবে মোহনলাল।

কারখানা শহরের এই সাহেবদের বাংলো এলাকাতে এতদিন কোন মিছিল শোভাযাত্রা অলিখিত ভাবেই নিষিদ্ধ ছিল। ওসব যা হতো তা ওই ক্লাবের ধারে কাছে না হয় বাজার এলাকায়। এখানে ছিল আভিজাত্যের স্তব্ধতা। সাহেবরা তাদের এলাকাতে শান্তিতেই থাকত। মাঝে মাঝে ওদের পোষা বিদেশি কুকুরদের হাঁক-ডাকই শোনা যেত।

কিন্তু আজ নিতাইবাবুই বলে,

—শোভাযাত্রা ওই এলাকা ঘুরে বাজারে যাবে।

দু-একজন অবাক হয়। কে বলে,

—ওদিকে সাহেবরা থাকেন,

নিতাইবাবু বলেন,

—এবার আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি ওরা আর আমাদের মালিক নয়। ওদেরও জানাতে চাই, এখানে থাকতে গেলে এই স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দিয়েই থাকতে হবে। চলো—

নিতাইবাবুই শোভাযাত্রার আগে আগে লিড করতে থাকেন, সীমাও রয়েছে জেঠুমণির পাশে। স্কুলের মেয়েরা, বাবুপাড়ার অনেক মহিলা লোকজনও রয়েছে। ওরা আজ প্রথম এই এলাকাতে ঢুকলো অধিকারের দাবি নিয়ে।

উইলসনও রয়েছে এদের দলে।

সাহেব পাড়ার স্তব্ধতা এবার ওদের গানের সুরে ঢাকা পড়ে যায়। এই জনতা এতদিন সসঙ্কোচে আসত এদিকে। আজ ওরা চলেছে বিজয়ীর মত, ওদের গানটা আরও জোরে শোনা যায়। কেউ চিৎকার করে,

—বন্দেমাতরম্।

ওই ডাকটাকে লালমুখো সাহেবরা এতদিন সহ্য করেনি। ওই জয়ধ্বনি দেওয়ার জন্য তারা মিছিলের উপর লাঠিগুলিও চালিয়েছে। জেলে পুরেছে বহু তরুণ-তরুণীকে। মিঃ হাভার্ড—ওদিকে মিঃ মরিস—রিচার্ডরা বাংলোতে চা পান করছিল। তারাও জানে ভারতবর্ষ কাল মাঝরাত থেকে স্বাধীনতা পেয়েছে। তারাও চিন্তায় রয়েছে, এতদিন ধরে যে ভাবে ধমক দিয়ে, জোর করে শাসন করেছে সেই দিন শেষও হয়েছে।

ওই বন্দেমাতরম্ ধ্বনি আর গানের সুর শুনে চমকে ওঠে ওরা। তাদের এলাকাতে এইভাবে বিশাল শোভাযাত্রা ওইসব ধ্বনি দিয়ে ঢুকছে।

মিঃ মরিস বলে,

—হোয়াট ইজ দিস মিঃ হাভার্ড। পুলিশকে ফোন করো। এখানে হল্লাবাজি চলবে না। লাঠি চার্জ করে মিছিল ভেঙে দিক। অ্যারেস্ট করুক ওদের।

মিঃ হাভার্ড বলে,

—মরিস। আজ থেকে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে। এই অধিকার ওরা পেয়েছে। পুলিশও ওদের কিছু করবে না।

মিঃ রিচার্ড বলে,

—এই ভাবে আমাদের এলাকায় ঢুকে ওই বন্দেমাতরম্ বলে আমাদের শাসাবে? গোলমাল করবে?

পুলিশকে ফোন করতে হয় না। দেখা যায় পুলিশের দুজন অফিসার পুলিশ নিয়ে মিছিলের পিছনে চলেছে ওদের প্রহরা দিয়ে।

হাভার্ড বলে,

—দেখেছ মরিস। পুলিশ এখন ওদের পিছনে চলেছে। শান্তিভঙ্গও করেনি ওরা। এই পথ দিয়ে যাবার অধিকার আজ ওরা পেয়েছে।

মরিস গর্জন করে।

—দেখেছ ওই ব্যাটা উইলসনকে। ওটাও গান গাইছে ওদের সঙ্গে। ওটা একটা

ট্রেটর।

উইলসন ওদের মন্তব্যর জন্য ভাবিত নয়। সে ছেলেবেলা থেকে এদেশে এখানের মজুরদের সঙ্গে বড় হয়েছে। তারই দেশ, তাই আজ স্বাধীনতা উৎসবে সেও যোগ দিয়েছে।

মরিস গর্জন করে,

—এই নেটিভরা আবার স্বাধীন হবে। দেখবে জানান্নমে যাবে ওরা।

জনসনও এসেছে। শোভাযাত্রাটা সেও দেখেছে, শান্তিপূর্ণ ভাবে তারা চলে গেল, গানের রেশটা তখনও বাতাসে ভাসে।

জনসন বলে,

—ওরাও তো মানুষ। স্বাধীনতা ওদের জন্মগত অধিকার। এতদিন আমরা সেটা দিইনি। ওরা তো ছিনিয়ে নিয়েছে, এরপর ওরা কী করবে ওটা তাদের ব্যাপার তবে এরপর এখানে থাকতে হলে ওদের মর্যাদা দিয়েই চলতে হবে মিঃ মরিস, দিন বদলেছে। ওরা ওদের অধিকার বুঝে নেবে।

—হাভার্ডও বলেন

—কারেক্ট। এবার আমাদের নিজেদের কথাই ভাবতে হবে।

হোমে এত পয়সা এই ঠাটবাট কেউ দেবে না। এখানে থাকতে হলে ওদের দয়াতেই থাকতে হবে।

মিঃ মরিস অবশ্য এখান থেকে লুটপাট করে প্রচুর টাকাও দেশে নিয়ে গেছে। অনেক জমি জায়গা কিনে সেখানে তার ছেলেকে দিয়ে চাষবাস করছে। একটা জুতোর কারখানাও খুলেছে। ওটা ওর জাত ব্যবসা।

সে বেশ গুছিয়েই নিয়েছে।

তাই মরিস বলে,

—ওদের কাছে মাথা নীচু করতে হবে? নেভার, দরকার হলে হোমে ফিরে যাব। এই নিগারদের দেশে আর নয়। এত বড় সাহস আজ বাংলোর সামনে দাঁড়িয়ে ওরা 'বন্দেমাতরম্' বলে ডান্স করে গেল।

মেমসাহেবরাও দেখেছে ব্যাপারটা। নোরাও ছিল তাদের সঙ্গে। বিলেতি মেমসাহেবরা অবশ্য নোরার মতো দিশি অ্যাংলোদের ঠিক স্বজাতীয় বলে ভাবতে পারে না। তবু নোরা ভাবে সে শ্বেতাঙ্গিনী ওদের সমাজে তাই ঘুরঘুর করে সেও স্বপ্ন দেখে কোনোদিন সে তার স্বপ্নের ইংল্যান্ডে যেতে পারবে। সেইটাই তার কাছে তীর্থস্থান। মিসেস রিচার্ড বলে নোরাকে।

—তোমার হাসবান্ড ওই লোকগুলোর সঙ্গেই বেশি মেলামেশা করে ওদের সঙ্গে স্বাধীনতা উৎসবে যোগ দিচ্ছে—খুশিতে গান গাইছে। তুমি গেলে না নোরা?

নোরাও উইলসনের ওদের সঙ্গে মেলামেশা করা, নাটক করা মোটেই পছন্দ করে না। উইলসন যাত্রার নাম শুনলে পাগল, যাত্রা শুনতে যাবেই। নোরা প্রতিবাদ করেও কিছু করতে পারেনি। আজ ওকে ওই স্বাধীনতা উৎসবে যোগ দিতে দেখে আরও চটে উঠেছে। অপমানও বোধ করে নোরা। সে বলে,

—ওই লোকটাকে মোটেই সহ্য করতে পারি না মিসেস রিচার্ড। ও আমার

প্রেস্টিজ ধুলোতে মিশিয়ে দিয়েছে, এক এক সময় মনে হয় ওকে ডাইভোর্স করব। ছেলেমেয়েদের জন্য পারি না। ওকে এবার এমন সহবৎ শেখাবো যে কখনও ভুলবে না।

ওই মানুষটার উপর, এদেশের উপর ঘৃণা জমে গেছে নোরার।

কদিন সারা দেশ স্বাধীনতার উৎসবেই মেতে রইল। রতনও এবার তার ক্লাবে খুব ঘটা করে স্বাধীনতা উৎসব করছে। রতন এখন কার্তিকবাবু আর মোহন- লালের সঙ্গে মিলিত ভাবে কাজকারবার শুরু করেছে। স্বাধীনতা উৎসবের রাতেও তার লোকজন কয়লা স্ল্যাগ-এর চালান ঠিক পাঠিয়েছে। রাতের অন্ধকারে।

এখন স্ল্যাগের কাজটা জীবনই কিছুটা দেখাশোনা করে। আসানসোলে মহাজনের কাছেও যায়। অর্ডার আনতে। ওর গুদামে কয়লা স্ল্যাগও পাঠানোর কাজের তদারক করে জীবন।

এদিকে স্বাধীনতা উৎসবের দিন রতন কলকাতা থেকে দুজনে তাবড় নেতাকে আর নগদ টাকা দিয়ে দুজন গাইয়েকে এনেছে। তাদের গান শোনার জন্য হাজার হাজার মানুষ ভিড় করে। রতন যে দেশকে কত ভালবাসে তা যেন সকলকে দেখাতে চায়।

অবশ্য গানের আগে সেই নেতারা আর নিতাইবাবু ও ভাষণ দেন। বিজনরাও আসে। বিজন দেখে জীবন এখানে রতনদার দলের মধ্যমণি হয়ে ভলেনটিয়ার বাহিনীকে নিয়ে ভিড় সামলাচ্ছে। জীবনও এখন একজন সাচ্চা দেশপ্রেমিক হয়ে উঠেছে।

সভায় এসেছে মোহনলাল, কার্তিকবাবুও। কার্তিকবাবু এতদিন ছিল সাহেবদের কাছের মানুষ। তাদেরই ভজনা করে এসেছে নানা ভাবে। অনেকেই বলে কার্তিকবাবুই নাকি ওই নিতাইবাবু যে বিপ্লবীদের আশ্রয় দেন এই খবরটা সাহেবদের দিত। আর তারাই পুলিশ দিয়ে নিতাইবাবুকে জেলে পুরেছিল, ওই কাজের জন্য।

কিন্তু সেই কার্তিকবাবুও আজ খদ্দরের পাঞ্জাবি পরে গলায় মালা পরে স্বাধীনতার অন্যতম উদ্যোগী সেজেছে। ভাষণও দিয়েছে উদাত্ত কণ্ঠে, দেশমাতৃকার সেবার জন্য সভায় আহ্বান জানিয়েছে। নিতাইবাবুও দেখেন ব্যাপারটা। বিজনও দেখে রাতারাতি ওদের এই রূপ বদলের খেলাটাকে।

মোহনলাল এতদিন শ্রমিকদের সঙ্গে কাজ করেছে। তাদের সুখ-দুঃখের সাথী ছিল। আর তাদের দাবিদাওয়া নিয়ে সাহেবদের সঙ্গে তর্কও করেছে। কিছু আদায় করেছে তাদের কাছ থেকে। এবার রিটায়ার করে রীতিমতো শ্রমিক কল্যাণ অফিস করে বসেছে। কয়েক হাজার শ্রমিকের কাছ থেকে মাসে কয়েক হাজার টাকা করে চাঁদা তুলেছে। সেই টাকার পরিমাণও কম নয়। প্রায় চার হাজার শ্রমিক আছে। কারখানার প্রায় সবাই মেম্বার। মাসে পাঁচটাকা করে চাঁদা কিছুই নয় তাদের কাছে। কিন্তু তার পরিমাণও অনেক।

মোহনলাল-এর সেই শ্যালিকা বনানী এখন তার স্ত্রীর পরিচয়েই রয়েছে এখানে,

আর বনানী লেখাপড়া জানে। হাওড়ায় থাকতে দু একবছর কলেজেও পড়েছিল। পড়াশোনা কী করত জানা যায়নি। তবে ছাত্র ইউনিয়নের একটা পদ সে দখল করেছিল তার ওই ভাষণের জন্য।

তারপর তার জীবনে এল মোহনলাল। ওরা চলে এল শহর ছেড়ে শিয়ালডাঙার কারখানায়। বনানীও দেখেছিল মোহনলালের কার্যকলাপ। লোকটাকে সবাই মানে গনে। আর মোহনলাল নিঃশর্ত ভাবেই শ্রমিকদের কল্যাণের কথা ভাবে। বনানীও ক্রমশ তার সঙ্গে শ্রমিক ধাওড়ায় যাতায়াত শুরু করে। মেয়েদের নিয়ে নাইট স্কুলও চালু করে সে। আর সেই স্কুলে সে খোদ বড় সাহেবের মিসেসকে আনে। কিছু টাকাও বের করে এই নাইট স্কুলের জন্য কারখানা থেকে।

ক্রমশ বনানীও জেনেছে তাকে এখানে পায়ের তলায় মাটি খুঁজে নিতে হবে। তার রূপযৌবনও আছে—সে জানে মোহনলালের সঙ্গে তার সম্পর্কটা চোখের কাজলের মতোই, এই আছে আবার চোখের জলে ধুয়ে যেতে বেশি সময় লাগবে না। সে জানে তাকে মোহনলালের ঘাড়ে বন্দুক রেখে দাগতে হবে। দাঁড়াতে হবে নিজের পায়ে ওই মোহনলালের উপর ভর করে।

বনানীও দেখেছে স্বাধীনতার পর একটা ছত্রভঙ্গ অবস্থাই আসবে। সে এখন শ্রমিক সংগঠনের অফিসে বসে।

হিসাবপত্র রাখে। শ্রমিকদের মেডিক্যাল ছুটি বোনাস বকেয়া পাওনার দরখাস্ত লেখে। তদ্বির তদারক করে। আবার মিটিং-মিছিলেও যায়। মহিলা সংগঠন গড়েছে। মহিলা কল্যাণের জন্যও নিজেই মরিস সাহেবের কাছে যায়। মিঃ মরিসও খুশি। বনানী বলে,

—মিঃ মরিস আমাদের দিকটা দ্যাখ!

মরিস বলে,

—লেডিজ ফার্স্ট। আজ সন্ধ্যায় এসো বাংলোতে তোমার কাগজপত্র নিয়ে। ওখানেই ডিনার করবে। আর তোমার সমিতির জন্য টাকাও পাবে।

বনানী চেনে মিঃ মরিসকে। তার উদগ্র যৌবনের রেখাগুলো এখনও সরব আর সেটাই যে বনানীর অন্যতম হাতিয়ার তা জানে বনানী। সে বলে,

—টাকা দেবে তো সমিতিকে। না এমনিই।

মরিস বলে,

—আমি কাজের জন্য দাম ঠিক ঠিকই দিই বনানী। কি দিইনি? অবশ্য বনানীকে সে সমিতির জন্য এখন টাকাও দিচ্ছে। বনানী বলে,

—এখন তো স্বাধীন গো আমরা। আমাদের পায়ের ধুলোই আমাদের মাথায় দিচ্ছ। নিজেরাও লুটছ।

মরিস হাসে। চালাক মেয়েটার নজর সব দিকেই আছে। ওদের লুঠতরাজ এখন বেড়েছে। মরিসরা বুঝেছে এবার আজ না হোক কাল তাদের এদেশ থেকে যেতে হবে। তাই সবার আগে যতটা পারে লুঠে নিতে চায় তারা। বনানী এবার মোহনলালকে বলে,

—এবার দেশের বিধায়ক, এম. পি. এসব হবে এখানের মানুষ, আর ইংরেজ

সরকার নয়, এখন স্বদেশি সরকারই দেশ শাসন করবে। এই বিধায়ক, এম. পি.-দের দিয়ে। তোমার তো এখানে অনেক চেনাজানা, তুমিই দাঁড়িয়ে পড়ো।

মোহনলাল নিজে তেমন লেখাপড়া জানে না। তবে হাতে-কলমে কাজ করেছে, শ্রমিক কল্যাণের জন্য। এলাকার চারিদিকে ছড়ানো অনেক ছোটবড় কারখানা। লোহা কারখানা, সার কারখানা, ফায়ার ক্লে-রে থেকেও এখানে নানা কিছু তৈরি হয়।

মোহনলাল অবাক হয়,

—কি বলছ বনানী, আমি হব এম. এল. এ.—

বনানী বলে,

—হ্যাঁ, তবে দ্যাখ আর কেউ যেন না দাঁড়িয়ে যায়। তুমি বরং কথাটা গিয়ে বলো, নিতাইবাবুকে। উনি যদি রাজি হন তাহলে সহজেই কাজটা হবে।

মোহনলাল স্বপ্ন দেখে সে দেশের নেতা হবে। কলকাতার তাবড় নেতাদের সঙ্গে তার জানা চেনা হবে। তাই বলে বনানীকে,

—তুইও চল। নিতাইবাবু তোকেও স্নেহ করেন। তুইও বললে কথাটার ওজন বাড়বে।

ওদিকে রতনও এখন অনেক পাবার স্বপ্ন দেখছে। দেশ স্বাধীন হয়েছে। নতুন সরকার দেশকে চালাবে। এবার এই সমাজে উঠতে পারলে রতনের হাল বদলে যাবে। ভোটের ব্যাপারটা রতন কিছুটা জানে। এর আগে পঞ্চায়েত ভোটে—এখনকার মিউনিসিপ্যালিটির ভোটে সে নিতাইবাবুর দলের হয়ে কাজ করেছে। ভোটারদের নামের তালিকা তার কাছে আছে। চেনেও সে অনেককে, তার দলবলের অভাব নেই। তাই সেও স্বপ্ন দেখে এবার এম. এল. এ. ভোটে সে দাঁড়াবে। কিন্তু দলের প্রার্থী নির্বাচিত করা হবে জেলার কর্তাদের নিয়েই। নিতাইবাবু ওই কমিটিতে রয়েছেন। রতন ওকেই ধরবে যদি তিনি এই অঞ্চলের নেতা হিসাবে তাকেই সুপরিচিত করেন।

বিজনও দেখছে এবার কারখানার পরিচালনাতে একটা ঢিলেঢালা ভাব এসেছে। এখন নিতাইবাবুও ব্যস্ত। কলকাতা যাতায়াত করতে হচ্ছে। সেখানে নেতাদের সঙ্গে আলোচনাও চলছে। দেশের নতুন পরিচালনার ভার নিতে হবে এবার দেশের মানুষদেরই।

এর মধ্যে দুটো উপন্যাস বের হয়েছে বিজনের। একটা উপন্যাস বাজারে বেশ নামও করেছে। এখানের কোলিয়ারি জীবন নিয়েই সেই উপন্যাস। এই অঞ্চলের আশেপাশে অনেক কোলিয়ারি রয়েছে। ইংরেজরা কোম্পানি করে এই অঞ্চলের জমিদারদের কাছ থেকে ওইসব কোলিয়ারী পরিচালনা ভার নিয়ে এখানের মাটির অতল থেকে কালো হিরে তুলেছে।

সেইসব কোলিয়ারীর গভীরতাও দেড় দুহাজার ফিট। সেই অতলের স্তর থেকে কয়লা তোলে ওরা। শ্রমিকদের নিরাপত্তার কোনো ব্যবস্থা নেই। মাটির অতলে যুগযুগান্ত ধরে জমে থাকে মারাত্মক মিথেন গ্যাস। কোলিয়ারির সুড়ঙ্গে সেই গ্যাসের

পরিমাণ হঠাৎ বেড়ে যায় তখন কয়লা কাটার গাঁইতির ঘায়ে সামান্য স্ফুলিঙ্গ থেকেই বিস্ফোরণ ঘটে। ধ্বসে পড়ে মাটির অতলের সেই সুড়ঙ্গ। শত শত কর্মরত কোলিয়ারি শ্রমিক সেই মাটির অতলে মারা যায়। ব্রিটিশ মালিকদের কোনো সাজাই হয় না।

আবার তারা ওদের সমাধির অতল থেকে কয়লা তুলতে থাকে ওই ভাবেই। কোলিয়ারি শ্রমিকদের দেখেছে বিজন—ওদের ধাওড়াতে গেছে। দেখেছে এমনি বহু অসহায় শ্রমিক পরিবারকে—যাদের প্রিয়জন ওইভাবে খাদের অতলে প্রাণ দিয়েছে।

তাদের জীবনচর্চা সুখ-দুঃখের কাহিনি ওই সর্বনাশ বিপদের কথাই নিয়ে সেই উপন্যাস। সেটা বাজারে বেশ সাড়া তুলেছে, ইংরেজ মালিকদের সেই অত্যাচার, শোষণের কথা নিয়েও আলোচনা শুরু হয়েছে।

উইলসন বাংলা পড়তে পারে। সে বাংলাও পড়েছিল স্কুলে। এখনও বাংলা নাটক-গল্প পড়ে। লাইব্রেরি থেকে বিজনের সেই উপন্যাসটা এনে পড়েছে। সেদিন ক্লাবে উইলসন বলে।

—বিজন তোমার উপন্যাসটা পড়লাম। দারুণ লিখেছো। ওই কোলিয়ারি মালকাটাদের জীবন—তাদের উপর মালিকদের বঞ্চনা—অন্যায় অত্যাচারের কথা। এই পরিবেশ সবকিছু একেবারে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

বিজন বলে,

—তুমি পড়েছ সাহেব?

উইলসন বলে,

—শুধু পড়েছিই না—দ্যাখ না ওটাকে যদি নাটক করতে পারো। একটা নতুন সাবজেক্ট হবে। লিভিং সাবজেক্ট।

সীমাও পড়েছে উপন্যাসটা, সীমা বিজনের অনেক লেখাই পড়েছে, শান্ত ছেলেটির মধ্যে যেন প্রতিবাদের একটা আগুন আছে। ওর দৃষ্টিভঙ্গিও স্বচ্ছ। সহজ কথায় সে জীবনের নানা সমস্যাকে দরদের সঙ্গে তুলে ধরতে পারে। সীমা বলে,

—তোমার ওই উপন্যাসটা পড়ে মনে হলো এতদিন এসব কথা কেন বলা হয়নি। জেঠুমণিও খুব প্রশংসা করছিলেন—এনিয়ে কাগজওয়ালারাও এবার কলম ধরেছে। তুমি একটা কঠিন সমস্যাকে তুলে ধরেছো বিজন।

বিজন দেখছে সীমাকে।

ওই শান্ত ভদ্র মেয়েটাকে সমীহ করে বিজন।

নিতাইবাবু কদিন পর ফিরেছেন কলকাতা থেকে। এখন তাকে যেন চিন্তিত দেখায়। বিজনকে দেখে বলেন নিতাইবাবু,

—তুমি এসেছ ভালোই হয়েছে, বসো।

নিতাইবাবু কী যেন ভাবছেন। বিজন বলে,

—কিছু বলবেন স্যার।

নিতাইবাবুর চমক ভাঙে। বিকেল নামছে। গাছে গাছে নতুন পাতার বাহার বিকেলের শেষরোদে তাদের রাঙিয়ে দিয়েছে।

নিতাইবাবু বলেন,

—স্বাধীনতা পাওয়ার চেয়ে তাকে মর্যাদার সাথে ধরে রাখা, স্বাধীন ভারতের মানুষের জন্য কল্যাণমূলক কাজ করা আরও কঠিন হে। কোন নীতিতে চলবো এটা খুঁজে পেতে হবে। একটা বিশাল দেশের গণতন্ত্র সার্বভৌমতা সম্মান বজায় রেখে তাকে নতুন করে গড়ে তোলা আরও কঠিন কাজ। এতদিন যা কিছু না হয়েছে তার জন্য দোষ দিয়েছি ইংরেজকে। এখন নিজেরাই হব দায়ী, দোষী।

নিতাইবাবু কথাটা নিয়ে অনেক ভাবছেন। এতদিন ধরে ভারতের ক্রান্তিকালই চলেছে। স্বাধীনতার আগে সকলের লক্ষ্য ছিল একটাই ইংরেজকে তাড়াতে হবে যে কোনো মূল্যে। তারই জন্য শুরু হয়েছিল অহিংস-সহিংস আন্দোলন। অন্তরের অন্তস্তলে একটা কামনাই প্রদীপ্ত ছিল।

এবার সেই শূন্য পূরণ হয়েছে। স্বাধীনতা এসেছে। এবার নিজেদের দেশকে শাসন করতে হবে নিজেদেরই। গড়তে হবে দেশকে, দেশের মানুষকে নতুন করে শিক্ষার আলো দিতে হবে। চাই চিকিৎসার ব্যবস্থা চাই অন্নবস্ত্রের জোগান কর্মসংস্থান। দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে। আর এ তো করতে হবে নিজেদেরই। তাই দেশকে পরিচালনার জন্য চাই যোগ্য প্রতিনিধিদের নির্বাচিত সরকার।

কিন্তু এবার নিতাইবাবু দেখেছেন এতদিন যে উদগ্র কামনাগুলো সাধারণের মনে সুপ্ত ছিল এবার সেগুলোও মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে।

অনেকেই এবার সরকারের মধুভাণ্ডের দিকে হাত বাড়াতে চায়। তার জন্য কোনো যোগ্যতা থাক বা না থাক। সেটাও ভাবতে চায় না তারা। চারিদিকে একটা নতুন শ্রেণী মাথা তুলেছে দেশের পরিচালনার মধ্যে ঢোকার জন্য। এখানেও তার ব্যতিক্রম নেই। এর মধ্যে নিতাইবাবুর কাছে এসেছে মোহনলাল। বনানীকে নিয়ে সে আজ জানিয়ে গেছে তাকেই যেন দাঁড় করানো হয় ভোটে।

নিতাইবাবু বলেন,

—এটা কমিটির ব্যাপার। বলব তাদের—

তারপর রতন এসে জানিয়ে গেছে,

—দাদা আপনি তো জানেন এখানের মানুষের জন্য কত কাজ করেছি এবার যদি ভোটে দাঁড়াতে পারি। এখানের মানুষের জন্য সত্যিকার কিছু কাজ করতে পারব।

নিতাইবাবু দেখছেন রতনকে। মাধ্যমিক পাসও করেনি, আর তার কাজের নমুনা যা দেখেছেন তাতেও তিনি খুশি নন।

মোহনলাল-কার্তিকবাবু-রতনদের ঘনিষ্ঠতার কথাও তিনি জানেন। এদের স্বরূপ দেখে তিনিও আতঙ্কিত। অথচ এরাই হাত বাড়াতে চায় আরও ক্ষমতার জন্য। এই মানুষদের হাতে যদি দেশের শাসনভার আসে কী হবে কে জানে, তাই তিনিও চিন্তিত।

তার মনে হয় আমরা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছি মুষ্টিমেয় লোক। দেশের সাধারণ মানুষকে দেশপ্রেমের আলোতে আলোকিত করতে পারিনি। তাদের

অধিকাংশ লোকই স্বার্থপর আত্মকেন্দ্রিক হয়ে গেছে। যাদের দ্বারা গণতন্ত্র বিপন্ন হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

বিজন শুনছে নিতাইবাবুর কথাগুলো। সীমা ও বিজন বলে,

—তাহলে স্বাধীন ভারতের ভবিষ্যৎ কী হবে?

নিতাইবাবু বলেন,

—তার বিচার করবে ভবিষ্যৎ, তবে স্বাধীনতা রক্ষার কাজ আরও কঠিন হে। আমরা ঠিকমতো তৈরি হতে পারিনি তাই ভয় হয়। তবু আশা করব ভাঙনের মধ্য দিয়েই নতুন করে গড়ার পথের সন্ধান ঠিকই মিলবে।

সেদিন রতন, মোহনলাল হতাশই হয়।

অবশ্য মোহনলাল খুশি যে রতন নমিনেশন পায়নি, আর রতন খুশি যে মোহনলাল নমিনেশন পায়নি। জেলার কমিটি চেয়েছিল নিতাইবাবু ভোটে দাঁড়ান। তাকে এলাকার মানুষ সম্মান করে, যোগ্য লোক তিনি। কিন্তু নিতাইবাবু এতদিন নিঃস্বার্থ ভাবেই রাজনীতি করেছেন। এই রাজনীতিকে পেশা করেননি। তার ধারণা হয়েছে এবার রাজনীতিকে পেশা করার জন্য অনেকে আসবে। উনি তাই রাজি হননি। শেষে জেলা কমিটি এখানের মহকুমার এক অধ্যাপককেই দাঁড় করিয়েছে, এম. এল. এ-র জন্য।

বসন্তবাবু দীর্ঘদিন কংগ্রেসের হয়ে কাজ করেছেন। গান্ধীবাদে বিশ্বাসী। সারা এলাকার মানুষও তাকে চেনে। এবার বসন্তবাবুকেই এরা ভোটে দাঁড় করিয়েছে। এই ভোটে দাঁড়ানো নিয়ে প্রথমে রতন একটু ক্ষুব্ধই হয়। কার্তিকবাবুও চেয়েছিল রতনই দাড়াক। তবুও এখানের লোক। কার্তিকবাবু তার ধাতপাত বোঝে। ছেলেটা গোঁয়ার, তবে কাজের ছেলে। কার্তিকবাবু তার উপর কিছুটা ভরসা করতে পারে। তার তুলনায় মোহনলালকে কার্তিক ঠিক ভরসা করতে পারে না। মোহনলাল শ্রমিক সংগঠনের জঙ্গি নেতা আর সে,বাইরে থেকে এখানে এসে জুড়ে বসেছে। কার্তিক মেয়েদের নিয়ে বেসাতি করে। রাতের অন্ধকারে তার বাগানবাড়িতে অনেক মেয়েকেই আনে, ভেট দেয়, সাহেবদের কাজ আদায়ের জন্য। সেই মেয়েদের সে চেনে।

মোহনলালের রক্ষিতা ওই বনানীকেও চেনে কার্তিক। সেও জানে মোহনলালের উপর বনানীর প্রভাব অনেক। আর মেয়েটা লেখাপড়া জানে। সেও এখন মহিলা শ্রমিকদের নিয়ে সংগঠন করছে। ওদের রাজনীতি থেকে রোজকারের খবরও জানে কার্তিক। তাই মোহনলালকে বনানীকে সে ভরসা করতে পারে না।

কার্তিক রতনকে বলে,

—রতনবাবু ভোটে এবার দাঁড়াতে পারনি। তাই বলি দল ছেড়ো না। নিতাইবাবুর ছত্রছায়াতেই থাকো। দেখবে আখেরে কাজ হবে। রতনও ভাবছে কথাটা। তার ব্যবসা-বাণিজ্য ভালোই চলছে আর সেটা চলছে তার কারণ অনেকেই জানে রতন নিতাইবাবুর লোক।

কার্তিক বলে,

—এক মাঘে শীত যায় না। আবার ভোট আসবে এখন থেকে তো খেলা শুরু হল। লেগে থাকো ঠিক গদি পাবে। তবে মোহনলালটাই না গড়বড় করে।

রতন বলে,

—ওকে তো এমনিই প্রণামী দিই। ও যদি আরও কিছু পেতে চায় তাহলে ওর ব্যবস্থা করে দেব।

কার্তিকবাবু বলে,

—ওসব করো না। এখন ওদের দলও এখানে কম নয়। ওরা তো শ্রমিক কৃষকদের নিয়েই আন্দোলন করতে চায়।

মাথা গরম করো না রতনবাবু,

রতনও ভাবছে কথাটা। এখন সে তার মনের সব তিক্ততা ঝেড়ে ফেলে নিতাইবাবুর দলের হয়েই কাজে নেমেছে। বসন্তবাবুকে নিয়ে সারা এলাকা ঘুরেছে।

ওদিকে মোহনলালও বসে নেই। বনানীই এখন শহরের মায় কলকাতার নেতাদের পরিচিত হয়ে উঠেছে। মোহনলালের কথাও নেতারা জানে। তারা কলকাতায় বসে শ্রমিক-কৃষক আন্দোলন করার জন্য দল গড়েছে। এই এলাকায় বহু ছোট বড় কলকারখানা কোলিয়ারি রয়েছে। শ্রমিক মালকাটাদের সংখ্যাও কম নয়। তারাও এখন থেকে এই এলাকাতে শ্রমিক কৃষকদের নিয়ে সংগঠনকে আরও জোরদার করে তুলতে চায়। তাই সেই দলও এবার এখানে প্রার্থী দেয়।

বনানীও ছিল সেই মিটিং-এ, মোহনলালও দেখেছে নিতাইবাবুর দল তাকে ভোটে নমিনেশন দেবে না। তাই এবার মোহনলাল উঠে পড়ে লেগেছে তার সংগঠনকে নিয়ে। শহরে এসেছে তার দলের নেতাদের কাছে এখন তাকে আরও কিছু পেতে হবে।

বনানীই বলে,

—মোহনবাবুই ওই এলাকায় আমাদের প্রার্থী হবেন, যদি আপনারা মত দেন।

শহরের নেতারাও রাজি হয়ে যায়। আর এবার মোহনলালও লেগে পড়ে ভোটের আসরে।

এতদিন শান্ত পরিবেশ ছিল শিয়ালডাঙায়, শ্রমিকরাও তাদের দাবির কথা নিয়ে আলোচনা করত সাহেব মালিকদের সঙ্গে। দু একটা মিটিং-মিছিল হতো কারখানা এলাকাতেই। আবার শান্তি নামতো। পরস্পরের মধ্যে ছিল সম্প্রীতির প্রকাশ। ক্লাবে চলতো নাটকের মহড়া, নাচগানের অনুষ্ঠান। না হলে বাকি দিন তাস ক্যারাম ফুটবলই চলতো, কারখানার জীবন ছকে বাঁধা।

এখানের গ্রামগুলোর মানুষদের অনেকে কারখানার কাজ করে। বাকি কিছু লোক ছোটখাটো দোকানদারি করে। কেউ জমিতে সামান্য চাষ-আবাদ করে দিন চালাতো।

এবার স্বাধীনতা আসার পর এই সব এলাকার কারখানার জীবনে আশপাশের গ্রাম জীবনেও একটা পরিবর্তন এলো।

মানুষ স্বাধীনতার ফসল এবার পেতে চায়। তাদের দাবিও অনেক।

ভোটের বাদ্যি বেজে উঠতে এবার সেই ঘুমন্ত গ্রাম, কারখানার কোলিয়ারির

শ্রমিকরাও যেন জাদু কাঠির ছোঁয়ায় জেগে ওঠে।

নিতাইবাবুও ব্যস্ত। ভেবেছিলেন তাদের দলই একা ভোটে নামবে। তাদের প্রতিপক্ষ কেউ থাকবে না। কিন্তু এবার মোহনলালই নতুন দলের হয়ে ভোটে নেমেছে। ভোটের মিটিংও করে মোহনলাল, বনানীও সেখানে ভাষণ দেয়। তাদের কাছে মুখ্য হয়ে শুধু মাত্র শ্রমিকদের চাহিদাই কিছু পাবার লোভ দেখালে সাধারণ মানুষ সেদিকেই যাবে। তাই তারা আওয়াজ তোলে শ্রমিককৃষকরাজ হলে শ্রমিকদের এত বেশি কাজ করতে হবে না। কম কাজ করে বেশি মাইনে বোনাস— সররকম সুবিধা পাবে।

—ভাইসব মালিকরা তোমাদের শোষণ করছে। তোমাদের ঘাম রক্ত ঝরানো পরিশ্রমের ফসল লুঠ করেছে তারাই। আমরা এই লুণ্ঠন বন্ধ করব।

হাততালি পড়ে চারিদিকে। মোহনলাল তখন শ্রমিকদের আরও অনেক কিছু পাইয়ে দেবার গল্প ফেঁদেছে। কোলিয়ারি এলাকাতে গিয়েও মোহনলাল বলে।

—মালকাটাদের এই ঝুঁকি নিয়ে কাজ করার জন্য তিনগুণ বেতন দিতে হবে আমরা ভোটে জিতলে তাই করে দেবো।

গ্রামে গিয়ে মোহনলাল ঘোষণা করে,

—আমাদের ভোট দিয়ে জেতাও। ভাইসব এতদিন মালিকের ক্ষেতে তোমরা কাজ করেছ। তোমাদের একভাগ দিয়ে মালিক নিচ্ছে তিনভাগ। এবার আমিও জিতলে আইন হবে। লাঙল যার জমি তার। গগনবিদারী হাততালি পড়ে।

অবশ্য মাটির কাছাকাছি এই মানুষগুলোর মানসিকতা এখনও আলাদা।

তারা বংশানুক্রমিকভাবে একই পরিবারের জমি চাষ করে এসেছে। মালিক চাষীর মধ্যে একটা অন্য সম্পর্ক রয়ে গেছে।

চাষীর সুখদুঃখের সঙ্গে জমির মালিকও জড়িত। ওরা দীর্ঘদিনের এই সম্পর্কটা ভাঙতে চায় নিজেদের স্বার্থে। কিন্তু অনেকেই শোনে ওদের কথা। কে একজন বলে,

—উ কে ব্যাটারে। আমদিকে এত পাইয়ে দিবার জন্য উ ক্যান চেঁচাচ্ছে!

অন্য একজন মাথা নাড়ে।

—শহরের ভোটবাবু বটে উর মতলব ভালো বুঝছি না।

বিজনও দেখছে সারাদেশের মধ্যে ভোটের এই কাণ্ডকারখানা। এর মধ্যে সে দু একবার কলকাতায় গেছে। তার বই এখন দু তিনজন প্রকাশক নিয়মিত ছাপছেন। অন্য পত্রপত্রিকাতেও যায় বিজন।

এর আগেও কলকাতা এসেছিল—তারপর দাঙ্গায় কেটেছে, এসেছে বিধস্ত রক্তস্রোতে কলকাতার বুকেও স্বাধীনতার দিন। কিন্তু বিজন দেখেছে এই স্বাধীনতার মূল্য দেবার জন্যই ওপার বাংলা থেকে লাখ লাখ মানুষ ছিন্নমূল হয়ে আসছে এদেশে। লাখ লাখ মানুষ সপরিবারে চলে আসছে এদেশে—আশ্রয় নেই আহার্য নেই। শিয়ালদহ প্ল্যাটফর্মে বাইরের মাঠে, কলকাতার এখানে ওখানে সর্বহারা জনতার ঢল নেমেছে।

সরকারও বিব্রত। এত লোকের পুনর্বাসন চাই। দূর মফস্বলের বিস্তীর্ণ

এলাকাতেও বড় বড় ট্রানসিট ক্যাম্প করে সেখানে তাঁবুতে আশ্রয় নিয়েছে হাজার পরিবার।

ইংরেজ ভারত ছেড়ে গেছে, কিন্তু যে বাংলার মানুষ ইংরেজদের বিরুদ্ধে বেশি লড়াই করেছিল তাদের চরম শাস্তি দেবার জন্যই বাংলা আর পঞ্জাবকেই দুভাগ করে দিল।

হিন্দু-পাঞ্জাবিদের অধিকাংশ চলে আসে এদেশে আর ওখানকার বেশি মুসলমান চলে গেল পাকিস্তানে। উদ্বাস্তুর ঢলের সমস্যাটা ওখানে দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। কিন্তু বিভাজিত পশ্চিমবঙ্গ পেয়েছে তার অর্ধেকের কম জমি অথচ ওদেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছে বহু কোটি মানুষ। তাদের ঠাঁই দেওয়া এটুকু পশ্চিমবাংলার সম্ভব নয়। তাই মফস্বলের গ্রাম প্রান্তরেই ছড়িয়ে পড়ল ওরা।

কেউ গেল আন্দামানে, কেউ গেল দণ্ডকারণ্য সেখানে তারা ঘর বাড়ি জমি পেল। পশ্চিমবাংলায় তবু কোটি মানুষ পড়ে রইল।

বিজন দেখে এই আসানসোল—শিয়ালডাঙা অঞ্চলেও সেই ছিন্নমূলদের আসা শুরু হয়েছে। তারাও কেউ দোকান করেছে। কেউ টুকটাক কাজ জুটিয়ে মাঠের ধারে নতুন ঘর ঝুপড়ি বানিয়ে কলোনির পত্তন করেছে। গালভরা নামও দিয়েছে। কোনটার নাম দিয়েছে শহিদ কলোনি কোথাও নেতাজী কলোনি। ওদিকে হয়তো দেশবন্ধু কলোনি। স্বাধীনতার বছর খানেকের মধ্যে এই অঞ্চলের চেহারাও বদলে যায়।

ভোটের ঝড়ও উঠেছিল তুঙ্গে। রতন তার দলবল নিয়ে চষে বেড়ায়। জীবন অবশ্য ভোটের সময় মোহনলালের দলে তেমন সুবিধা করতে পারেনি কারণ নিতাইবাবুর দলের নামডাক বেশি ওরাই এতদিন এলাকার মানুষের সেবার কাজ করেছে নিঃস্বার্থ ভাবে। বসন্তবাবু যোগ্য ব্যক্তি—সমাজসেবী শিক্ষিত, তার তুলনায় মোহনলাল তেমন কিছু নয়। তার পরিচিতি এখানের শ্রমিক মহলেই। তাই বাইরের ভোট সে পায়নি। জয়ী হয়েছে বসন্তবাবু। আর এই জয় যেন রতনেরই জয়। রতনের অন্যতম প্রধান অনুচর জীবন। সে একটা জিপে বসন্তবাবুর পাশে দাঁড়িয়ে আবীর মেখে জয়ধ্বনি দেয় শূন্যে হাত ছুড়ে,

—জিতলো কে?

তার দল তখন আবীর মেখে ভূত হয়ে আসা পার্টির সঙ্গে উদ্দাম নৃত্য করছে। তারা গলা মেলায়,

—বসন্তবাবু আবার কে?

বিজন দেখে ওই বিজয় মিছিল। ঝড় থামবে এবার ভোটের ঝড়। দেখা যাক নতুন সরকার দেশের জন্য কী করে।

এবার স্বাধীনতার পর সত্যই কর্মযজ্ঞ শুরু হয়। পশ্চিমবাংলায় তখন মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন বিধানচন্দ্র রায়। পশ্চিমবঙ্গের ওই অঞ্চলে বিহার সীমান্ত অজয়ের ধার ঘেঁসে। ওই বিশাল প্রান্তরে শুরু হয়েছে নতুন রেল ইঞ্জিন তৈরির কারখানা। স্বাধীন ভারতবর্ষ এবার নিজেদের ট্রেন চালানোর জন্য বাইরে থেকে আর রেলইঞ্জিন

আমদানি করবে না, নিজের দেশে তৈরি হবে রেলইঞ্জিন, অন্যদেশেও তা বিক্রি করবে।

দুর্গাপুরেও ছিল বিশাল এলাকা জুড়ে গভীর শালবন, সেই শালবন কেটে আরও এলাকা নিয়ে গড়ে উঠেছে নতুন একটা লোহা কারখানা, দেশে এখন প্রচুর লোহার দরকার, দরকার উন্নতমানের স্টিলের। এত কোলিয়ারি রয়েছে। তার জন্য প্রচুর যন্ত্রপাতি বিদেশ থেকে আনতে হয়। এবার ওসবও তৈরি হবে এখানেই। শিল্পক্ষেত্রে ভারতও নতুন ইতিহাস গড়বে। আর সেই কাজই শুরু হয়েছে।

এতদিন ধরে দামোদর নদের বন্যা ছিল সারা দক্ষিণবঙ্গের আতঙ্কের বস্তু। বর্ষায় প্রচুর জল নামতো, সারা দেশকে ডুবিয়ে দিত। তাই দামোদরকে বলা হত টিয়ার্স অব বেঙ্গল। সেই দামোদর নদকে বিভিন্ন জায়গায় জলাধার করে সেই জলকে আটকে রেখে দেওয়া হবে, তাতে বন্যার প্রকোপও কমবে। আর শুখা মরসুমে ওই জলাধার থেকে জল ছেড়ে কৃষিকার্যের জন্য জমিতেও জল পৌঁছে দিতে হবে।

মাইথনে, পাঞ্চেতে জলাধার তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। ব্যারেজ তৈরি করা হচ্ছে, তৈরি হচ্ছে বিস্তীর্ণ দামোদরের উপর বাঁধ। আর বিজনদেরও স্টেশনে নেমে ওই দুস্তর নদী পার হয়ে বাড়ি যেতে হবে না। সোজা বাসই যাতায়াত করবে ওই ব্রিজ পার হয়ে তাদের গ্রামের পথ দিয়ে।

দুর্গাপুরের বিভিন্ন কারখানা গড়ে উঠলে এদিকের গ্রামগুলোর চেহারাই বদলে যাবে। বহুমানুষের রুজি রোজগারের ব্যবস্থা হবে। বিজনও দেখেছে স্বাধীনতার পর এই নতুন সরকারের নেতৃত্ব দিয়ে বিধান রায় বাংলাকে নতুন করে গড়ার স্বপ্ন দেখেছেন।

শিয়ালডাঙার কারখানার ওদিকে গড়ে উঠেছে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে সার কারখানা। ওখানেও গড়ে উঠেছে সরকারি উদ্যোগে ওই কারখানার নতুন টাউনশিপ—বড় বড় শেড। অ্যামোনিয়া স্টোরেজ ট্যাঙ্ক।

শিয়ালডাঙার কারখানাও চলেছে জোর কদমে। মিঃ উইলসন সেদিন বিজনকে বলেন,

—তোমার জন্য সুখবর আছে বিজন।

বিজন চাইল। উইলসন বলে,

—তোমার প্রমোশনের অর্ডার এসেছে। নাউ ইউ উইল বি চার্জম্যান। বিজন বলে—অনেক ধন্যবাদ স্যার। আপনার জন্যই এটা সম্ভব হয়েছে। উইলসন বলে,

—নো-নো। ইউ ডিজার্ভ ইট বিজন।

বিজনের বন্ধুরাও খুশি হয়। বিজন বলে,

—এবার তো কোয়ার্টার পাবি রে। মেস ছেড়ে বিয়ে-থা করে এবার ঘর বাঁধ।

রমেন বলে,

—কি রে। তোর ইয়ে মানে প্রেমট্রেম কেমন চলছে।

—মানে। বিজন অবাক হয়।

বাড়িতে এখনও তাকে টাকা দিতে হয়। মা—দুইভাই পড়ছে। বোনের বিয়ে দিয়েছিল কো-অপারেটিভ থেকে লোন নিয়ে। সেই টাকা এখনও সব শোধ হয়নি। সংসারের প্রতি এখনও তার কর্তব্য আছে। তার প্রেম করার অবকাশও নেই। সময়ও কম, কারণ চাকরিই নয় তাকে চাকরির পর পড়াশোনা করতে হয়। বিজন বলে,

—প্রেম। পড়িসনি ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময় পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।

আমারও তাই রে।

রমেন বলে,

—তুই তো ব্যাটা বড় গাছে ডেলা বেঁধেছিস রে। রাজত্ব আর রাজকন্যা।

—মানে, অবাক হয় বিজন।

রমেন বলে—ন্যাকা। ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানে না। সীমার কথা বলছি রে। ওখানে তো তোর অবাধ গতি। দুজন এদিকে ওদিকে বেরও হোস।

বিজন সীমার সঙ্গে মেশে সত্যি। কিন্তু এভাবে কোনোদিনই মেশেনি। সীমা তার মুগ্ধ পাঠিকা। তার লেখার সমালোচনা করে—বিজনও তার সঙ্গ পেয়ে ধন্য। ওই সীমাই তাকে লেখার কাজে অনুপ্রাণিত করেছে। নিতাইবাবুর কাছে সে কৃতজ্ঞ।

কিন্তু তাদের তুলনায় নিতাইবাবু অনেক বড়লোক। জমিদারি কোলিয়ারি এসবও রয়েছে। রয়েছে প্রচুর অরণ্য। তাদের সামাজিক অবস্থান বিজনের তুলনায় অনেক উপরে। সীমাকে পাবার স্বপ্নও সে দেখেনি। বিজন বলে,

—এসব তোদের কল্পনা রে। বাস্তবে এর কোন ঠাঁই নেই। ছাড় তো এসব কথা। এখন ভাবছি নতুন চাকরি করতে হবে ওই মরিস সাহেবের আড্ডারে। ব্যাটা তো হাড় বজ্জাত।

বিজয় বলে,

—কার্তিকবাবুকে ধর। উনি তো নিতাইবাবুরও চেনাজানা। ওকে মুরুব্বি করলে মরিস সাহেবকেও হাতে আনতে পারবি।

বিজন বলে,

—দেখা যাক, এতদিন উইলসনকে দেখলাম। সত্যিই একটা ভদ্রলোক। এবার দেখি ওই সাহেবকে। চাকরি তো করতে হবে।

এতদিন এদের একটা অহংকার ছিল। এই লালমুখো সাহেবরা লোহা কারখানা চালাতে পারে। সেই যোগ্যতা আছে তাদেরই। এটা ছিল তাদের মালিকানায় একচেটিয়া ব্যবসা।

এবার ভারত স্বাধীন হবার পর কয়েকটা লোহা কারখানা গড়ে উঠেছে। আর জার্মান রাশিয়ার লোক এসে সেসব কারখানা তৈরি করছে। এখানের ইঞ্জিনিয়ার কর্মীরাও সেইখানে কাজ করছে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি নিয়ে।

আরও সমস্যা দেখা দিয়েছে। এতদিন এটা ছিল ইংরেজ মালিকদের প্রতিষ্ঠান। এখন স্বাধীন ভারতবর্ষে একা ইংরেজকে বাণিজ্য করে পুরো লাভ নিয়ে যেতে দেবে না তাদের দেশে। তাদের দেশের আধা যোগ্য লোকেদেরও বেশি মাইনে

দেবে না অকারণে। ইংরেজদের ব্যবসাতে এখন ভারতীয়দেরও অংশীদার করে নিতে হবে। তারাও পরিচালনার কাজটা দেখবেন। অর্থাৎ ইংরেজের শাসন শোষণ আর চলবে না, কর্মচারীদেরও এবার যোগ্যতার পরীক্ষা দিতে হবে।

এই প্রশ্ন উঠেছে, আর এই প্রশ্নগুলোই এবার এতদিনের কর্তৃত্ব করা সাহেবদেরও ভাবনাতে ফেলেছে, তাদের মধ্যে অনেকেই বিশেষ ভাবে গুণসম্পন্ন নয়। অবশ্য অনেকেই বিলেতের পাস করা ইঞ্জিনিয়ার। মিঃ হাভার্ডও তাই। কিন্তু মরিস ডিপ্লোমাধারী মাত্র। লালমুখো ওদেশি বলে সে ওয়ার্কস ম্যানেজার হয়েছিল ধাপে ধাপে। আরও অনেকেই।

এবার এই কারখানার পরিচালনার ব্যাপারেও আলোচনা শুরু হয়েছে কলকাতার হেড অফিসে। দিল্লির কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তও এসে গেছে।

এখানের এক ভারতীয় প্রতিষ্ঠান এই কারখানার পরিচালনার ব্যাপারে অংশীদার হতে চলেছে। এবার এখানের লালমুখোদের অনেকেই চিন্তায় পড়ে। মরিস সাহেব এবার বিপদে পড়েছেন। এতকাল ধরে তিনি কোম্পানির নানা খাতে অনেক টাকা নানা ভাবে তছরূপ করেছেন। পারচেজ সেকশনের কাজেও তিনি নাক গলিয়ে অনেক কাজ বেআইনি ভাবে করেছেন।

জনসন হিসাব বিভাগের কর্তা। সেও বলে,

—মিঃ মরিস, ইউ উইল বি ইন ট্রাবল। নতুন ম্যানেজমেন্ট এসব কাগজপত্র হাতে পেলে তোমার বেআইনি কাজের জন্য তোমার বিরুদ্ধে অ্যাকশনও নিতে পারে।

একা মরিস নয় মিঃ রিচার্ডও এবার ঘাবড়ে গেছে। সেও বেশ কিছু শ্রমিককে বেআইনি ভাবে পয়সা নিয়ে নিয়োগ করেছে ওই মোহনলালের দলের। অন্য পক্ষও এ নিয়ে মামলা করেছে। এতদিন আদালতে সাহেবদের জন্য বিচার-ব্যবস্থা ছিল আলাদা। এখন আর তা নেই। আদালত তাকেও শাসন করেছে। আদালতে হাজির হয়ে এসব কাজের জন্য কৈফিয়ত দিতে হবে। ওই লেবারদের নিয়োগ বাতিলও হতে পারে। তখন তারাও ছাড়বে না।

বিজন নতুন বিভাগে যোগ দিয়েছে। দেখে, সেখানের কাজকর্ম ঠিক মতো চলছে না। মরিস সাহেব আর কারখানাতে লম্ফঝম্ফ করে না। বিজন এখন তার সুপারকে নিয়ে নতুন করে কাজের প্রোগ্রাম করে কাজ করে, ওর সুপার মিঃ রায় বলে,

—বিজন, এখন কারখানা আমাদের। ওই বিদেশিদের আর নয়, একে টিকিয়ে রাখতে পারলে—এর প্রডাকসন বাড়াতে পারলে আমাদের দেশেরই উন্নতি হবে। কিছু ছেলেও কাজ পাবে। এটা দেখতে হবে আমাদেরই।

বিজনও তার স্টাফদের কাছে এর মধ্যে পরিচিত হয়ে উঠেছে। তারাও বিজনের সঙ্গে ঠিকমতো প্রোডাকশন বাড়াবার কাজে হাত লাগিয়েছে। মিঃ মরিসও দেখে অবাক হয়। এই দেশি লোকগুলোই এখন উঠে পড়ে লেগেছে প্রোডাকশন বাড়াতে। তার আমলে সে কড়া শাসন করেও এত প্রোডাকশন করতে পারেনি। এবার মরিস বুঝতে পারে সত্যিই তাদের প্রয়োজন এখানে ফুরিয়েছে।

রতন এখন তার ব্যবসা আরও বাড়িয়েছে। এর মধ্যে অবশ্য মোহনলালের সঙ্গে সেই সম্পর্কটা আর নেই। ভোটের মুখেই রতন দেখে এই দলে টিকিট না পেয়ে মোহনলাল অন্য দলে ভিড়ে ভোটে দাঁড়িয়েছে। রতনের বিরুদ্ধে দলেই গেছে মোহনলাল নিজের স্বার্থে।

কার্তিকবাবুও অবাক হয়।

—এটা কি করলে মোহনবাবু? এই দলে গেলে ওই দল ছেড়ে।

মোহনলাল নিজের স্বার্থ ভালোই বোঝে। আর বনানীই তাতে এসব বুদ্ধি দিচ্ছে। মোহনলাল বলে,

—এ দলে থেকে কি হবে কার্তিকবাবু। এখন শ্রমিক কৃষকদের দিন আসছে। ওই সাধারণ মানুষ আর কিছু বড়লোকেদের দিন শেষ হবেই।

এখন মোহনলাল শ্রমিক ইউনিয়ন করে মাসে কয়েক হাজার টাকা চাঁদা তুলছে। ভোটের জন্য বিশেষ সাহায্য বাবদ অনেক টাকাই চাঁদা তুলেছে। এসব টাকার পরিমাণও কম নয়। সেসব টাকার হিসাবও কাউকে দিতে হয় না। তাই মোহনলাল এখন কার্তিকদের এই ব্যবসার টাকার মায়া ছেড়েছে।

রতন বলে,

ব্যাটা যা করছে করুক। আমাদের কাজ আমরা যেমন করছি তাই করব।

কার্তিক বলে,

—কোম্পানির মধ্যেও এখন গোলমাল চলছে রতন। সাহেবরা মনে হয় পাততাড়ি গুটোচ্ছে। নতুন ম্যানেজমেন্ট এলে তারা কি করবে কে জানে?

রতন বলে,

—সবাই সমান গো, তারাও ঠিক ডিগবাজি খাবে—পয়সাও নেবে। পয়সার নেশা বড় নেশা, ওটা যুগিয়ে যাও তোমার বাণিজ্য ঠিকই চলবে।

ওরা এখন রাতের অন্ধকারে স্ল্যাগের ব্যবসা—ওদিকে কোলিয়ারীর কয়লা চুরির কাজ সমানে চালাচ্ছে। রতন আর একটা লাইনও চালু করেছে। কারখানার মাল ওয়াগনে করে দূরের রেলস্টেশনে যায়। সেখান থেকে বাইরে চলে যায় মালগাড়িতে জুড়ে।

রাতের অন্ধকারে সেদিন ওই ইয়ার্ডে কয়েকটা দামি লোহা ভর্তি ওয়াগন রয়েছে। ওতে রয়েছে ব্লাস্ট ফার্নেস থেকে গলানো লোহার ইনগট। ওগুলো গলিয়ে অন্য কারখানায় প্রয়োজনমতো জিনিসপত্র তৈরি হয়। বাজারে ওর খুবই চাহিদা। রাতের অন্ধকারে এর মধ্যে দুটো ট্রাকও তৈরি রয়েছে লাইনের ধারে। লাইনের ধারে ঝোপঝাড়ও রয়েছে। দু একজন সেন্ট্রি দূরে বসে ঢুলছে।

হঠাৎ কিসের শব্দে তারা চাইল। কয়েকজন লোক ওই গার্ডদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওদের বেঁধে ফেলে। কেড়ে নেয় হাতের বন্দুক। ওদিকে তখন ওয়াগন থেকে নামছে ছায়ামূর্তির দল, ওইসব দামি মাল। ওদিকের ট্রাকে তুলে মাল সাফ করে তারাও অন্ধকার হারিয়ে যায়। কয়েক লাখ টাকার মাল সাফ হয়ে গেল—এরা কিছুই করতে পারল না।

যারা করেছে তাদেরও কোনো পাত্তাই আর নেই। মালই সব চলে গেল। এমন

ঘটনা এর আগে ঘটেনি এখানে। এতদিন ধরে কোম্পানির মাল যাচ্ছে। এইবার কয়েক লাখ টাকার মাল পুলিশের সামনে থেকে গায়েব হয়ে গেল। এই নিয়ে আলোড়ন ওঠে পুলিশ মহলেও, শোরগোল পড়ে যায়। তদন্তই শুরু হল ঘটা করে। কিন্তু তারপর সব চুপচাপ হয়ে গেল। আবার মাস তিনেক পর এবার কারখানা থেকে স্টেশনে যাবার পথে পলাশ বনের মধ্যে গাড়ি থামিয়ে কারা মালপত্র লুঠে নিয়ে গেল। পুলিশ এবার উঠে পড়ে লাগলো খোঁজখবর করতে, ট্রেনে বন্দুকধারী পাহারা বসানো হল।

প্রথমে কাজটা বেশ কঠিনই মনে হয়েছিল রতনের। তার দলবল এতদিন অবশ্য অন্য মাল পাচার করে এসেছে। এসব দামি লোহার কাজ করেনি। অবশ্য এই কাজে সাহস দিয়েছিল শহরের ওই শেঠ সুখলালজী।

সুখলালজীর নিজের একটা কোলিয়ারী আছে। হাওড়ার দিকে একটা লোহার ছোট কারখানা আছে। ওই কোলিয়ারীর কয়লার স্তূপের মধ্যে রাতের অন্ধকারে এদিকের অনেক কোলিয়ারির চোরা কয়লা এসে শামিল হয়।

আর স্ল্যাগের কারবার এখন তার ভালোই চলছে, ওই রতনের জন্য। পুলিশের কর্তাদেরও সে হাতে রেখেছে—এখানের তার এক গেলাসের ইয়ার। সেই শেঠ সুখলালই এমনি কাউকে খুঁজেছিল এই কাজের জন্য।

সে কলকাতার বাজার পেয়ে গেছে। এসব মাল ভালো দামেই নেবে সেই মহাজন। আগামও দেবে। তাই সুখলাল এবার রতনকেই ধরে, অবশ্য রতন প্রথমে রাজি হয়নি। ওই কাজে বিপদ অনেক। কোম্পানির মালের উপর ডাকাতি করা কঠিন কাজই। পুলিশও ছাড়বে না।

কিন্তু সুখলাল বলে,

—ওসব হামি সালটে নেবে। তুমি মাল আমার কোলিয়ারির পিছনের জঙ্গলে এনে দেবে। ট্রাক হামি দেবে। ওখানেই রূপেয়া নিয়ে চলে যাবে। বাকি ইখান থেকে সেই রাতেই কলকাতা পাচার করার জিম্মেদারি হামার। লেও আগাম বিশ হাজার রূপেয়া, লোকজন ফিট করো।

রতন কি ভাবছে। শেঠজী বলে,

—ডরো মৎ হাম হ্যায় না।

শেঠজী অবশ্য তার দলের ভোটের সময় টাকাকড়ি অনেক দিয়েছিল। জিপগাড়িও দিয়েছিল। এলাকার মধ্যে নামকরা লোক সে। সেই শেঠজীর এইরূপ কথা শুনে রতন কিছুটা ভরসা পায়। সমাজে চোরজোচ্চোর সে একা নয়। স্বাধীনতার পর এই ডামাডোলের মধ্যে এক নতুন শ্রেণীর সুবিধা তৈরি হয়েছে। তাকেও এদের মেনে নিতেই হবে। রতনও আরও অনেক কিছু পেতে চায়, অনেক উপরে উঠতে চায়। তাই সে এবার রাজি হয়ে কাজে নামে।

জীবন এখন রতনের ডানহাত। জীবন এখন সবাইকে বলে রতনদার আড়তে কাজ করে। এখন সে দামী প্যান্ট শার্ট জুতো পরে। হাতে একটা সোনার চেন। কমলাও ছেলের চাকরিতে এখন খুশি। জীবন মাঝে মাঝে মাকে একমুঠো নোট বের করে দেয়।

—রাখো মা।

কমলাও খুশি হয়। স্বামীর রোজকার সে একমুঠো নোট কোনোদিন পায়নি। অবিনাশবাবু নিজেই সংসার খরচ করতেন। পাই পয়সার হিসাবও রাখতেন। কমলা চেয়েও দশবিশ টাকার বেশি কোনোদিন পায়নি। এখন দমকা দু'পাঁচশো টাকা পেতে খুশিই হয়। অবশ্য অবিনাশবাবুকে এসব বলে না।

অবিনাশবাবু রিটায়ার করে টাকাটা ব্যাঙ্কে রেখেছেন আর কিছু টাকা দিয়ে দোকান করেছেন। এখন দোকান থেকে কিছু লাভ আসছে। সেইটুকু আর সুদের টাকা দিয়ে কোনোমতে দিন চলে।

জীবন দোকানেও বসে না। অবিনাশবাবু বলেন,

—দোকানে বসলে দোকান বাড়বেই। মহাজন ধারে মাল দিতে চাইছে। বিক্রি করে টাকা দেব। তুই আয়।

কমলাই বলে,

—ও এখন রতনবাবুর সঙ্গে কাজ করছে। ওর সঙ্গে ব্যবসা করবে। তোমার ঐ দোকানে নিয়ে তুমিই থাকো। ওর ভবিষ্যৎ নষ্ট করছ কেন? অবিনাশবাবু দোকান বসে, এলাকার অনেক লোকই আসে বাজারে। তাদের মুখেও শোনে রতনবাবুর কথা। অবিনাশও দেখেছে রতনকে। এখন জিপ নিয়ে ঘোরে কিসের ব্যবসা করে কে জানে? তবে অনেকে বলে,

—ও নাকি কয়লা পাচার করে।

কিন্তু অবিনাশ দেখে রতন এই এলাকার মস্তান। ভোটের সময় তার অন্য মূর্তিও দেখেছে। ওই রকম একটা ছেলের সঙ্গে জীবনের মেলামেশা সে পছন্দ করে না। তাই বলেন অবিনাশ।

—ওর নামে অনেক কথাই শুনি বাজারে—ওর সঙ্গে মেলামেশা না করাই ভালো।

কমলা বলে,

—তোমার ওই দোষ। কখনও কারোও ভালো দেখতে পারো না। রতনের মতো ছেলের নামেও ওইসব বল।

অবিনাশবাবু বলে,

—যা শুনেছি তাই বললাম। তোমরা কোনোদিন তো আমার কথা শুনলে না, মা-ছেলেতে যা ভালো বোঝো কর।

জীবন অবশ্য বাবার কথা কানে তোলে না। এখন রতন তাকে একটা মোটর বাইক কিনে দিয়েছে। জীবন সেটায় চড়ে ঘোরে। তার কাজ পড়ে রাতের অন্ধকারে।

এলাকার লোক জানে বন পাহাড়ে রতন যেখানে পাথর খাদান করেছে ওই জায়গাটা নিতাইবাবুদের। ওখানে এতদিন ধরে মাটির অতলে যুগ যুগ ধরে জমা হয়েছিল গ্রানাইট পাথরের স্তর।

এখন চারিদিকে নতুন কারখানা কোয়ার্টার—দুর্গাপুরে বিশাল কর্মকাণ্ড চলেছে। কংক্রিটের কাজে এখন টনটন খোয়া স্টোনচিপস লাগছে। তাই নিতাইবাবু একটা পাথরের খাদান করে সেখান থেকে পাথর তুলে মেসিনে ক্রাশ করে বিভিন্ন

সাইজের স্টোন চিপস চালান দিচ্ছে বাইরে।

রতনও সেটা দেখাশোনা করে, অবশ্য ওই খাদানের ওদিকেই শুরু হয়েছে স্ল্যাগ ব্যাঙ্কের সীমানা। রতন ওখানেই জঙ্গলের মধ্যে সুড়ঙ্গ করে হাজার হাজার টাকার স্ল্যাগ পাচার করছে। জীবন এসব কাজের অন্যতম সঙ্গী। এখন জীবনকে রতন আরও লোভনীয় কাজের সন্ধান দিয়েছে। ওই মালগাড়ি লুঠের প্ল্যানটা ছকে দেয় রতন, জীবনকে বলে,

—কিরে জীবন পারবি কাজটা করতে? তোর হাতে একরাতে আসবে দশ হাজার টাকা।

জীবন কাজের প্ল্যানটা দেখে বলে,

—দু একদিন রাতে ওই জায়গাটা ঘুরে আসি রতনদা। ন্যাপাকে নিয়ে হালচাল বুঝে আসি। তারপর দেখা যাবে।

রতন বলে,

—তাই কর, একটু সাবধানে করতে হবে কাজটা।

জীবনও এখন সাহসী হয়ে উঠেছে। ন্যাপা ক্যাবলাকে নিয়ে দু একবার রাতে জায়গাটা দেখে এসেছে। পুলিশদের উপরও নজর রেখেছে তারা। রেলইঞ্জিনের কোথায় ওয়াগনগুলো রয়েছে দেখে নেয়। নীচেই ট্রাক এসে থামবে।

ওর কাজ মাল ট্রাকে তুলে দেওয়া। তারপর অন্যরা সেই ট্রাক নিয়ে চলে যাবে। এরাও ফিরে আসবে নিজেদের ডেরায়। রতন তার সব ঘাটগুলোর খবর জানে কিন্তু জীবনকে দিতে চায় না। এসব কাজে গোপনীয়তা দরকার। আর ধরা পড়লেও ওরা বেশি কিছু বলতে পারবে না।

জীবন সেই রাতে নিপুণ দক্ষতার সঙ্গেই অপারেশন চালায়। পিছন থেকে লাফ দিয়ে পুলিশের দুজনকে কাবু করে ফেলে। তখন ওয়াগনের মালও নামতে শুরু করেছে। কয়েক মিনিটের মধ্যে কাজটা শেষ করে জীবন ফিরে যায়।

রতন পরদিনই ওকে টাকাটা দিয়ে বলে,

—শাবাশ। দেখলি তো ক্যামন রোজগার করলি। হিম্মত রাখ। তোর একদিন হবে। এই কাজই চালু রাখতে হবে। তবে দু'চারদিন চুপচাপ থাক।

তার ক'মাস পরেই আবার প্রচুর মাল লুঠ করে তারা অতর্কিতে অন্যত্র হানা দিয়ে। তারও কোনো কিনারা হয় না। এবার জীবনের সাহসও বেড়ে চলে। রতনের আমদানিও বেড়েছে।

নিতাইবাবু এখন জেলা কংগ্রেসের নেতা। তাই নানা কাজে ব্যস্ত থাকতে হয় তাকে। বাড়িতে পুরোনো কাজের লোক মানদা দু-একজন গোমস্তা আর সরকার মশাই। সীমাকে মানদাই দেখাশোনা করে। বিজন আসে মাঝে মাঝে।

সীমা অবশ্য ওর প্রমোশনের কথা শুনেছে। তাই বলে—এখন তো অফিসার তুমি;

বিজন বলে,

—নামেই তালপুকুর, ঘটি ডোবে না।

সীমা বলে, নতুন কী লিখছ!

বিজন বলে,

—ভাবছি দেশের মধ্যে একটা বিরাট পরিবর্তন এলো। এর সুফল কুফল কী হয় তাই নিয়েই ভাবছি।

বিকেল নামছে সীমাদের বাড়ির লাগোয়া বাগান পুকুরে। গ্রীষ্মের বিকাল তখনও পাথুরে মাটি তেতে আছে। মহুয়া গাছে এসেছে ফুলের মঞ্জরী। দিনশেষে রাতের অন্ধকারে ফুলগুলো ফুটে ওঠে। তখন বাতাসে জাগে তীব্র সুবাস, হলুদ রসালো ফুলগুলো এক রাতের বাসর সাজিয়ে আবার ঝরে পড়ে।

হঠাৎ জিপটাকে আসতে দেখে চাইল বিজন। নামছে রতন, ওর হাতে একটা প্যাকেট। রতন মুখ চেনে বিজনের। দেখেছে ওকে নিতাইবাবুও স্নেহ করেন। ছেলেটা কারখানায় কাজ করে। বিজনকে রতন দেখেও দেখে না। সীমার কাছে প্যাকেটটা দিয়ে বলে,

—তোমার জন্মদিনে আমার তরফ থেকে সামান্য উপহার।

নিজেই প্যাকেটটা খুলে দেখায় দামি একটা সিল্কের শাড়ি।

—কি পছন্দ হয়েছে তো? রতন ভারিক্কি চালেই বলে।

সীমা শাড়িটা দেখে। বলে,

—এত দামি শাড়ি তো আমি পরি না রতনদা। এ তো অনেক দাম।

রতন বলে,

—পরবে। কিন্তু নিতাইবাবুকে দেখছি না।

সীমা বলে—জেঠুমণি শহরে গেছেন।

—তাহলে চল, আমরাও শহরে গিয়ে তোমার জন্মদিন পালন করে আসি, ছবি দেখব। ভালো কোনো রেস্তোরাঁয় খাব। দেরি হবে না। সন্ধ্যায় ফিরে আসব।

সীমা বলে,

—আমি যেতে পারব না। তুমি এসো। আমি এখন পড়ার ব্যাপারে আলোচনা করছি।

রতন হতাশ হয়ে বলে,—তাই নাকি।

—হ্যাঁ।

রতন হতাশ হয়,

—তাহলে আলোচনাই করো। তবে বুঝলে সীমা বেশি পড়াশোনা করেও লাভ নেই এখন। আরে পয়সা রোজগার নিয়ে কথা, ওইটাই আসল, চলি।

জানান দিয়ে চলে যায় রতন অবশ্য যাবার সময় বিজনকে একবার ভালো করে দেখেও নেয় নীরবে। চলে যায় জিপের গর্জন তুলে।

হঠাৎ কিছু পয়সা পেয়ে ধরাকে সরা দেখছে। সে মনে করে দুনিয়াটা তাদের ইচ্ছামতো চলবে।

বিজন দেখে রতনকে। আগে একটা সাইকেলে করে ঘুরতো। বাজারে চায়ের দোকানে আড্ডা দিত, মিটিং মিছিলে হুঙ্কার দিয়ে স্লোগান দিত। তারপর এসেছে নিতাইবাবুর এখানে। তারপরে কৌশলে ওর হাল বদলে ফেললো। রতন লেবার

কনট্রাকটর কার্তিকবাবুর সঙ্গে ইউনিয়নের মোহনবাবুর সঙ্গে ভিড়ে গেল।

এখন রতন কারখানার বাতিল মালও নাকি কার্তিকবাবুর লেবারদের দিয়ে সরায়। আরও কীসব ব্যবসা করে। শাসকদলের লোকেদের সাথে পরিচিতি আছে। এরপর সাইকেল মোটরবাইক তারপর জিপে প্রমোশন পেয়েছে।

বিজন বলে,

—এরাই স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছে সীমা। দেখবে স্বাধীন ভারতের চেহারাটাই এরা বললে দেবে। সমাজটাকেও। হঠাৎ সহজে সব কিছু পেলে তারা সব কিছু ভেঙে চুরমার করে দিয়ে আনন্দ পায়।

সীমা বলে,

—হয়তো তাই বিজন। এদের ভয় করে। এদের এড়িয়ে থাকতে চাই।

বিজন বলে,

—বাদ দাও ওকথা। আজ তোমার জন্মদিন তা তো বলোনি।

সীমা হাসে, বিষণ্ণ মলিন হাসি। বলে,

—আমি আবার মানুষ, তার আবার জন্মদিন। মা নেই বাবা নেই। জেঠুমণি তো সংসারে থেকেও সন্ন্যাসী। আমার পাশে কে আছে বলো যে জন্মদিনের উৎসব করবে।

ওর কথায় বিষণ্ণতার সুর ফুটে ওঠে। সেটা বিজনেরও নজর এড়ায় না।

বিজন বলে,

—জীবনের সব কিছুকেই মেনে চলা উচিত সীমা। কী পেলাম আর কী পাইনি তার হিসাব করতে গেলে দুঃখই বাড়ে মাত্র।

সীমা দেখছে বিজনকে। ওর ডাগর দুচোখের চাহনিতে যেন কী এক রহস্যময়তা। নীরব এক ব্যাকুলতা। এ যেন অন্য এক সীমা। বিজন যাকে ঠিক চেনে না।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামছে। ঘরে ফেরা পাখিদের কলরব ওঠে আকাশে, ফুটে ওঠে দু'একটা করে তারার ফুল। দিগন্তের পাহাড় বনে রহস্যময়তার অন্ধকার ঘনিয়ে আসে।

সীমা বলে—সন্ধ্যা হয়ে গেছে। চল ঘরে ফেরা যাক।

ওরা পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে।

মিঃ মিত্র, মিঃ রায়, মিঃ প্রধানের মতো এদেশীয় ইঞ্জিনিয়াররা এবার খুশি হয়েছে। মিঃ মিত্র এখন ক্লাবে আসে। রীনাকেও আনে। অন্যবার বড়দিনে এখানে খুবই ধুমধাম নাচগান খানাপিনা হতো। তখন মিসেস প্রধানও তার হারানো যৌবনকে ধরে রাখার ব্যর্থ চেষ্টা করে মিঃ মরিস মিঃ হাভার্ডদের সঙ্গে নাচার অভিনয়ও করতো। দু'এক পেগ জিনও গিলে ফেলতো মিসেস রায়—আরও দু'একজন। উইলসনের মিসেস নোরাও আসতো তার মেয়েকে নিয়ে। মেয়েও এখন যুবতী, নোরাও নিজেকে পুরোপুরি মেমসাহেব বলেই মনে করে।

সে মদ খেলেও ভুলেও কোনোদিন মিঃ রায়, মিঃ দত্তকে বা মিঃ মিত্রদের সঙ্গে নাচে না। সে তার নাচের সঙ্গী খুঁজে নেয় লালমুখোদের। নেটিভদের সঙ্গে নাচ—

নোরা ভাবতেই পারে না। মেয়েকেও সেই ভাবে মানুষ করেছে। মেয়েও এখন সাহেব মহলে পরিচিতা। মিঃ মরিসও তাকে মাঝে মাঝে এক আধটু আদর করার চেষ্টাও করে—নোরা এসব দেখেও দেখে না।

উইলসন এসব দিনে ক্লাবে আসে না। সে ওই বিদেশিদের যেন ঠিক মেনে নিতে পারে না। ওদের অন্ধকারে তৃপ্তিভারে আর লুটে নেবার মানসিকতাকে সে মেনে নিতে পারে না। মেনে নিতে পারে না এখানের মানুষের প্রতি তাদের অবজ্ঞা। তাই উইলসন নিজের জগৎ নিয়েই থাকে।

ইদানীং সে ওই পাহাড়ের নীচে একটা ছোট নদীর ধারে এক প্রাচীন শিবমন্দিরের ওদিকে কয়েক বিঘা জায়গা কিনে বাগান করেছে। একটা সুন্দর মাটির বাড়িও করেছে। ওখানে বসতির আদিবাসীদের জন্য সে একটা স্কুলও খুলেছে। একজন ডাক্তারও সস্নেহে তিনদিন বসে ওখানে ওই লোকদের ওষুধপত্র দেয়।

উইলসনও মাঝে মাঝে ওখানে গিয়ে থাকে সারাটা দিন। নোরাও মেয়েকে নিয়ে দু'একবার গেছে। কিন্তু ওখানে ওই মাটির ঘর আদিবাসীদের আনাগোনা। তার মোটেই পছন্দ নয়। নোরা বলে,

—এই নরকে কেউ থাকতে পারে। এই ডার্টি নিগারদের সঙ্গে।

উইলসন হাসে। এখানেও তার যাত্রার দলের রিহার্সাল বসায়। কোনদিন নিজেও মহুয়া খেয়ে চাঁদনী রাতে ওই বনপাহাড়ে আদিবাসীদের সঙ্গে নাচে গানে মেতে ওঠে।

উইলসনকে দেখে মনে হয় ও যেন এদেরই একজন। ঈশ্বর ভুল করে ওর গায়ের রঙটা ফর্সা করেছেন মাত্র। বাংলার মানুষ সংস্কৃতিকে সে আপন করে নিয়েছে। তাই ঐ বিদেশিদের ক্লাবেও যায় না।

এবার বড়দিনের উৎসব তেমন জমে না বিদেশিদের ক্লাবে। মিঃ মরিস কদিন অফিস থেকে ছুটি নিয়েছে। কলকাতায় যাতায়াত করছে। মিঃ রিচার্ডকেও কেমন আনমনা দেখায়।

মিঃ হাভার্ড-এর মদ খেয়ে সেই গলা কাঁপানো হাসিও শোনা যায় না। মিঃ মিত্র মিঃ রায়, মিঃ প্রধানরা অবশ্য সেজেগুজে এসেছে তাদের স্ত্রীদের নিয়ে। রীনা এদের মধ্যে বেশি বুদ্ধি ধরে। সে এখানে আসে এই জীবনকে দেখতে। এবার বুঝেছে রীনা এদের এই হালছাড়া ভাবের কারণ। এখানের বাতাসে কথা ওড়ে। মিঃ মিত্রও খবর পেয়েছে যে এবার কলকাতার হেড অফিসে নতুন ম্যানেজমেন্ট বোর্ড তৈরি হয়েছে। সেখানে একজন ভারতীয় শিল্পপতি এসেছেন। আর তিনি এসে এবার এখানের কাজের খোঁজখবর নিতে শুরু করেছেন। প্রশ্ন তুলেছেন অনেক কম যোগ্যতা নিয়ে বিদেশিরা কেন বেশি মাইনে পাবে। অর্থাৎ ইংরেজদের আর বিশেষ প্রাধান্য দিতে চায় না নতুন বোর্ড। তাই নিয়েই এবার মিঃ মরিস, রিচার্ডদের মতো লোকদের মনে অজানা ভয় ঢুকেছে। ওরা কলকাতা যাতায়াত করে হাওয়া বোঝার চেষ্টা করে। কিন্তু তেমন আশার কোনো খবরই পায়নি। বরং নতুন বোর্ড এবার অতীতের অনেক অপচয়ের প্রশ্ন তুলেছে। যাতে মিঃ মরিসরা ঘাবড়েই গেছে।

তাই এবার তারা তাদের পাওনাগণ্ডা বুঝে নিয়ে মনে মনে এদেশ থেকে চলে

যেতে চাইছে। থাকলেই বিপদ হতে পারে। সেই খবরটা মিঃ মিত্র জেনে গেছেন। তিনিও আশা করেন, এবার দিন বদলাবে তাদের। তারাই পুরনো স্টাফ তারাই এবার উপরের পদগুলো পাবে।

মিঃ মরিস বলে,

—দেশেই চলে যাচ্ছি মিঃ মিত্র। এই বোধহয় আমাদের শেষ বড়দিন এই ক্লাবে।

মিসেস প্রধান বলে,

—সে কি মিঃ মরিস। তোমরা চলে যাবে।

রিচার্ড বলে,

—তোমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছে। এবার ব্রিটিশ সরকার এখানের ইংরেজদের দেশে ফিরে যেতে বলবে। এমনকী, অ্যাংলোও যারা আছে তারা ইচ্ছা করলে ইংল্যান্ডে না হয় অস্ট্রেলিয়াতে চলে গিয়ে সেখানে ব্রিটিশ সিটিজেন হয়ে বাস করতে পারবে।

নোরাও শুনছে কথাগুলো। সেও স্বপ্ন দেখে এই কালাদের মুলুক ছেড়ে খাস ইংল্যান্ডেই চলে যাবে। সেখানের নাগরিক হয়ে বাস করবে সেই স্বপ্নের দেশে।

নোরার মনে কথাটা ঝড় তোলে। সেও স্বপ্ন দেখে এদেশ থেকে সেই রাজ্যে গেছে নোরা। পাইন ওক বনে ঢাকা কুয়াশামাখা স্নিগ্ধ এক দেশ। সেই সবুজ দেশ যেন নোরাকে ডাকছে হাতছানি দিয়ে। ক্লাবের নাচগান যেন পানসে লাগে নোরার। সে ভাবছে ওই দেশের কথা।

মিঃ মরিস হিসাবি লোক। সে যোগাযোগ করেছে অস্ট্রেলিয়ান হাইমিশনের অফিসে। ইংল্যান্ডে তার ভাইরা রয়েছে। সে জানে যে টাকা সে লুঠ করেছে ইংল্যান্ডে নিয়ে গেলে ভাইরাও ভাগ বসাবে। তাই সে আগে থেকে অস্ট্রেলিয়াতেই একটা আস্তানা গেড়েছে। ইংরেজদের সেই দেশটাও মন্দ নয়—বিশাল দেশ। সেখানে সে একটা বড় খামার করবে। শান্তিতে থাকবে। এখানের অপরাধের জন্য তাকে ইংল্যান্ড হয়তো সাজা দিতে পারে। কিন্তু অস্ট্রেলিয়া তা দেবে না। তাই সেখানেই চলে যাবে সে। সকালে হঠাৎ নোরাকে তার মেয়েকে নিয়ে আসতে দেখে চাইল। ওই মেয়েটাও যৌবনবতী হয়ে উঠেছে।

মরিস-এর লুব্ধ চাহনি তার দিকে। এখানে থাকলে একবার চেষ্টা করে দেখতো। কিন্তু উইলসনটা একটা শয়তান আজ নোরাকে আসতে দেখে মরিস এগিয়ে আসে।

—গুড মর্নিং নোরা। এসো সুইটি—

নোরা আজ এসেছে মরিসের কাছে বিশেষ প্রয়োজনে। সে বলে,

—মিঃ মরিস। আমি তো অ্যাংলো ইন্ডিয়ান। আমি কি লন্ডন বা অস্ট্রেলিয়ায় যেতে পারি না? তুমি যদি হেল্প করো।

মিঃ মরিস ভাবছে কথাটা। এখন মেঘ না-চাইতেই জল পেয়েছে সে। নোরা ওর মেয়েকে যদি নিয়ে যেতে পারে সে দেশে সেখানে এবার নতুন করে ঘর বাঁধবে। মরিস ভীষণ সাবধানী লোক। তাই সাবধানে পা ফেলতে চায় সে।

মিঃ মরিস বলে,

—কিন্তু উইলসন কি যেতে চাইবে?

—যাবেই। ওকে আমি শেষ কথা শুনিয়ে দেব। এখানে আমাদের ঠাঁই আর নেই। মেয়েটার চাকরি বিয়েও হবে না।

মরিস বলে,

—ওদেশে চাকরির অভাব নেই। ভালো ব্রিটিশ পাত্রও পাবে। তুমিও কাজ করতে পারবে, স্টেট হেল্পও পাবে।

অর্থাৎ হাতে চাঁদ পাবার স্বপ্নই দেখায় মরিস এদের। নোরাও এবার মনস্থির করে ফেলে। ওঁর তরুণী মেয়ে সুইটিও মায়ের আদর্শে মানুষ হয়েছে। ক্লাবে আসে। এখানে ইংলিশ মিডিয়ামে পাস করেছে। এদেশের সমাজে সে মেশে না। সুইটিও বলে,

—তাই চল মাম্মি। এদেশের লোকগুলো স্বাধীন হয়ে আমাদের যেন দয়ার চোখে দেখে।

মরিস বলে,

—নোরা, তুমি কলকাতায় চল আমার সঙ্গে। হাই কমিশনের অফিসে কাগজপত্র দেখিয়ে দরখাস্ত করতে হবে। তোমাদের তিনজনের জন্যই করো। তারপর দেখো উইলসন কী বলে?

নোরা কঠিন কণ্ঠে বলে,

—ওই বাগার যদি না যেতে চায় ও থাকবে এই নরকে। আমি সুইটিকে নিয়ে অস্ট্রেলিয়াতেই চলে যাব।

মরিসও স্বপ্ন দেখে। এখান থেকে ওদেশে গিয়ে এবার শান্তিতেই থাকবে। মরিস বলে,

—তা হলে কালই কলকাতায় চলো। বহু লোক এদেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে এই সুযোগে, তাই ভিড় এড়াতে আগে যাওয়াই উচিত।

উইলসন নোরার গতিবিধির উপর কোনোদিনই নজর দেয়নি। সে মাসকাবারে মাইনেটা এনে দেয় নোরাকে। তারপর সংসারের জন্য ভাবনা তার থাকে না। নোরাও চায় না তার ব্যাপারে নাক গলাক উইলসন। বরং সেইই নাক গলায় উইলসনের ব্যাপারে। তার যাত্রাগান, নেটিভদের সঙ্গে ওঠাবসা নিয়ে প্রায়ই তাকে কড়াকড়া কথা শোনায়।

উইলসন গায়ে মাখে না। সে তার নিজের মতো চলে। অন্য সাহেবদের মতো তার মদের নেশাও নেই। নোরাই এখানে ওখানে যাতায়াত করে গাড়ি নিয়ে। উইলসন গাড়িও ব্যবহার করে না। সাইকেলেই যাতায়াত করে। আরও পাঁচজনের মতো। গাড়িতে একটা পার্থক্য বাড়ে। তাই সেটাও ব্যবহার করে না সে। এখান থেকে কয়েক মাইল দূরে কলকাতার যাত্রা গান হবে। এখানের অনেকেই যাচ্ছে। উইলসনও এখন মুক্ত পুরুষ। নোরা নেই সেও গেছে যাত্রার আসরে।

বিজন সেদিন শহরে গেছে নিতাইবাবুর সঙ্গে একটা সাহিত্যসভায়। এখন লেখার জগতে সে কিছু পরিচিতি লাভ করেছে। সীমাও গেছে। সেখানে সাহিত্য-সভা সেরে ফিরছে।

তখন রাত হয়েছে। সীমাকেও আজ গান গাইতে হয়েছে ওই সভাতে। বিজনের মনে হয় চাকরির কাঠিন্য ছাড়াও তার জীবনে কোথাও একটা তৃপ্তির অবকাশ আছে। লেখার মধ্যে বহু বিচিত্র চরিত্রের সুখ দুঃখের সঙ্গে সে জড়িয়ে পড়ে। সেই সময়টা কোনোদিকে কেটে যায় টেরও পায় না।

সেই জগতের মাঝে সীমাও যেন তার অজানতে ঠাঁই করে নিয়েছে, নিতাইবাবু এখন দেশের নানা গঠনমূলক কাজের কথাই ভাবছেন।

বিজনও দেখেছে দুর্গাপুরের রূপ বদলে গেছে। সেই আরণ্যক পরিবেশে আজ গড়ে উঠেছে বিশাল লোহা কারখানা মেসিনারি তৈরির বিশাল কারখানা। তাদের শিয়ালডাঙার এদিকে গড়ে উঠেছে নতুন সার কারখানা সুন্দর টাউনশিপ, সারা দেশে একটা কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছে।

এখন বিজন দেশের বাড়িতে যায়। দামোদরের উপর দিয়ে গাড়িতে। দেশ-গ্রামের বহু মানুষ এখন বিভিন্ন কলকারখানাতে কাজ করছে। গ্রামের অর্থনৈতিক অবস্থাও বদলে গেছে।

নিতাইবাবু বলেন,

—স্বাধীনতার সুফল দিতে হবে সাধারণ মানুষকে। তাই ওসব করতেই হবে।

ওরা ফিরছে রাত্রে। কোথায় যাত্রার আসর ভেঙেছে। তাই পথে লোকজনের ভিড় দেখা যায়। ওদের গাড়ির হেডলাইটের আলোয় দেখে বিজন উইলসন সাহেবকে। তিনি ওই গভীর রাতে পথ দিয়ে হেঁটেই ফিরছেন শিয়ালডাঙার দিকে। তখনও মাইল চারেক পথ বাকি।

নিতাইবাবু দেখেন উইলসনকে। তাকে ভালোই চেনেন নিতাইবাবু,

—আরে তোমাদের সেই পাগলা সাহেব না? এত রাতে এখানে? গাড়ি থামাও। গাড়ি থামাও।

গাড়িটা থামে একটু দূরে। উইলসন খেয়াল করেনি। সে তখনও যাত্রাপালার হিরোর অভিনয় নিয়েই ভাবছে। স্বাধীন ভারত গড়ার স্বপ্ন সেই হিরোর চোখে।

—স্যার। কার ডাক শুনে চাইল উইলসন।

—তুমি বিজন! যাত্রা শুনতে এসেছিলে? দারুণ পালা হে—ভেরি মডার্ন পজিটিভ।

বিজন বলে,

—উঠে আসুন গাড়িতে। হেঁটে ফিরছেন—

উইলসন বলে,

—নোরা কলকাতা গেছে। ভুল করে গ্যারেজের চাবিটাও নিয়ে গেছে, গাড়ি নেই। তাই হেঁটেই ফিরছি।

ওকে গাড়িতে তোলে বিজন।

নিতাইবাবু বলেন,

—তোমার সখ তো দারুণ সাহেব।

হাসে উইলসন। বলে,

—যাত্রাগান আমি খুব লাইক করি। বিজন! এবার দারুণ পালা ধরব অ্যাণ্টনী

ফিরিঙ্গি। নাম শুনেছ অ্যান্টনীর, জাতে পর্তুগিজ হল কিনা বাংলার নামকরা কবিয়াল।

উইলসন নিজের খেয়ালেই ডুবে আছে। তার জগৎ স্বতন্ত্র—অন্য জগতের খবর সে রাখে না। সীমা দেখে ওই বিচিত্র আপনভোলা মানুষটিকে।

কিন্তু বাস্তব জীবন আরও কঠিন। নানা সমস্যা নানা স্বার্থ সেখানের পরিবেশকে সমস্যাবহুল করে তোলে। তার সঙ্গে অনেকের স্বার্থ চাওয়াপাওয়ার প্রশ্ন জড়িত হয়। সেখানে নানা আবর্তের সৃষ্টি করে।

মানুষ সেখানে অসহায়। এক একটি মানুষ সেখানে নিজের ব্যক্তিস্বার্থের প্রশ্ন তোলে। শুরু হয় মতান্তর, নোরা কোনোদিনই উইলসনকে মেনে নিতে পারেনি। এবার সেই এতদিনের পুঞ্জিভূত বিক্ষোভই প্রকাশ পায়। কদিন কলকাতায় থেকে নোরা মিঃ মরিসের সাহায্য অস্ট্রেলিয়ান হাই কমিশনের অফিস থেকে ইমিগ্রেশন-এর ব্যবস্থাও করে এসেছে।

ওই দেশের সরকার কিছু শ্বেতাঙ্গ বংশীয়দের ওখানে বসতি দেবার কথা ভেবেছে। নোরা তাই সুযোগটা পেয়ে গেছে। সুইটিও খুশি হয়েছে। এদেশ ছেড়ে তারা চলে যাবে। তারা যে ইংরেজদের সমগোত্রীয় সেই পরিচয়টাও এবার জানিয়ে দিতে পারবে শিয়ালডাঙার লোকদের।

নোরা ফিরেছে বিজয়ীর মতো। মিঃ মরিসও তাদের প্যাসেজের ব্যবস্থাও করবে। দরকার হলে ওরা এরোপ্লেনেই চলে যাবে অস্ট্রেলিয়ায়। ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ অফিসেও গেছল নোরা-সুইটি। তাদের ডাক্তারি সার্টিফিকেটও করা হয়ে গেছে। পাসপোর্টও পেয়ে যাবে কয়েকদিনের মধ্যে। ওদের ট্রাভেল এজেন্টই সব করিয়ে দিচ্ছে।

সেদিন রবিবার কারখানার ছুটি। উইলসন এখন নতুন নাটক নিয়ে ব্যস্ত। সেই করবে অ্যান্টনী ফিরিঙ্গির রোল। গানও গাইতে হবে। তার জন্য চাই একটা ঢোলওয়ালা। একেবারে গ্রাম্য কাঠি দিয়ে বাজানো হয় সেই ঢোল। তার জন্য গ্রামের দিকেই যাবে কোনো কাঠিগানের আসরে।

হঠাৎ নোরার ডাক শুনে চাইল।

—জরুরি কথা আছে একটু ওয়েট করো।

উইলসন বলে,

—কী বলবে বলো, আমার জরুরি কাজ আছে।

নোরা বলে,

—এটা তার থেকেও জরুরি। আর তোমাকে এবার আমার মতেই চলতে হবে।

—মানে! অবাক হয় উইলসন।

এবার নোরা বলে—আমরা এই পোড়াদেশ থেকে চলে যাব। এতদিন ব্রিটিশ-রাজ ছিল এখানে। এরপর শুরু হয়েছে নেটিভদের রাজ। এখানে অন্যদের মতো ব্রিটিশ বংশধরদের থাকাটা সম্মানের হবে না। অনেকেই চলে গেছেন। আরও অনেকে চলে যাচ্ছেন এখান থেকে। আমি ঠিক করেছি আমরাও চলে যাব।

এবার চমকে ওঠে উইলসন।

—সে কী। এদেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে। এদেশে জন্মেছি, এখানে মানুষ হয়েছি। এই মাটিও আমার মাটি—আমার মা। নো নো আই কান্ট গো।

সুইটি বলে,

—আমরা অস্ট্রেলিয়ায় থাকার ব্যবস্থা করেছি বাবা।

সুন্দর দেশ। ব্রিটিশের রাজ সেখানে। স্টেট সাহায্য পাব। চাকরি পাব বাড়ি—

নোরা বলে,

—তাই ওদেশেই চলে যেতে হবে।

উইলসন বলে—নো নেভার। এদেশ ছেড়ে যাবার মতো কোনো কারণই ঘটেনি। কোম্পানি আমাকে প্রমোশন দিয়েছে। বড় বাংলো পাব। এখানের সবাই আমার বন্ধু।

নোরা বলে এবার কঠিন কণ্ঠে,

—তাহলে ওই বন্ধুদের নিয়ে এই পোড়াদেশেই পড়ে থাকো—আমরা মা মেয়েতে চলেই যাব অস্ট্রেলিয়াতে। তুমি চাও যাবে— না যাও আমরাই যাব, আর তোমাকে ডিভোর্স করব।

উইলসন দেখছে নোরাকে। বহুদিন থেকেই ওরা এক বাংলোয় থাকে মাত্র। দুজনের কোনো সম্পর্কও তেমন নেই। বেয়ারাই দেখাশোনা করে উইলসনকে। নোরা সুইটি ব্যস্ত থাকে ক্লাবে সাহেবদের পার্টি নিয়ে। নোরা আজ চরম পথই নিতে চায়। সুইটিও তাই চায়। তবু বলে সে,

—ড্যাড! ডোন্ট বি সেন্টিমেন্টাল, এখানে কী পাও।

ওদেশে অনেক কিছু পাবে। ভালোবাসা ডলার চাকরি। উইলসনের ওসবের জন্য কোনো মোহ নেই। এদেশ এদেশের মানুষদের এই মাটিকে ছেড়ে অন্যত্র যেতে পারবে না সে। এই তার দেশ। এটাই তার আপনজন। নোরা সুইটির চেয়েও অনেক বেশি আপন।

উইলসন উঠে পড়ে, নোরা অবাক হয়,

—কী। জবাব দিলে না যে, যেতে হলে পাসপোর্ট সার্টিফিকেট এসব করতে হবে। কলকাতায় যেতে হবে। ওদের অফিসে তাহলে কালই চলো। মিঃ মরিসও ওখানেই যাচ্ছেন। সেখানে ওর ওপর মহলে অনেক চেনাজানা। উইলসন কথাটা শুনে অবাক হয়।

—মিঃ মরিসও যাচ্ছেন ওখানে!

—হ্যাঁ।

উইলসন এবার বুঝেছে ব্যাপারটা। এতদিন মিথ্যাই সে ওই মেয়েটিকে নিয়ে ঘর বেঁধেছিল। আজ উইলসন তার সিদ্ধান্ত স্থির করে তোলে। সে বলে,

—তোমরা যখন নিজেরাই সব ঠিক করে ফেলছ আর বাধা দেব না। তোমরা যেতে পারো।

—তুমি তাহলে যাবে না! নোরা বলে,

—হ্যাঁ, আর ডিভোর্সের স্যুট ওদেশে গিয়ে করো। তুমি ইংরেজ বংশধর ওটা সহজেই পেয়ে যাবে।

উইলসন ওর সাইকেল নিয়ে কোনো দেহাতী গ্রামে কাঠিগানের আসরে চলে গেল। ওর মনে হয় নোরা এতদিন পর আজ তাকে মুক্তিপত্র লিখে দিয়ে গেল। আজ সে নোরার স্বামী নয়। সে এদেশের একজন সাধারণ মানুষই। পিছনের এতদিনের পরিচয় ঝেড়ে ফলে এবার এখানের জীবনছন্দে নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারবে।

সাহেবপাড়ায় এখন নেমেছে স্তব্ধতা। সেই হইচই হাসির শব্দ, বিদেশি গানের সুরও শোনা যায় না। দীর্ঘদিনের কর্তৃত্ব ছেড়ে এবার ওদের চলে যাবার পালা শুরু হয়েছে। মিঃ হাভার্ড চলে গেছেন। ডিরেকটরস্ বাংলোর সুন্দর বাগান এখন শূন্য। ওদিকে চলে গেছে রিচার্ডস, হ্যামিলটন আরগন। বাংলোগুলো খালিই পড়ে আছে। দু-একজন গার্ড পাহারা দিচ্ছে।

মরিসও চলে যাচ্ছে। তার বাগানের ওদিকে মরিস তার পোষা দুটো বিলেতি কুকুরকে দাঁড় করিয়েছে। মরিস নিজে অস্ট্রেলিয়া যাবার অনুমতি পেয়েছে কিন্তু কুকুরগুলোকে নিয়ে যেতে পারবে না। মরিস তাই ওদের মুক্তি দিয়ে যাবে। কুকুরগুলো জানে না। মরিস ওদের পাঁচিলের গায়ে দাঁড় করিয়ে নিজের বন্দুক দিয়ে গুলি করে। কাতর আর্তনাদ করে কুকুর দুটো মাটিতে গড়িয়ে পড়ে। মরিসও ফিরে যায় বাংলোতে।

এবার সে নির্বিঘ্নেই চলে যেতে পারবে। নোরা-সুইটির সঙ্গে, উইলসনও বাংলোর বাগানে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। মরিস সাহেবের গাড়িটা এসেছে। নোরা সুইটি চলে যাচ্ছে। তারা যেন আজ উইলসনকে ছেড়েছে চলেছে নতুন সাথীর সঙ্গে।

সুইটি শুধু এগিয়ে আসে। ওর চোখে জল,

—গুডবাই ড্যাডি। টেক কেয়ার ইয়রসেলফ্।

নোরা ডাক দেয় গাড়ি থেকে—কাম অন সুইটি। উই আর লেট।

ওরা চলে গেল। শূন্য বাংলোয় একাই দাঁড়িয়ে আছে উইলসন। মনটা ভার তবু। এতদিনের চেনাজানা ওরা চলে গেল। পরক্ষণেই মনে হয় এই তো চেয়েছিল উইলসন। এবার সে বাধা মুক্ত হয়েছে। বিজন দেখছিল ওই দৃশ্যটা। সে ভাবতে পারে না কেমন স্ত্রী-মেয়ে এইভাবে একটা মানুষকে ছেড়ে দূর দেশে চলে যেতে পারে।

আজ উইলসনের জন্য তার দুঃখ হয়। এগিয়ে আসে বিজন—স্যার! উইলসন চাইল। যেন একজন সঙ্গীই খুঁজছিল সে। বিজনকে দেখে বলে,

—এসো বিজন। বুঝলে আমি সত্যিকার একজন ভালো ঢোল বাজিয়ে পেয়ে গেছি। ভেরি এফিসিয়েন্ট, এবার গান যা জমবে। বিজন অবাক হয়ে দেখছে ওই সাহেবকে। তার চোখে হালকা জলের ধারা চিক চিক করছে। তবু তার মুখে হাসি। গলার সুর হারিয়ে যায়নি।

জীবনকে এভাবে মেনে নিতে পারে কেউ এটা জানা ছিল না বিজনের।

একটি যুগের শেষ হলো শিয়ালডাঙার বুকে। সেদিন অনেক রাত হয়ে গেছে। বিজন ডিউটি সেরে ফিরছে। গভীর রাতে পথ নির্জন দুচারটে আলো জ্বলছে নির্জন পথের ধারে ঘন গাছগাছালির ছায়া অন্ধকারে ঢাকা পথে হঠাৎ সামনে কাকে দেখে চাইল।

খানিক দূরে চলছে একজন বিদেশি। কালো পোশাক—সাবেকী আমলের কোট, মাথায় উঁচু টুপি। বহুকাল আগে বিদেশিরা ওই পোশাক পরতো। এখন ওই ধরনের পোশাক কেউ পরে না। দূর থেকে দেখলে মনে হয় লোকটা যেন কোনো ছবির পাতা থেকে উঠে এসেছে আজ রাতের নির্জন রাস্তায়। জুতোর শব্দ ওঠে খট্‌খট্‌।

হঠাৎ সেই ছায়ামূর্তিটা ডিরেকটার্স বাংলোর মধ্যে ঢুকে গেল। আর তাকে দেখা যায় না। থমকে দাঁড়ায় বিজন। তার সারা দেহে রোমাঞ্চ জাগে। হঠাৎই দেহের সমস্ত রোম ফুলে ওঠে। গায়ে কাঁটা দিতে থাকে। মনে পড়ে নিতাইবাবুর কথা। আরও দু একজন লোকের মুখেও শোনে। আজ সেই জার্মান সাহেব মিঃ ম্যানের ছায়ামূর্তিকে সে দেখছে।

তার কাছে থেকেই অতীতে ইংরেজরা নানা ছল-চাতুরি করে এই কারখানা কেড়ে নিয়ে তাকে পথের ভিখারি করে দিয়েছিল। বাঁচার পথ না পেয়ে মিঃ ম্যান এক পরিত্যক্ত কোলিয়ারির চাণকে লাফ দিয়ে আত্মহত্যা করে জীবন যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়েছিল।

তারপরই কারখানা দখল করে রাজত্ব করছিল এতদিন ইংরেজরা। কিন্তু ইতিহাস কিছুই ভোলে না। কালও নিজের গতিতে চলে আর অতীতের সব আবর্জনা ধুয়ে মুছে যায় কালের প্রবাহে।

আজ সেই দখলদার ইংরেজের দল এদেশ ছেড়ে চলে গেছে। এই কারখানাও চলে গেছে তাদের হাত থেকে। মিঃ ম্যানের আত্মা তাই আজ সেই দিনবদলের পালা দেখে খুশিই হয়েছে।

বিজন এসব ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চলেছে তার কোয়ার্টারের দিকে, তখন রাত গভীর, মনে হয় ওসব তার কল্পনাই, কেনই বা মিঃ ম্যানের আত্মা আসবে এখানে।

বিজন স্বপ্নই দেখছিল। ট্রেন লাইনে তীব্র সিটি বাজিয়ে বিকট শব্দ তুলে একটা মালগাড়ি ছুটে যায়।

এখন শিয়ালডাঙা কারখানা নতুন সাজে সেজে পুরোদমে প্রোডাকশন করে চলেছে। এখন সাহেবপাড়া আর নেই। প্রায় সব লালমুখ বিদায় নিয়েছে। মিঃ জনসন একাই রয়েছেন। এখন নতুন ম্যানেজিং ডিরেকটর এসেছেন একজন, মহারাষ্ট্রের লোক। মিঃ মিত্র, মিঃ রায়, মিঃ প্রধানরা এখন প্রমোশন পেয়েছে। সাহেবদের বাংলোগুলোতে এখন তারাই উঠেছে। আর রয়ে গেছে উইলসন। সে এখন ওয়ার্কস ম্যানেজার। তবে তার যাত্রার দল সমানে সমানে চলছে। বরং এখন বিজন আর

বেশ কিছু ছেলে মিলে তার দলকেই আরও বড় করেছে। নিয়মিত অভিনয় হয় ক্লাবের হলে। উইলসনও অভিনয় করে।

এবার তার চাকরির মেয়াদ শেষ হয়ে আসছে। তবে তার এতে কোনো ভাবনাই নেই। সে ওই পাহাড়তলির জায়গাটাকে একটা আশ্রমে পরিণত করেছে। উইলসন বলে,

—রিটায়ার করে ওখানেই থাকব—ভেরি বিউটিফুল প্লেস। শান্তি—জানো—শান্তি। তার সন্ধান করব এবার। বুঝলে রাইটার, আর দেখব নতুন ভারতের এই কর্মকাণ্ড। উইলসন গেয়ে ওঠে—

"ভারত আবার জগৎ সভায়
শ্রেষ্ঠ আসন লবে।"

উইলসন ভারতকে সত্যিই ভালবাসে। এখানে থাকার জন্য সে তার স্ত্রী-মেয়েকেও ছেড়েছে। আজ নিঃসঙ্গ জীবনে ওই আশাই তার একমাত্র অবলম্বন।

রতন এখন আরও অনেক কিছু পেতে চায়। দেখছে সে মোহনলালকে। এখন এই কারখানাই নয় ওদিকে গড়ে উঠেছে সার কারখানা। টাউনশিপ। মোহনলালের দল সেখানের কয়েক হাজার শ্রমিককেও তাদের ইউনিয়নের সভ্য করেছে। ফলে এখন দুটো কারখানা থেকেই মাসে তাদের যে টাকা ওঠে সেটা একটা জমিদারির আয়ের সমান। মোহনলালও তেমনি জমিদারির মতই ঠাটবাট নিয়ে চলে, বনানীও এখন এখানের নেত্রী হয়ে উঠেছে। প্রসাধন করে গাড়িতে চেপে দামী শাড়ি পড়ে মিটিং-এ ভাষণ দিতে যায়। প্রায়ই দাবিদাওয়া নিয়ে মিটিং মিছিলও করে। ওদের নীতি আরও দিতে হবে। এমনি পাইয়ে দেবার রাজনীতি করে তারা দল ভারী করেছে।

মোহনলাল এখন মনে মনে চটেই আছে। নিতাইবাবুদের দলও এই কারখানার শ্রমিকদের নিয়ে সংগঠন করেছে এখন।

এখন মোহনলালও তার দলের অফিস করেছে বাজারের কাছেই। টেবিল চেয়ার নিয়ে বসে বেশ কিছু ছেলে। আর ওদিকে নিতাইবাবুদের দলের অফিস। সেটা আরও বেশি ঝকঝকে করে সাজানো।

বনানী এখন সার কারখানার শ্রমিক সংগঠন চালায়। স্বাধীনতা পর এই শিয়ালডাঙার রূপও বদলেছে। এখানের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে গড়ে উঠেছে সার কারখানা। সেখানে নতুন টাউনশিপ গড়ে উঠেছে। এখন ভদ্রঘরের ছেলেরাও এসেছে ওইসব কারখানায়। তারাও শ্রমিক হয়ে উঠেছে, কোন কাজ না পেয়ে।

সেই দেশভাগের পর জনস্রোতের ঢল নেমেছে। এখন শুধু আর কলকাতাই নয়। এদিকের শিল্পনগরীতেও সেই উদ্বাস্তুদের ভিড় জমেছে। তারা যে যেখানে পেরেছে মুক্ত প্রান্তরে বসে পড়েছে, ঘরবাড়ি বানিয়েছে। শহরে তাদের আনাজপত্র বেচছে। কেউ বা রিকশা চালাচ্ছে। কেউ কেউ এইসব কারখানায় কাজ করছে। ওই পরিত্যক্ত প্রান্তরে গড়ে উঠেছে নতুন জনপদ।

মোহনলালও আসে এইসব জনপদে। তাদের রেশন কার্ড করানোর কাজ করে। বনানীও ঘোরে এইসব কলোনিতে। সে এইসব নতুন গড়ে ওঠা বস্তির মেয়েদের

নিয়ে মাঝে মাঝে শোভাযাত্রা করে ক্লাব অফিসে যায়। তাদের দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন করে।

রতন এখনও নিতাইবাবুর দলেই রয়েছে। সে জানে তার ব্যবসা এখন ভালোই চলছে। ওই স্ল্যাগের বাজারও বেশ চড়া আর কোলিয়ারির কয়লা পাচারের কাজও চলেছে। সেগুলো চালাতে গেলে এখন তার একটা রাজনৈতিক ছত্রছায়ার দরকার। তাই সে এখন নিতাইবাবুর দলের এম. এল. এ. বসন্তবাবুর খুব কাছের লোক হয়ে আছে।

এখন কারখানার পরিবেশও বদলেছে। সেই ইংরেজ প্রভুরা আর নেই। এখন উইলসন জনসনের মতো দু'একজন অফিসার রয়েছেন। তবে উপরের তলায় এসেছে এদেশের লোক। মিঃ মিত্র, মিঃ রায় এখন বড় বাংলোতে উঠেছেন। মিঃ মিত্র প্রমোশন পেয়েছে—তিনি ওয়ার্কস ম্যানেজার। কারখানার একটা দায়িত্বপূর্ণ পদেই রয়েছেন। আর জেনারেল ম্যানেজার এসেছেন দিল্লির ওদিক থেকে মিঃ আগরওয়াল।

মোহনলালের দল নিজেদের একছত্র প্রতিষ্ঠা কায়েম করতে চায়। তারা কারখানার মাঠে শ্রমিকদের নিয়ে বিশাল জনসভাই করে।

মিঃ মিত্র নিজের চেম্বারে এয়ারকুলার চালিয়ে কাজ করছেন। গ্রীষ্মের দাবদাহ থেকে কর্তাদের মাথা ঠাণ্ডা রাখার জন্য এখন এইসব আধুনিক মেসিন বসিয়েছে। আগে ব্রিটিশদের আমলে দরজায় খসখসের পুরু পর্দা দিয়ে পিচকারিতে জল দিয়ে ভিজিয়ে রাখা হতো। আর ঘরে ছিলো টানা পাখার ব্যবস্থা। এখন ঠাণ্ডা মেশিন চলে। মিঃ মিত্র কাজ করছেন এমন সময় ঘরে ঢোকে মোহনলাল।

—নমস্কার স্যার!

মিঃ মিত্রও মোহনলালকে চেনেন। একটা শ্রমিক সংগঠনের হয়ে কাজ করে মোহনলাল। এককালে এই কারখানার পুরোনো কর্মী, তাই চেনাজানা। অবশ্য মিঃ মিত্রও জানে এখানের শ্রমিকদের দুটো দল আর মোহনবাবুর দলের জোর এখন কিছু কম। সেখানে রতনদের দলের প্রভাবই বেশি। কোনো দলকে হাতে রাখতে হবে সেটা জানে মিঃ মিত্র।

তবু মিঃ মিত্র এখন উচ্চপদে উঠে আরও কিছু কৌশল শিখেছেন। তাই মোহনলালকে বলেন,

—আরে মোহনলালবাবু যে! আসুন—

মোহনলাল জানে সে এখন একজন সাধারণ লেবার নয়—এখানের নেতা, তারও কিছু পাবার অধিকার যেন জন্মে গেছে। নিজেই চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে। ঘামে ভেজা পাঞ্জাবি। সাহেবের ঘরে এয়ার কুলারের ঠাণ্ডা হাওয়ায় তৃপ্ত হয়ে বলে,

—না বড্ড গরম পড়েছে। আগে এসব ছিল না। দেশ স্বাধীন হবার পর আমরাও বেশ অপব্যয়ী হয়ে উঠেছি। জনগণের পয়সা ঠিক কাজে ব্যয় করছি না। কারখানার নতুন এক্সটেনশন হবার প্ল্যান হবে শুনেছিলাম।

ওর কথায় যে একটু জ্বালা লুকিয়ে আছে সেটা মিঃ মিত্র বুঝেছেন। দেশ স্বাধীন হবার পর থেকে একদল নাকি জেনেছে দেশে শ্রমিক আর কৃষক ছাড়া আর কেউই

নেই। এদেশটাকে তাদেরই হাতে তুলে দিতে হবে। না পারলে দেশের উন্নতি হবে না। এসমস্ত ভাষণও শুনেছেন মিঃ মিত্র মোহনলালের মুখে।

মিঃ মিত্র শুধোন,

—ওসব প্ল্যান হায়ার অথরিটি স্যাংশন করার কথা ভাবছেন।

এর মধ্যে অবশ্য বেয়ারা মোহনলাল আর সাহেবকে দুটো গ্লাসে ঠাণ্ডা পানীয়ও দিয়ে যায়। মোহনলাল এবার কাঁধে ঝোলানো ঝুলি থেকে খাম বের করে এগিয়ে দেয় মিঃ মিত্রের হাতে।

—আমাদের ইউনিয়ন থেকে একটা স্মারকলিপি দিতে এসেছি স্যার। মোল্ডিং ফোর্জিং ওয়ার্কশপের শ্রমিকদের বাড়তি কাজের জন্য পিস্ রেট-এর দাম দিতে হবে। আর প্রডাকশন বোনাস বাড়াতে হবে। সাহেবদের আমলে তারা প্রদেশের শ্রমিকদের নানা ভাবে শোষণ করেছে, এখন আমাদের সরকার। শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি দিতেই হবে।

মিঃ মিত্র বলেন কাগজটা দেখে,

—তারা তো বোনাস অন্য সকলের মতোই পাচ্ছে। আর বেশি দেবার কথা বলছেন। স্বাধীন সরকারকে তো দেশ গড়তে হবে। এত এত কারখানা হচ্ছে। এর খরচা আছে, সরকারেরও প্রচুর টাকা বিলিয়ে দেবার সাধ্য নেই। মোহনলাল বলে,

—এ তাদের ন্যায্য দাবি। এই দাবি না-মিটলে তারা ধর্মঘট করবে।

—ধর্মঘট করবে? মিঃ মিত্র অবাক হন।

এসময় কারখানার প্রচুর অর্ডার রয়েছে। সারা মধ্যপ্রাচ্যে পেট্রলের খনিগুলোতেও জোরকদমে কাজ চলছে। পাইপ লাইন বসেছে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে। তাই আরব দুনিয়া থেকে কোটি কোটি টাকার অর্ডার রয়েছে। এসময় কারখানায় গোলমাল হলে সব কিছু তছনছ হয়ে যাবে। তারা বিদেশি কোম্পানি ঠিকমতো মাল না-পেলে তারা অন্যত্র ওই কোটি কোটি ডলারের মালের অর্ডার দেবে। ভারত থেকে রপ্তানি বন্ধ হয়ে যাবে। কারখানারও ক্ষতি হবে সন্দেহ নেই।

এসব দাবির কোনো যুক্তি নেই। একবার এসব অন্যায় দাবি মেনে নিলে এরাও পেয়ে বসবে। মিঃ মিত্র তাই বলেন,

—দেখুন, আমি এসব বোর্ড মিটিং-এ পেশ করব। তারপর যা ভালো বোঝেন করবেন। আমি চেষ্টা করব।

মোহনলাল বলে,

—করুন; তবে আমাদের কথাটা জানিয়ে গেলাম। নমস্কার—

মোহনলাল বের হয়ে যায়।

মিঃ উইলসনও প্রমোশন পেয়েছে। লোকটার জনপ্রিয়তা অনেক। মিঃ মিত্রও জানেন উইলসনকে শ্রমিকরা ভালোবাসে। উইলসনও দেখছে মোহনলালকে। বলে,

—ওই নেতা এখানে!

মিঃ মিত্রও উইলসনকে বন্ধুর মতো দেখেন। ওকে ওদের দাবির কাগজখানা দিয়ে বলে,

—দেখুন ওদের দাবির বহর। দেশ স্বাধীন হয়েছে তাই ওদেরও দুহাত ভরে

দিতে হবে।

উইলসন বলে—তাই দেখছি। ওরা কি চায় না যে একটু পরিশ্রম ত্যাগ করে আগামী দিনের জন্য দেশকে গড়ে।

মিঃ মিত্র বলেন,

—এসব কথা ওরা ভাবে না। ওই নেতারাই পাইয়ে দেবার কথাটাই শোনায় শ্রমিকদের। তাদের কাজ করার কথাটা বলে না।

উইলসনও ভাবছে কথাটা। সে বলে,

—এইসব যদি শেখানো হয়। আর এইভাবে চলে তাহলে বিশ বছরের মধ্যে দেশের শিল্প নষ্ট হয়ে যাবে।

বনানী কিছুদিন ধরেই দেখছে মোহনলালকে। লোকটা এখন যেন বদলে গেছে। এখন শ্রমিকদের অফিসে সন্ধ্যার পর কিছুক্ষণ বসে বের হয়ে যায়, কোলিয়ারির দিকে। ওখানে এখন নতুন করে ঘাঁটি গেড়েছে মোহনলাল। কার্তিকবাবুও এখন তার দোসর। কার্তিকবাবু জানে মোহনলালকে সামনে রেখে সেও তার কাজ গুছিয়ে নেবে।

কোলিয়ারির মালিক আনন্দবাবুর দু'তিনটে কোলিয়ারি। আনন্দবাবুরা নিতাইবাবুর একটা কোলিয়ারি কিনেছে—এদিকে তাদের দু'তিনটে কোলিয়ারি। কার্তিকবাবু তাদের কোলিয়ারির কয়লা তোলে। তাদের কোলিয়ারির কয়লার স্টকও বেড়ে গেছে অনেক। রোজ সারা অঞ্চল থেকে আসে তিন-চারশো ট্রাক— এইদিক থেকে নানা অঞ্চলে নিয়ে যায়। বিভিন্ন কোলিয়ারি থেকে তারা কয়লা নিয়ে যায় ট্রাক বোঝাই করে। নগদ দামে।

আনন্দবাবু বলেন,

—কার্তিকবাবু! এত কয়লার স্টক জমে গেছে। বিক্রি করতে তো হবে। লাখ লাখ টাকার মাল পড়ে আছে।

কার্তিকবাবু জানে কৌশলটা। বলে,

—ওসবের ব্যবস্থা হয়ে যাবে স্যার। তবে কিছু খরচা করতে হবে। কোলিয়ারির কয়লা সব বিক্রি করিয়ে দেব। তিরিশ হাজার টাকা যদি দিতে পারেন।

আনন্দবাবুও শেষ অবধি রাজি হয়ে যান।

কার্তিকবাবু এখনও রতনের সঙ্গে মেলামেশা করে কিন্তু মাখামাখিটা তার মোহনলালের সঙ্গেই বেশি। মোহনলাল কোলিয়ারি শ্রমিকদের নিয়ে এখন দল করেছে। সপ্তাহের শেষে তার দলের লোকেরা চাঁদা আদায় করে। মোহনলাল তাদের হয়ে মালিকদের সঙ্গে দাবিদাওয়া নিয়ে কথা বলে, কিছু টাকাও পাইয়ে দেয় শ্রমিকদের।

কার্তিকবাবু মোহনলালকে মাঝে মাঝে তার বাগান বাড়িতে আনে। মদ আর মেয়েছেলের নেশাও ধরিয়েছে কার্তিকবাবু ওকে। মোহনলাল যতদিন কারখানায় কাজ করতো ততদিন এসব পথে আসেনি—কেউ তাকে এসব জোগানও দেয়নি। এখন মোহনলাল দেখছে মাসে তার আমদানিও কম নয়। অবশ্য কিছু টাকা

একনম্বরী রসিদ করে দেয়, আর দলের ফান্ডে সেটা ঠিকঠিক জমাও দেয়। বাকিটা যায় তার পকেটে। সেটাও কম নয়। কার্তিকবাবু এখন মোহনলালকে এসব নিবেদন করে নিজের কাজ সারে। আজও বিলেতি মদ আর যৌবনবতী একটা মেয়েকে এনেছে কোনো ধাওড়া থেকে। টাকার বিনিময়ে এখন বেশ কিছু মেয়ে এখানে এসব ব্যবসা করে।

কার্তিকবাবু জানে মোহনলালের চোখে এবার নেশার রঙ ধরেছে। কার্তিক ওকে হাজার দশেক টাকা দিয়ে বলে,

—মোহনবাবু, এলাকার আট-দশটা কোলিয়ারির নেতা তুমি। আনন্দবাবু তোমায় আরও টাকা দেবে। ওর কোলিয়ারির মাল বিক্রি করে দিতে হবে। কটা দিন অন্য কোলিয়ারিতে স্ট্রাইক করিয়ে দাও। ওদের মাল যেন তোলা না হয়। ব্যস, মালিক ওদেরও কিছু দেবে। আর তুমিও পাবে তিরিশ হাজার টাকা, বিলেতি মদ আর একটা পেটি মেয়েছেলেও।

মোহনলাল নেশা করলেও মাতাল হয় না। টাকাটা নিয়ে বলে বাকি টাকা কবে দেবে?

—অন্য কোলিয়ারিতে ধর্মঘট হলেই দেব।

কদিন পরেই দেখা যায় মোহনলালের নেতৃত্বে কয়েক হাজার মালকাটা শ্রমিক সারা এলাকা ঘুরে বেড়াচ্ছে। হাটতলায় মাইক লাগিয়ে মোহনবাবু ভাষণ দেয়। আমাদের দাবি না মানলে কোলিয়ারির কাজ বন্ধ হবে। আমাদের দাবি মানতে হবে—

শ্রমিকরাও জোরে জোরে চিৎকার করে।

—দেনে হোগা। মাননা হোগা—

তখন কোলিয়ারি ছিল মালিকদের হাতে। তাদের মাইনেও বেশি ছিল না। ছিল না চাকরির কোন নিরাপত্তা। তাই গরিব শ্রমিকদের তাড়ানোও ছিল সহজ কাজ। মোহনলাল সেই কাজটাই নিপুণভাবে করে থাকে এখন।

ওই এলাকার অন্য সব কোলিয়ারির কাজ বন্ধ হয়ে গেল। থেমে গেল পিট হেড গিয়ারের চাকা। বয়লারও চলে না। মালকাটাই বন্ধ। ব্যানার লাগিয়ে স্টেজ মিটিং হয়।

আনন্দবাবুদের কোলিয়ারিগুলো চলছে। তাদের শ্রমিকদের নাকি কোনো দাবি দাওয়া নেই। ওদিকে অবশ্য বাবুদের কোলিয়ারিতে তখন পুরোদমে কাজ চলছে। বাইরের কয়েক হাজার ট্রাক অন্য কোনো কোলিয়ারিতে কয়লা না পেয়ে এবার এসে ভিড় করেছে এদের কোলিয়ারিতে আর এখানের কয়লা পড়তে পাচ্ছে না।

কয়েকদিনের মধ্যেই বিশাল পরিমাণ কয়লা উবে গেল। মায় কয়লার গুঁড়ো অবধি। কার্তিকবাবু সব খবরই রাখে। সেই রাতে মোহনলালকে তার বাগানে এনে আপ্যায়িত করে বাকি টাকাটার বান্ডিল তুলে দেয়।

পরদিন থেকেই মোহনলাল ঘোষণা করে,

—মালিকপক্ষ আমাদের দাবি নিয়ে আলোচনা করতে রাজি হয়েছে। এ আমাদের

জিত। সুতরাং ভাইসব, তোমরা যে যার কাজে গিয়ে যোগ দাও।

আবার অন্য সব কোলিয়ারির কাজ শুরু হয়। অবশ্য কয়েকমাস পরই আবার অন্য মালিকের কাছে প্রণামী পায়। আবার বেশ কিছু কোলিয়ারির কাজ বন্ধ হয়ে যায়। কোলিয়ারির শ্রমিকদের অভাবও মেটে না। তাই মোহনলালও স্বমহিমায় টিকে থাকে এদের রাজ্যে ছারপোকার মতো এদের রক্তশোষণ করতে।

বনানী দেখছে এখন মোহনলাল টাকার গন্ধ পেয়ে বদলে গেছে। রাতে মাতাল হয়ে বাড়ি ফেরে। পকেটে তাড়াবন্দি নোট। অবশ্য বনানী এতদিন তার ওই টাকাগুলোই হাতিয়েছে আর মুখে বলেছে,

—এসব কোরো না। শ্রমিকদের হয়ে কাজ করছো তাদের দিকটাও তো দেখবে। মোহনলাল মদের নেশায় তখন চুর। সে বলে,

—দেখি ওদেরও দেখি। নিজেকেও দেখি। তুমিও দ্যাখো নিজেকে। সেজেগুজে ওই সার কোম্পানির অফিসারের সঙ্গে এত ঘোরো কেন? কিছুই বুঝি না ভাবছ?

বনানী তার কারখানার শ্রমিকদের কথাও ভাবে। তাই ওই কোম্পানির লেবার অফিসারকে নিয়ে ঘোরে কারখানায়, টাউনশিপে। ওদের জন্য স্কুল হাসপাতাল এসবের ব্যবস্থাও করতে চায়। তাই বনানী ব্যস্ত থাকে। মোহনলালের কথায় বনানী বলে,

—এতদিন তো এসব কথা বলোনি।

মোহনলাল বলে,

—এতদিন এসব নষ্টামি দেখিনি। এখন তোমার বাড় দেখছি।

—এখন কী দেখলে? আমার কথা না ভেবে এবার নিজের কথাই ভাব। তুমি মেয়েছেলে নিয়ে নষ্টামি করছ। টাকা নিয়ে লেবারদের ক্ষতি করছ।

মোহনলাল গর্জে ওঠে,

—চোপ! একটা কথা বললে তোর মুখ ভেঙে দেব। পাজি, শয়তান মেয়েছেলে কোথাকার।

লাফ দিয়ে এসে বনানীর গলাটা টিপে ধরে শক্ত হাতে। বনানীর দম বন্ধ হয়ে আসছে। কোনোমতে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ওই মাতালটার দিকে ক্রুদ্ধ চাহনিতে চেয়ে অন্য ঘরে চলে গেল।

মোহনলাল তখনও ফুঁসছে।

—আমাকে শাসানো হচ্ছে। পথ থেকে তুলে এনে রাজরানী করে রেখেছি। না হলে কি মুরোদ তোর। তোকে চেনে কে?

বনানী শুনছে ওর কথাগুলো।

অনেক স্বপ্ন নিয়ে সে মোহনলালকে ভালবেসেছিল। সেদিন সত্যিই মোহনলাল ছিল ভালো মানুষ। বিনাস্বার্থে শ্রমিকদের জন্য কাজ করেছে, তাদের মঙ্গলের কথা ভেবেছে।

এবার লোকটা টাকা আর ক্ষমতার স্বাদ পেয়ে বদলে গেছে। বনানীও বুঝেছে ওর এই লোভ লুঠপাট আরও বাড়বে। তাই বনানী ভাবে এবার তার পথও নিজেকেই দেখে নিতে হবে।

মোহনলাল নেশা করলেও মাতাল হয় না। বনানীর কথাটা এবার সেও ভেবেছে। বেশ কিছুদিন ধরেই দেখছে বনানী এখন রতনদের অফিসেও যায়। ওই সার কোম্পানির কারখানায় অবশ্য রতনরা ঢুকতে পারেনি। নতুন কারখানা গড়ে উঠেছে আর এখানের শ্রমিকরাও বেশির ভাগ ওই পূর্ববঙ্গ থেকে আসা লোকজন এখানের যারা আছে তারাও ওদের সঙ্গে মিশে গেছে। আর তারা চায় এখন নতুন কারখানাকে গড়ে তুলতে। তাই বনানীও সেকথা বলে।

ওদের মধ্যে বনানী খুবই জনপ্রিয়। রতনরাও বনানীর কথা ভেবেছে। রতন এখন রাতের তার ওই কাজের ভার দিয়েছে জীবনের উপর। ছেলেটার সাহস আছে আর আছে উপস্থিত বুদ্ধি। ঠাণ্ডা মাথায় সব কাজই বেশ হিসাব করেই করে। এদিকে রতনের ভাগ ঠিকই আসে আর বাইরে তার ভাবমূর্তিও বজায় রয়েছে।

সেদিন রতন গেছে সার কারখানার টাউনশিপে তারই এক চ্যালা ওখানের বাজারে একটা দোকানের জন্য দরখাস্ত দিয়েছে। আসবার সময় মাঝরাস্তায় হঠাৎ ঝড় শুরু হয়। এদিককার ঝড়ের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। বসন্তের পরই শুরু হয় ঝড়ের তাণ্ডব। দাবদাহে জ্বলছে সারা আকাশ বাতাস মৃত্তিকা। প্রান্তরে রোদ লি-লি করে লেলিহান শিখায়। রুক্ষ প্রান্তরে শাল মহুয়ার গাছগুলো নিঝুম হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে অসহায় প্রাণীর মতো। ঈশান কোণে হঠাৎ ভেসে ওঠে কালো একটুকরো মেঘ। বাতাসও স্তব্ধ হয়। কালো মেঘখানা আকাশের কোণ ঢেকে ফেলে হঠাৎ। তারপরই সেই কালো মেঘের রঙ বদলে লাল হয়ে যায়।

এদিকের মানুষ জানে দূর দিগন্তে শুরু হয়েছে ঝড় আর লাল ধুলোর রাশ আকাশে উঠে কালো মেঘকে আগুনের রঙ ধরিয়েছে। একটা শোঁ শোঁ শব্দ ওঠে। তারপরই ধোঁয়া আর ঝড়। দমকা ঝড়, সঙ্গে বালুকণা পাথরের কুচি। সেগুলো গায়ে বেঁধে ছররার মতো।

রতন মোটর বাইক নিয়ে ফিরছিল ওদিকের কোনো কোলিয়ারি থেকে। ভেবেছিল ঝড়ের আগেই পৌঁছে যাবে শিয়ালডাঙায়। কিন্তু ঝড় যে হঠাৎ এইভাবে এসে পড়বে তা ভাবেনি।

এই ঝড়ের সময় ধুলোবালির জন্য চোখ খুলে রাখা যায় না। আর ঝড়ের তোড়ে বাইকের গতিও বদলে যাবে। তাই রতন বাইক থেকে নেমে একটা উঁচু খাগরের আড়ালে গিয়ে বসে পড়ে যাতে ঝড়টা তার মাথার উপর দিয়ে বয়ে যায়।

সেসময় সে দেখে ওদিক থেকে একটা মেয়েও প্রায় বিবস্ত্র হয়ে ছুটে চলেছে ঝড়ের থেকে বাঁচার জন্য আশ্রয়ের সন্ধানে। তার শাড়ির আঁচল উড়ছে। পাথরে ঠোক খেয়ে মেয়েটি ছিটকে পড়ে। রতন ছুটে গিয়ে ওকে ধরে কোনোমতে টেনে ওই উঁচু খাগরার আড়ালে নিয়ে গিয়ে বলে,

—মাথা নীচু করে বসে থাকো। শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মুখ ঢেকে নাও। না হলে চোখে ধুলো ঢুকবে।

কোনোমতে দুজনে ঘনিষ্ঠ হয় ওই উঁচু আলের আড়ালে বসে। এতক্ষণ বাদে রতন চিনতে পারে বনানীকে। তাকে ভালোই চেনে রতন। মোহনদার বাড়িতেও যাতায়াত করে। বনানীও রতনকে চিনতে পারে—তুমি!

ঝড়ের গর্জন মিশেছে মেঘের গর্জন। লাল ধুলোর বন্যা নেমেছে বাতাসে। কোনোমতে সেই ঝড় থেকে বাঁচার চেষ্টা করেছে। ওদিকে ঝড়ের দাপটে একটা মহুয়া গাছের ফুলের কুড়িসমেত বিশাল ডাল ভেঙে ঝড়ের বেগে তাদেরই মাথার উপর দিয়ে বয়ে যায়। রতন বনানীর ঘাড়টা ধরে নীচু করে দেয় যাতে ওই ডালের ঝাপটা না লাগে। প্রচণ্ড শব্দে মোটা ডালটা ওদের উপর দিয়ে ছুটে গিয়ে ওপাশে আছড়ে পড়লো।

তারপরই নামে বৃষ্টি। আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামে। সেই সঙ্গে চলে ঝড়ের মাতন। উঠে দাঁড়ালে যেন ছিটকে ফেলে দেবে। ওরা ওখানেই ভিজতে থাকে। সন্ধ্যার আঁধার নামে। বনানীও ভিজছে তার যৌবনপূর্ণ দেহে শাড়িটাও লেপটে গেছে। মুখখানা তার বর্ষার জলে ভেজা সতেজ পদ্মকুঁড়ি। রতন যেন এক নতুন বনানীকে দেখছে। বনানী তাই দেখে তার বর্ষণসিক্ত দেহটাকে যেন ঢাকার বৃথা চেষ্টা করে।

ঝড় তখন থেমেছে। তবে বৃষ্টির দাপট তখনও কমেনি। প্রান্তরের বুকে তখন গেরুয়া ঢল নেমেছে। রতন বলে,

—চলো, এবার কোনোমতে ফেরা যাক্।

বনানী বলে,

—বাস রাস্তাও দূরে আর বাসও বন্ধ হয়ে গেছে।

রতন বলে,

—বাসের দরকার নেই। বাইক আছে তোমায় পৌঁছে দিয়ে যাব।

কোনোমতে মোটর বাইকটা তুলে বারকতক চেষ্টা করায় স্টার্ট নেয় সেটা। বনানীকে পিছনে বসিয়ে রতন চলেছে ওই প্রান্তর দিয়ে। তখন প্রান্তরে জলের স্রোত বইছে। খানাখন্দও বোঝা যায় না। মোটর বাইক চালাতে হচ্ছে সাবধানে তবু চলছে বাইকটা। বনানী ওই ভিজে দেহ নিয়ে রতনকে ধরেছে। নাহলে ছিটকে পড়বে।

রতনের দেহমনে বনানীর নিবিড় স্পর্শ এক দুরন্ত ঝড় তোলে।

ঝড়ের তাণ্ডবও দেখা যায় টাউনশিপে। গাছের ডাল ভেঙেছে, তার ছিঁড়ে পড়ে আছে। পথে ঝরা পাতার রাশ। ঢালপথে জলের ধারা নেমেছে। পথও জনাকীর্ণ প্রায়। ব্লাস্ট ফার্নেসের ক্রুদ্ধ গর্জন ওঠে। ওদিকে বড় বড় শেডে তখন কাজ সমানে চলেছে, তারই নানা অদ্ভুত শব্দ ভেসে আসে।

বনানীদের বাড়িটা বাবুপাড়ার পিছনে। সাবেকি বস্তিতে। মোহন রিটায়ার করার পর কোম্পানির কোয়াটার ছেড়ে দিয়ে এদিকেই একটা বাড়ি ভাড়া করে আছে। মোহনলাল বাসায় এখন ফেরেনি সে তার কাজে আটকে গেছে। বনানীর কাছে একটা চাবি থাকে। বনানী চাবি খুলে ঘরে ঢোকে।

পাথুরে এলাকা। বৃষ্টির পরই এখানের তাপমাত্রা এক ধাক্কাতেই অনেকখানি কমে যায়। বেশ ঠাণ্ডাই পড়ে।

বৃষ্টিতে ভিজে কাঁপছে রতন। বনানী বলে,

—একটু বসো কফি করছি। ঠাণ্ডায় হাত-পা কনকন করছে।

রতনেরও মনে হয় এসময় এককাপ কফি পেলে ভালোই হবে। সে বলে,

—আবার তোমাকে কষ্ট দেব।

বনানী বলে,

—কষ্ট কি? আমিও তো খাব। দেরী হবে না।

গ্যাসে জল চাপিয়ে শাড়িটা বদলে নিয়েছে। তারপর কফি নিয়ে আসে রতনের জন্য। বনানী বলে,

—আজ ঝড়ের মধ্যে তোমায় না পেলে কী যে হতো।

রতন হাসে। বলে,

—দারুণ একটা নাটকই হয়ে গেল।

হঠাৎ ঢুকছে মোহনলাল। এর মধ্যে সে বেশ কিছুটা মদও গিলেছে। আজ কার্তিকবাবুর কাছে কিছু টাকা পাবার কথা ছিল। একটা গাড়ি কিনবে। কিন্তু টাকা পায়নি মেজাজটাও ভালো নেই মোহনের। ঘরে ঢুকে রতন বনানীকে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে কথা বলতে দেখে চমকে ওঠে। বনানী বাইরে যে কিছু একটা করছে সেটা সে আন্দাজ করেছিল। বনানীর ব্যবহারে সে ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। তার ওপর তার প্রতিপক্ষ ওই রতনকে বাড়িতে এনে তার অনুপস্থিতিতে যে এমন নাটক চলে সেটাও বুঝে মোহনলাল চটে ওঠে।

রতনই বলে ওঠে,

—এসো মোহনদা। উঃ যে ঝড়ে পড়েছিলাম আজ আমি আর বৌদি।

মোহনলাল বলে,

—তা তো দেখছি। তা নাটক তো বেশ জমে উঠেছে দেখছি। তা আমার ঘরে কেন? পাগলা উইলসন সাহেবের যাত্রার দলেই ভিড়ে যাও এস্তার রোল পাবে এসটেজে।

রতন ওসব কথায় কান দেয় না। বলে,

—চলি।

বের হয়ে যায় রতন। এবার মোহনলাল দেখতে থাকে বনানীকে—এগিয়ে আসে সে। কঠিন কণ্ঠে বলে—

—এই নাটক কতদিন চলছে? ওই হতছাড়া দালাল ব্যাটার সঙ্গে দেখি তোর খুবই মাখামাখি। আমি কি ন্যাকা কিছুই বুঝি না?

বনানী দেখছে মোহনলালকে। লোকটা এখন ঘোরতর স্বার্থপর আর নির্মম হয়ে উঠেছে। বনানী বলে,

—এখন তোমার মাথার ঠিক নেই। চেঁচামিচি না-করে শুয়ে পড়বে।

বনানী কথা না বাড়িয়ে ভিতরে চলে যায়। ক্রমশ মোহনলালকে আর যেন সহ্য করতে পারছে না বনানী। মনে হয় এবার একটা পথ তাকে বেছে নিতে হবে। নিজের পায়ের দাঁড়াতে হবে তাকে। এতদিন ধরে যার উপর ভরসা করেছিল, সেই মানুষটাও আজ অনেক পাবার লোভে মির্মম, অমানুষ হয়ে গেছে।

মোহনলালও এবার তার প্রতাপ প্রতিষ্ঠা কায়েম করতে চায়। তাই এবার মোহনলাল ওই ফোর্জিং আর মোলডিং শপের শ্রমিকদের নিয়ে জোর মিটিং করে ঘোষণা করে,

—কর্তৃপক্ষ আমাদের দাবি মানতে চায় না। তারা এই ওয়ার্কশপ থেকে লাখ লাখ টাকা মুনাফা লুটছে। অথচ শ্রমিকদের বাড়তি পয়সা দিতে নারাজ। তাই আমরা সামনের সোমবার থেকেই ঘর্মঘট করব।

মোহনলালের কথায় তার সমর্থক দল চিৎকার করে—সোমবার থেকে ধর্মঘট চলবে চলবে।

তাদের চিৎকারে কারখানার সামনের মাঠ ভরে ওঠে।

মিঃ মিত্রের কাছে খবরটা পৌঁছে দেবার লোকের অভাব নেই। তারাও খবর পৌঁছে দেয়। ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে মোহনবাবু।

মিঃ মিত্র জানেন আগে ইংরেজদের আমলে কারখানায় ধর্মঘটের নামও কেউ করেনি। মিঃ মিত্রও এখন এখানের নেতাদের কাছের লোক। অবশ্য এর জন্য রীনার ভূমিকাও কম নেই। রীনা আগেই বাবুদের ক্লাবের অনুষ্ঠানে গান গাইত। বিজন ও উইলসনের যাত্রা নাটক দেখতে যেতো। সেবার কর্ণার্জুনে রীনা নিয়তির পার্টটাই করে। তার গান নাটকের অভিনয় অন্য মাত্রা এনেছিল। উইলসন বলে—

—মিসেস মিট্টার তুমি সত্যিই জেনুইন আর্টিস্ট।

রীনা ক্রমশই বাবুদের রিক্রিয়েশন ক্লাবের সক্রিয় সভ্য হয়ে ওঠে। আর স্বাধীনতার পর এবার মিঃ মিত্র ওয়ার্কস ম্যানেজার হয়ে বুঝেছিল কারখানার প্রোডাকশন বাড়াবার জন্য বাবুদেরও হাতে রাখতে হবে। তাই কোম্পানির থেকে বিশেষ গ্রান্ট করিয়ে বাবুদের ক্লাবের ভোলও বদলে দিয়েছে। এখন সেখানে বেশ বড় লাইব্রেরি হয়েছে। ওদিকে একটা কালচারাল ইউনিটও করেছে। সেখানে উইলসন বিজনরা নাটক করে, এছাড়া সাহিত্যসভা আলোচনা কবিতাপাঠের আসরও বসে।

মাঝে মাঝে কলকাতা থেকে নামী-দামি শিল্পীদের নিয়ে এসে গানের জলসা হয়। এ ছাড়া ফুটবল গ্রাউন্ডেরও উন্নতি করা হয়েছে। মিঃ মিত্র, মিঃ রায়, মিঃ প্রসাদরাও খেলাধুলার পৃষ্ঠপোষকতা করেন। কারখানার নিজস্ব ফুটবল টিমও গড়ে উঠেছে।

বিজনও চেনে মিসেস মিত্রকে। সীমাও আসে মাঝে মাঝে লাইব্রেরিতে। বিজনের সঙ্গে দেখাও হয়। বিজনই রীনাকে পরিচয় করিয়ে দেয় সীমার সঙ্গে। সীমাও গানটান গায়। রীনাও সীমার পরিচয় জেনেছে। এখানের বনেদি পরিবারের মেয়ে সীমা। এখানের আদি বাস ওদের। এসব ওদের পূর্বপুরুষদের জমিদারি।

সীমাই বলে রীনাকে,

—একদিন আসুন আমাদের বাড়িতে, অবশ্য গ্রামের সাবেকি আমলের বাড়ি।

রীনাও এখানের মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করতে চায়। সে দেখছে সাহেবদেরও, আর দেখেছে সাহেবরা চলে যাবার পর এই আধুনিক সাহেব মেমদের। এরা মদ খেতে শিখেছে আর অন্তরটা রয়ে গেছে সেই সেকেলে। মদ খায় নাচার চেষ্টা করে। আর মিসেস রায় মিসেস প্রধানের বাংলোতে কারা যায় তা নিয়ে গোপনে আলোচনা করে। কে কবে কার বাংলোতে রাত কাটিয়েছে তা এদের আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। মিঃ দাস পারচেজ সেকশনে বসে বা হাঁতে কত টাকা রোজগার

করে সেকথাও জানায় মিসেস রায়।

রীনার এসব ভালো লাগে না। সে নিজেই এখন বাবুপাড়ায় মেয়েদের নিয়ে একটা নাইট স্কুল করেছে সেখানে শ্রমিকদের নিয়ে মেয়েবৌদের লেখাপড়া গান শেখায়। তার কাজে সীমাকেও আনতে চায়। রীনা ভাবে ওদের গ্রামে মেয়েদের নিয়ে কিছু কাজ করবে। তাই বিজনকে বলে রীনা।

—বিজন তুমি তো সীমাদের ওখানে যাও। নিতাইবাবুদের কাছে। সীমা বলে,

—ওতো জেঠুমণির খুব জানাশোনা।

রীনা বলে—তাহলে তুমিই একদিন আমায় নিয়ে যাবে ওখানে। সীমা তোমার জেঠুমণির সঙ্গেও পরিচয় হবে।

বিজন বলে—তাই হবে ম্যাডাম।

রীনা এসেছে সীমাদের বাড়িতে, বিজনের সঙ্গে। সেদিন নিতাইবাবুও ছিলেন বাড়িতে। রতনও এখন দলের কাজে মাঝে মাঝে এখানে আসে। ইদানীং রতনও যেন বদলে গেছে। সীমাও দেখেছে সেটা। সেদিন রীনাকে দেখে নিতাইবাবুও খুশি হন। এতদিন ধরে ওই আধুনিক সাহেব তাদের স্ত্রীদের সম্বন্ধে একটা বিজাতীয় ধারণা ছিল তার। তারা যেন অন্য জগতের লোক। সাধারণ লোকেদের কথা তারা ভাবে না। আবার প্রয়োজনও বোধ করে না। কিন্তু রীনা এসেছে এই গ্রামে নাইটস্কুল করার কথা নিয়ে। এর মধ্যে বাবুপাড়ার মহিলা সমিতির কথা শুনেছেন নিতাইবাবু। সীমাও বলে—উনি বাবুদের রিক্রিয়েশন ক্লাবের লাইব্রেরির জন্যও কোম্পানি থেকে টাকা পাইয়ে দিয়েছেন।

নিতাইবাবুও চান মেয়েরাও সমাজ গড়ার কাজে এগিয়ে আসুক তিনি বলেন,

—রতন, তুমিই ওর কাজের জন্য যা ব্যবস্থা করতে হয় করবে।

রতন বলে—তাই করব দাদা। কালই মেয়েদের খবর দিই। উনি এসে ওদের যা বলার বলবেন। স্কুলের জন্য বইপত্র আলো পাখা যা লাগে সব ব্যবস্থা করে দেব।

রীনা বলে—পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওদের হাতের কাজ সেলাই এসবও শেখাতে পারলে তারাও স্বনির্ভর হয়ে কিছু রোজগার করতে পারবে।

রতনের মনে পড়ে বনানীর কথা। সেও এখন এইসব পরিকল্পনা করছে। কিন্তু মোহনলালই তাকে বাধা দেয় প্রতি পদে পদে। রতন তাকে মদত দিতে পারেনি। তবু মনে হয় বনানীর সঙ্গে ম্যাডামের পরিচয় করিয়ে দিতে পারলে কাজ হবে। রতন বলে রীনাকে—

—কাল আসুন। ওদের সঙ্গে মিটিং করুন, স্কুল চালু হোক, তারপর অন্য সব কথা ভাবা যাবে।

রীনাও রতনের সাহায্যে এবার নিতাইবাবুদের গ্রামেও একটা স্কুল নারী সমিতি খুলেছে।

রতন এতদিন অন্ধকার পথেই রোজকার করে এসেছে। টাকাও করেছে প্রচুর। কিন্তু সমাজে তার সুনাম খুব একটা ছিল না।

এখন দেখছে এলাকার মানুষ-শ্রমিকরা তাকে সমীহ করে। কারখানার শ্রমিকদের কথাও ভাবে। নিতাইবাবু বলেন,

—রতন, শুধু পাবার রাজনীতি করো না। ওতে শ্রমিকদেরও সাময়িক লাভ হয়। কিন্তু কারখানার উপর বেশি চাপ দিলে সরকার লোকসান দিয়ে কারখানা নিশ্চয়ই চালাবে না।

রতনও এখন এলাকায় ঘুরে দেখেছে যে দুর্গাপুরের ওদিকে বোকারোতে ভারতের আরও কয়েকটা জায়গাতে লোহা কারখানা তৈরি হয়েছে। টাটানগরের কারখানাও এখন একটু আধুনিক প্রযুক্তিতে চলছে। অন্য সব নতুন কারখানাও চলছে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে। কিন্তু শিয়ালডাঙা কারখানা চলছে সেই অতীতের যন্ত্রপাতি, সাবেকী ধরনের ব্লাস্ট ফার্নেস দিয়ে। এতে প্রোডাকসন-এর খরচ বেড়েছে কিন্তু প্রোডাকসন বাড়নি। তবে এখন বিদেশি অর্ডার প্রচুর রয়েছে তাই পুষিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু দিন যত যাবে এসব যন্ত্রপাতির আয়ু তত কমবে। তাই দরকার সরকারকে বলে নতুন প্রযুক্তির কারখানা গড়া। এবার তাদের কাজ হবে কর্তৃপক্ষকে সেই ভাবে কারখানাকে উন্নত করার কথা বলতে।

রতন তাই আসে মিঃ মিত্রের কাছে। তাদের দাবিদাওয়ার চেয়ে কারখানাকে উন্নত করার উপরই বেশি গুরুত্ব দিতে চায় সে। এমনি সময় মিঃ মিত্রই মোহনলালর সেই দাবির ফিরিস্তি দিয়ে বলেন,

—এইসব অন্যায় দাবি করে কারখানার কাজ বন্ধ করে দিলে কত ক্ষতি হবে জানেন?

রতন দেখছে মোহনলালদের দাবিপত্র, তার কাছেও এসব যেন অবাস্তব বলে মনে হয়।

মিঃ মিত্র বলেন,

—এত অর্ডার বিদেশে সাপ্লাই করতে হবে। যদি ধর্মঘট হয় সময়মত মাল দিতেও পারব না। কোম্পানির লোকসান হবে কয়েক কোটি টাকা। কোম্পানির অবস্থা তখন কি হবে সেটাও ভাববে না শ্রমিকরা? তাদের দাবিই হল বড়।

রতনও এবার সব দিক ভেবে বলে,

—দেখছি কি করা যায়। আমি শ্রমিকদের বোঝাবার চেষ্টা করছি। কথা দিচ্ছি আমাদের ইউনিয়ন এই ধর্মঘটে সামিল হবে না।

এদিকে মোহনলাল বেশ প্যাঁচেই পড়েছে, কোম্পানিকে সে চাপে ফেলেছে। আরও জানে এবার কর্তৃপক্ষ তাকেই ডাকবে আপসের জন্য। মোহনলালও হিসেব করে রেখেছে বেশ মোটা টাকা পেলে সেটা পকেটস্থ করে মোহনলাল এ ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেবে। না পেলে অবশ্য ধর্মঘট করতেই হবে।

সেও কিছুটা ভাবনাতে রয়েছে। তার অঙ্কটা ঠিক মিলবে কিনা তাও ভাবছে সে।

তবু মোহনলাল শ্রমিকদের তাতিয়ে রাখার জন্য রোজই এখন মিটিং মিছিল করছে। শ্রমিকদের অনেকে বেশ ভয় পেয়েছে। হাজার হোক রুজি রুটির প্রশ্ন। এখন তারা নিশ্চিন্তে চাকরি করছে। সাহেবদের বাপ-মা তুলে খিস্তিও শুনতে হয়

না। ওদিকে হাসপাতালেও তারা ভালো চিকিৎসা পাচ্ছে। কোম্পানি ন্যায্য দরে রেশন দেবার ব্যবস্থাও করেছে। তাই অনেকেই এখন কিছুটা ইতস্তত করছে ওই ভাবে কাজ বন্ধ করতে। কর্তৃপক্ষ শাস্তিও দিতে পারে, অস্থায়ী শ্রমিকদের ভয় আরও বেশি। তাদের ছাটাই করে দিলেও বলার কিছুই নেই। তবু মোহনলাল তাদের ধর্মঘটে নামাতে চায়। শ্রমিকদের কল্যাণ যেন শ্রমিকদের চেয়ে অনেক বেশি করে চিন্তা করে ওই মোহনলাল।

এবার রতনের দল বিকেলে মাঠে বিশাল জনসভা করে। রতন, নিতাইবাবু, বিধায়ক বসন্তবাবুও এসেছেন। তারা স্পষ্ট ভাবে জানায়,

—এ সময় ধর্মঘট করলে কোম্পানির প্রভূত ক্ষতি হবে। আর কোম্পানির লোকসান হলে শ্রমিকদেরও প্রাপ্য দিতে পারবে না। ধর্মঘট না করে কাজ চালিয়ে যেতে হবে। এসব দাবিদাওয়া অযৌক্তিক, স্বার্থ-প্রণোদিত, তাই ধর্মঘটের পথে যাবেন না।

আবার বেশির ভাগ শ্রমিকই যেন ভরসা পায় ওদের ধর্মঘটের বিরুদ্ধে কথা বলতে। তারাও চীৎকার করে—

—ধর্মঘট করতে চাই না।

ওদের মিটিং-এর কথা এবার মোহনলাল শুনেছে। সে দেখে রতন মঞ্চে দাঁড়িয়ে ধর্মঘটের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করছে। আর কয়েকশো শ্রমিক হাততালি দিয়ে তাকে সমর্থন করছে। মোহনলালেব রক্ত মাথায় ওঠে। ওই রতন তাকে প্রতিপদে তার প্রতিষ্ঠার পথে বাধা হয়ে উঠছে।

মোহনলালের মনে পড়ে বনানীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সেই দৃশ্যটা। মোহনলালও এবার মরীয়া হয়ে উঠেছে। রাজনীতির স্বার্থে প্রতিষ্ঠা আর টাকার স্বাদ সে পেয়েছে। এখনও তাকে অনেক কিছু পেতে হবে। এই ধর্মঘট না করাতে পারলে তার প্রতিষ্ঠা ক্ষুণ্ণ হবে। দলের কাছে তার মাথা হেঁট হয়ে যাবে। আর তারও আর্থিক ক্ষতি হবে। তাই মোহনলাল এবার তার দলের বেশ কিছু শ্রমিকদের নিয়ে মিছিল করে বের হয়েছে। ধর্মঘট হবেই—

এদিকে রতনও তৈরি। এই ধর্মঘট তাদের রুখতেই হবে। তাই সেদিন গেটে এরাও তৈরি থাকে। ওদিকে মোহনলালের ক্যাম্প। সেখানে ফেস্টুন লাগিয়ে তাঁবু গেড়ে বসেছে দলবল নিয়ে মোহনলাল। শ্রমিকদের কাজে যেতে দেবে না মোহনলাল। বেশ কিছু শ্রমিককে তারা আটকে রেখেছে। অনেকে ভয়ে কাছে আসেনি এদিক-ওদিক থেকে ব্যাপারটা কদ্দুর গড়ায় তাই দেখছে।

কারখানার ভোঁ বাজে। বাইরে শ্রমিকদের জটলা। মোহনলালের দল মাইক লাগিয়ে ধর্মঘটের ডাক দিয়ে চলেছে। এবার রতনের দল শোভাযাত্রা করে আসে। জীবনও রয়েছে ওদের দলে, তার সঙ্গে রতনের বেশ কিছু মজুরও রয়েছে। তারাই আসে হাতে পতাকা ফেস্টুন। পিছনে কারখানার বেশ কিছু শ্রমিক। তারা কাজে যাবেই।

এগিয়ে আসছে তারা। এবার মোহনলালও তৈরি তার দল নিয়ে—সেও কমতি যায় না। তার দলেও বেশ কিছু শ্রমিক রয়েছে, তারাও পথের সামনে এসে দাঁড়ায়।

তাদের হাতে লাঠিসোটা। তারা ওদের কাজে যেতে দেবে না। রতন জানে কখন কি কৌশল নিতে হবে। সে অবশ্য সামনে আসেনি। এসব কাজে জীবন এখন পটু হয়ে উঠেছে। দু চারবার রাতে কোলিয়ারীর কয়লা সমেত ট্রাক নিয়ে পালিয়েছে। পুলিশ ঘিরে ফেলেছে তাদের। দু চারটে বোমা মেরে জীবন পুলিশের জাল থেকে বের হয়ে আসে। অন্ধকারে বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দে পুলিশ যখন হতচকিত হয়েছে তখন সেই ফাঁকে ওরা গাড়ি নিয়ে পালিয়েছে। সেবার অন্য এক দলের সঙ্গে কয়লা পাচার নিয়ে গণ্ডগোল বাঁধে। সেই দলের দুচারজনকে গুলি করে নিকেশ করে লাশ দুটো কোন কোলিয়ারীর পরিত্যক্ত খাদের অতলে ফেলে দেয় জীবনের দল।

জীবনের দল তাই মোহনলালের দলকে এবার তাড়া করে, দু-একটা বোমও ফাটায়। কেউ ছিটকে পড়ে পালাতে গিয়ে। মোহনলাল তাজ্জব—ওদিক থেকে বের হয়ে গিয়ে দত্তদের দোকানে ঢোকে। তখন জীবনের দল এদের লড়াকু বাহিনীকে ঘিরে ফেলেছে। অবশ্য তাদের অনেকেই এবার কারখানাতে ঢুকে পড়ে। বাকিরাও গিয়ে কারখানাতে ঢোকে। মোহনলাল দেখে সেই শ্রমিকদের অধিকাংশই নেই। সকলেই প্রায় কাজে যোগ দিয়েছে দাবির কথা ভুলে। মোহনলাল অসহায়। দত্তবাবু বলে,

—কি গো মোহন! খামোকা লোকেদের রুজিরুটিতে হাত দাও কেন?

রতন এমন সময় মোটর বাইক নিয়ে এসে পড়ে। রতন দূর থেকে সবই দেখেছে। বিনা রক্তপাতে জীবন লড়াই ফতে করেছে। রতন দত্তমশায়-এর কথায় বলে,

—ওদের সর্বনাশ না করতে পারলে ওর পৌষমাস হবে কি করে?

মোহনলাল দেখছে রতনকে। একদিন ওই রতনই এসেছিল তার কাছে কাজের জন্য। কারখানার ছাঁট চুরি করতো। সেই দলে প্রথম ব্যবসা করতে ঢোকে। রতন মোহনলালকে অবশ্য তার জন্য প্রণামীও দিত।

ক্রমশঃ স্বাধীনতার পর এবার রতন শাসকদলের হয়ে ভোটে কাজ করে নিজের ঠাঁই করেছে। এখন ওর রাতের কারবারও জোর চলেছে মোহনলালকে আর সে পরোয়া করে না। মোহনলাল পরাজিত সেনাপতির মত রণাঙ্গন ত্যাগ করে আজ। তবে সে থামবে না। দিন তার এলে সে রতনকে এর জবাব দেবে।

মিঃ মিত্র তিনতলার অফিসের বারান্দা থেকে সমস্ত ব্যাপারটা দেখেছেন, শ্রমিকদের ধর্মঘট না হওয়াতে তিনিও খুশি হন। অবশ্য এসবই হয়েছে রতনের দলের চেষ্টাতে তাও জানেন তিনি। এবার মনে হয় রীনাও তার চাকরি বজায় রাখার কাজে বেশ কিছুটা সাহায্য করেছে ওই রতনকে মাঠে নামিয়ে।

বনানী এখন শ্রমিকদের নিয়ে কাজ করছে। দেখেছে কোলিয়ারী শ্রমিকদের অবস্থা। সামান্য মাইনে পায় তারা। তার মধ্যে ওই মোহনলালের মত নেতাদের জন্য প্রায়ই ধর্মঘট হয়। মজুরিও পায় না। সেই পরিবারগুলোর নগ্ন দারিদ্র্যের কথা জানে সে আর জানে এসবের মূলে ওই মোহনলালর মত কিছু স্বার্থপর নেতার হাত আছে।

কারখানায় ধর্মঘটের কথা সে শুনেছিল। আরও জেনেছিল এইসব মোহনলালের

নেতৃত্বে ঘটতে চলেছে।

সেও বলেছিল মোহনলালকে,

—অযথা ধর্মঘট করতে যেও না। এখন তো শ্রমিকরা ভালো পয়সাই পাচ্ছে। কোলিয়ারী শ্রমিকদের চেয়ে অনেক ভালো আছে।

মোহনলাল বলে,

—শ্রমিকদের স্বার্থের বিরুদ্ধে কথা বলছো দেখছি। আমি কোনো অন্যায় করিনি।

—ধর্মঘট হলে কারো কারো চাকরি যেতে পারে। তাছাড়া এরা মাইনেও তো পাবে না।

মোহনলাল উত্তর দেয়,

—যা ভালো বুঝেছি করেছি। এ দলের সিদ্ধান্ত, তার নড়চড় হবে না।

বনানী বলে,

—জেনেশুনে এতগুলো লোকের সর্বনাশ করবে—

মোহনলাল গর্জে ওঠে,

—থামবে! ফের একটা কথা বললে ঘাড় ধরে বাড়ি থেকে দূর করে দোব। আমারই খাবে আবার আমারই মুখের ওপর কথা বলবে।

বনানী চুপ করে যায়। বনানী জানে ওকে থামানো যাবে না। বনানীও আর যেন লোকটাকে সহ্য করতে পারে না। বনানীও ভাবছে নিজের মানুষের সঙ্গে মনের মিল না হলেও সেটাকে মানিয়ে নেওয়া চলে। মন অনেক নরম, সে সহজে কিছু হারাতে চায় না। কিন্তু মত বড় কঠিন, মতের অমিল হলে মনও সেখানে অসহায়। তাই মতান্তর হলে সরে যেতে হয়। বনানী এবার সেই কথা ভাবছে। আজ তার টাকার উপরও লোভ নেই। মানুষ কষ্টে থাকতে পারে তাও দেখেছে সে। তার মনে হয় সে ও নতুন করে বাঁচতে পারবে নিজের পরিচয়ে ওদিকে সার কোম্পানির টাউনশিপে মেয়েদের স্কুলও হচ্ছে। বনানী শিক্ষিকার জন্য চাকরির দরখাস্ত দিয়েছে।

সেখানে ওই অফিসে বনানীকে অনেকেই চেনে। জানে বনানী শ্রমিকদের নিয়ে কাজ করে আর মোহনলালের ওখানেই থাকে সে।

বড়বাবু বলেন,

তোমার চাকরির দরকার কেন?

—বনানী একবার চাইল। মোহনলাল যে এখন অনেক পয়সার মালিক, প্রতিষ্ঠানের লোক তা এরাও জানে। বনানী তাই বলে,

—নিজের রোজগারে বাঁচতে চাই বড়বাবু।

বড়বাবু এর মধ্যে এখানের অনেক খেলা দেখেছে। এখানে শ্রমিক ইউনিয়ন করে নেতারা কত ভাবে কত টাকা পায়। তাই বলে,

—আরে শ্রমিক ইউনিয়ন করছ, ওর থেকেই তো কত লোক কত কি করছে।

বনানী বলে,

—যারা পারে তারা করে, আমার দ্বারা ওসব হবে না। তাই বাঁচার পথ একটা

করতে হবে।

বড়বাবু জানে মেয়েটা সৎ, তাই বলে,

—ঘরের খেয়ে শুধু বনের মোষ তাড়াবে চিরকাল? ঠিক আছে তোমার দরখাস্ত আমি রেকমেন্ড করে পাঠাচ্ছি সাহেবদের কাছে।

বনানী একটু ভয়ে ভয়েই ছিল। কারখানায় ধর্মঘট হলে তার পরিণতি কি হবে তা জানে না। তাই সেদিন সেও উদগ্রীব হয়েছিল। মোহনলাল কদিন খুবই ব্যস্ত। অনেক রাতে বাড়ি ফেরে তখন কথা বলার মত অবস্থা আর থাকে না। বনানীও তখন এড়িয়ে যায় তাকে। আবার ভোরে বের হয়ে যায়।

বিকেশে মোহনলাল ফেরে। আজ সে পরাজিত বিধ্বস্ত তাই বেশ খানিকটা মাল গিলে ফিরছে। আজ মোহনলাল বুঝেছে ওই রতনই তাকে এইভাবে হারিয়ে দিয়েছে। ওকে ঢুকতে দেখে বনানী চাইল, বলে সে,

—কী হল তোমার ঘর্মঘটের,

মোহনলাল এতক্ষণ রাগে ফুঁসছিল। মদের উত্তাপ সেই মেজাজ এখন চড়ে গেছে শুনে, সে বুঝতে পারে বনানী যেন তাকে ঠেস দিয়ে কথা বলতে চায়। আর তার মনে পড়ে রতনের সাথে ঘনিষ্ঠতার দৃশ্যটা। এবার তাই আগুনে ঘি পড়ে। মোহনলাল গর্জে ওঠে।

—খুব খুশি হয়েছিস দেখছি। হবি না ওই ব্যাটা রতনের সাথে যে খুব পিরিত। ঘরশত্রু বিভীষণ তুই।

বনানী বলে,

—যা-তা কথা বলবে না। ওই রতন যা হোক তোমার চেয়ে ঢের ভালো। এতগুলো লেবারকে সর্বনাশের হাত থেকে বাঁচিয়েছে।

মোহনলাল এবার লাফ দিয়ে বনানীর চুলের মুঠি ধরে গর্জে ওঠে।

—খুব যে পিরিত রে। তবে এখানে পড়ে আছিস কেন? যা সেই শালা নাগরের কাছে। এতদিন ধরে দুধ-কলা দিয়ে কালসাপ পুষেছি। এবার তোকে তাড়াব। দেখি কোন নাগর তোকে ঠাঁই দেয়। দূর-হ এখান থেকে। নিকাল যাও আভি নিকালো।

বনানীও ভাবেনি যে হঠাৎ এই ভাবে আজই তাকে বের হতে হবে। সে অবশ্য ভেবেছিল চলে যাবে। কিন্তু সেটা যে এত শীঘ্র ঘটবে সেই হিসাব করেনি। মোহনলাল ওর জামাকাপড় সুটকেশ উঠোনে ছুড়ে ফেলে গজরাচ্ছে। বনানী বলে,

—চিৎকার করতে হবে না। আমি চলেই যাচ্ছি।

—তাই যা। মোহনলালও গর্জায়।

মেয়েটা একটা আশ্রয়কে অবলম্বন করে এতকাল বেঁচে এসেছে। তাদের জীবনে একটা মূল্যবোধও থাকে। কোনো বন্ধনই ছিল না। তবু বনানী ওই লোকটাকে ভালোবেসেছিল অন্তরমন দিয়ে। মনে মনে একটা বন্ধনকে স্বীকারও করে নিয়েছিল।

মোহনলাল সেই বন্ধনের কোনো মর্যাদাই দেয়নি। তার কাছে টাকা প্রতিষ্ঠা আর স্বার্থই বড় হয়ে উঠেছে আজ। তাই কোনো বন্ধনই সে মানতে চায় না। এক মুহূর্তে সেই বাধনকে অস্বীকার করতেও বাঁধে না তার। বনানীর চোখেও জল নামে। সে বলে,

—আমি যাচ্ছি, তবে বলে যাচ্ছি, যে পথে চলছ সেটা ঠিক পথ নয়। অনেক ভুল করেছ আর ভুল কোরো না।

মোহনলাল বলে,

—যা তো আর হিতোপদেশ দিতে হবে না।

ফার্টিলাইজার টাউনশিপের একটা কোয়ার্টারে থাকে শ্রীমতী গার্লস স্কুলের মিসট্রেস। হাওড়ার ওদিকেরই মেয়ে, বিয়ে-থা করেনি। বাবা মারা যাবার পর ছোট ছোট ভাই বোনদের মানুষ করেছে। বিয়ে-থা দিয়ে তাদের সংসারী করেছে। দেখতে দেখতে বয়সও বেড়েছে শ্রীমতীর। বিয়ে-থা না করে ভাইদের হাত থেকে এড়িয়ে এবার এখানের চাকরি নিয়ে দূরে সরে এসেছে।

এখানেই দেখা হয়েছে বনানীর সঙ্গে। সে এখানের সার কারখানায় লেবার ইউনিয়নের সঙ্গে জড়িত। এখানের মেয়েদেরও চেনে। শ্রীমতীর সঙ্গে পরিচয়টা সেই সুবাদেই গড়ে ওঠে। এখানে প্রায়ই আসে। ওর কথাতেই এখানের স্কুলের চাকরির দরখাস্ত করেছে বনানী। সেদিন স্কুলের ছুটির পর শ্রীমতী কোয়ার্টারে একাই বসে পরীক্ষার খাতা দেখছে। হঠাৎ স্যুটকেশ হাতে ঝড়ো কাকের মতো বনানীকে ঢুকতে দেখে চাইল।

—তুমি!

বনানীর চোখে জল। মাথার চুলগুলো এলোমেলো। বনানী বলে,

—আর ওই মানুষটার কাছে থাকা গেল না। দিদি! মোহন আর মানুষ নেই। জানোয়ার হয়ে গেছে। এর আগেও ওকে শোধরাবার চেষ্টা করেছি। ও রেগে গিয়ে মারধর করেছে, তবু পড়েছিলাম। কিন্তু আর থাকা গেল না। চলে এলাম, তুমি যদি একটু আশ্রয় দিতে—

শ্রীমতী, বনানীর ইতিহাস সবই জানে, নিজেও দেখেছে বনানী নিঃস্বার্থভাবে শ্রমিকদের হয়ে কাজ করে। তাদের সুখদুঃখের সঙ্গী হয়ে গেছে। মোহনলালের সম্বন্ধেও শুনেছে সে। আজ মনে হয় বনানী সেখানে কী করে থাকতো। আজ তার জবাব পেয়েছে শ্রীমতী।

—ভালোই করেছিস ওখান থেকে এসে বনানী। থাক এখানে—

বনানী বলে,—আবার তোমার বোঝা বাড়াব।

—ওরে ছেলেবেলা থেকেই বোঝা হয়ে আসছি ভাইবোনদের। তোর বোঝা, সে তো বোঝার ওপর শাকের আঁটি। গায়ে লাগবে না। একা ছিলাম দুজনে থাকব। ভালোই হলো।

বনানী এবার বানে ভাসা খড়কুটোর মত এক ঘাট থেকে ভেসে আবার অন্য ঘাটে ভিড়লো।

আনন্দবাবুরা এতকাল রাজ্যপাট চালিয়ে এসেছে, কোলিয়ারি মালিক হয়ে। জমিদারি চলে যাবার পরও তাদের ঠাটবাটে টান পড়েনি। মাটির অতলে কালো সোনার খনির মালিক তারা। কোলিয়ারি এলাকাতেই ওই রুক্ষপাথরের মধ্যেও বহু

ব্যয় করে বাগান বাংলো এসব করেছে। বিয়ে-থা করে ঘরসংসারও পেতেছে এখানে গাড়ি বাংলো সবই আছে এখানে এই তেপান্তরের মধ্যে। শহরে যাতায়াত করে। ক্লাবেও যায়। সন্ধ্যার পর সেখানে জমায়েত হয় অনেক কোলিয়ারীর মালিক। তাদের মধ্যে বাঙালি অবশ্য কম, বেশির ভাগ মালিকই অবাঙালি। তবু ব্যবসার খাতিরে তাদের মিলমিশ আছে। মাটির অতলের কয়লা তোলে তারা, বাপ ঠাকুর্দার আমল থেকে। আর সেই সম্পর্কটাকে সকলে আগলে রেখেছে। এখানের মাটিতে সাধারণত তিনটে স্তরে কয়লা আছে। কয়লার স্তর অবশ্য ঢালু হয়ে নেমে গেছে। কোথাও উপরের মাটির ছ-সাত ফিট নীচেই প্রথম স্তর কয়লাও রয়েছে। সেই স্তরের গভীরতা প্রায় তিরিশ চল্লিশ ফিট বা তারও বেশি। তার পরের স্তর কোথাও দুশো ফিট নীচে, তৃতীয় তারও শ'তিনেক ফিট নীচে।

এরা সেই সম্পদকে তিলতিল করে তুলে বিক্রী করে। অবশ্য অনেক প্রাচীন কোলিয়ারীর কয়লার স্টকও ফুরিয়ে এসেছে। পড়ে আছে শুধু অন্ধকারে ভরা অতলগভীর খাদ। এদের সংখ্যা কমই। তবে কয়লার সঞ্চয় ফুরিয়ে গেলে তখন আর কোলিয়ারীর অস্তিত্বই থাকে না। সেসব খনি হয় পরিত্যক্ত। মালিকরা তাই সাবধানে ব্যবহার করে।

কয়লার মতো দরকারি একটা জ্বালানীর জোগান দেয় তারাই বাজারে। অবশ্য শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি স্বাধীনতার পরেও তেমন ঘটেনি। এতকাল এসব কোলিয়ারির বেশির ভাগই ছিল ইংরেজ কোম্পানির দখলে। তাদের রাজত্ব তখন, তাই ইংরেজ সরকার মালিকদের স্বত্বই দেখেছে। শ্রমিকদের স্বার্থ দেখেনি। পরবর্তী সময়ে ইংরেজ চলে যাবার পর এদেশীয় মালিকরাও সেই সুবিধা ভোগ করেছে। অবশ্য এখন কোলিয়ারি মালিকরা কোন রাজনৈতিক দলকে মোটা টাকা দেয়। নেতাদেরও দিতে হয়। না-হলে ধর্মঘটই করিয়ে দেবে। আর দিতে হয় সরকারি কিছু কর্মীকে কারণ খনির নিরাপত্তা শ্রমিক কল্যাণ এসব বিভাগও আছে। শ্রমিকদের টাকা দিক না দিক মাসের প্রথমে এদের জন্য খাম পাঠালেই তাদের খনির কাজে কোন ব্যাঘাত ঘটবে না।

এইভাবে মালিকরা কোলিয়ারি চালিয়েছে। আনন্দবাবুদেরও এই পথেই চলতে হয়েছে। তারা এই ভাবেই লাখ লাখ টাকার সম্পদ আহরণ করেছে। এতকাল। হঠাৎ সেই গদি ধরেই এবার টান দিয়েছে সরকার। মালিকরা এখন সরকারের লোহাকারখানাতে কয়লা সরবরাহ করে। টন প্রতি দাম তিরিশ টাকার মতো। এবার মালিকরা সেই কয়লার দর হাঁকে টন প্রতি চল্লিশ টাকা। এ নিয়েই গোলমাল বাধে। ওদিকে সরকারও চাপ দিচ্ছে শ্রমিকদের মজুরি বাড়াতে হবে। তাদের কিছু সুযোগ-সুবিধাও দিতে হবে। তাই মালিকরা এই দাবি জানায়। নাহলে তারা কয়লার জোগান বন্ধ করে দেবে।

এরাও কয়লা সরবরাহ বন্ধ করার জন্য মিটিং করছে। সেই মিটিং-এ আনন্দবাবুও গেছে শহরের ক্লাবে। ফিরতে রাত হয়ে যায়। রাতে যখন ঘুমুচ্ছে তখন শেষ রাতে হঠাৎ শহর থেকে তার দু'একজন কোলিয়ারি মালিক বন্ধুর ফোন আসে।

—আনন্দ! টাকা মাল যা পারো কোলিয়ারি থেকে সরিয়ে নাও।

—কেন? আনন্দ অবাক হয়।

তারা বলে—সরকার সব কোলিয়ারি জাতীয়করণ করছে কালই। কালই পুলিশ হানা দেবে। কোলিয়ারির দখল নেবে।

চমকে ওঠে আনন্দ। কোলিয়ারির নামেই বেশি টাকা আছে ব্যাঙ্কে। অবশ্য দু'একটা অ্যাকাউন্ট-এ বেশ কিছু টাকা সরানো আছে সেসব টাকা তুলে নিতে পারলেও কোলিয়ারি তো তুলে নিতে পারবে না। এতদিনের পৈত্রিক সম্পত্তি সব চলে যাবে। জমিদারি গেছে অবশ্য তার জন্য কিছু ক্ষতিপূরণ পেয়েছিল। তাই শুধোয়—

—কোলিয়ারির জন্য ক্ষতিপূরণ পাবে না?

শেঠজী হাসে—আরে এত শালবন ছিল আমাদের। সরকার এক কলমের খোঁচাতে সব কিছু লিয়ে নিল, এক পয়সাও ক্ষতিপূরণ দেয়নি এত টাকার কারবার গাছের। কোলিয়ারি ভি তেমনি লিয়ে লিল। অর্থাৎ কালও ছিল তারা সমাজের উঁচু তলার মানুষ। কোলিয়ারি মালিক। একরাতেই সব কেমন ভোজবাজির মতো উবে যাবে এটা বিশ্বাসই করতে পারে না। সরকার বিশেষ অর্ডিনান্স করে সারা ভারতের যত কোলিয়ারি ছিল জাতীয়করণ করেছে। আর পুলিশও এবার ওইসব কোলিয়ারির দখল নিচ্ছে। কোলিয়ারি মালিকরা এবার বিপদে পড়েছে। আগে ভাগে খবর পেলে তারা টাকা মালপত্র বেশ কিছু সরিয়ে নিতে পারতো।

সেইটা যাতে না-করতে পারে তার জন্যই সরকার গোপনে রাতারাতি অর্ডিনান্স করে এসবের মালিকানা নিয়েছে। তবুও এই ঘণ্টা কয়েক সময়ের মধ্যে অসহায় মালিকরা অনেকেই কিছু সরাতে পেরেছে। অনেকে তাও পারেনি।

আনন্দবাবুর বাংলোও দখল করেছে পুলিশ। তার মধ্যে আনন্দবাবুর ব্যক্তিগত কিছু জিনিস বিয়েতে যৌতুক পাওয়া দামি ঘটি আসবাবপত্রও ছিল। সেসবও এখন পুলিশের দখলে। ফলে শূন্য হাতেই বের হতে হয় আনন্দবাবুকে। ওই বাংলো এখন সরকারি সম্পত্তি।

নদীর এককূল ভাঙে আর অন্য কূল গড়ে ওঠে। একদিক না ভাঙলে অন্য দিকে গড়া কাজটাও প্রাকৃতিক নিয়মে ঘটতে পারে না। তাই একদিকে মালিকদের সর্বস্ব গেল এক কলমের খোঁচায়। অন্য দিকে এবার ওই লেবাররাও পাবে পাকা চাকরি। তাদের মাইনেও ভালো হবে এবার। অন্য সুযোগ-সুবিধাও পাবে।

ফলে এবার মোহনলালের মতো শ্রমিক-নেতারাও দলে দলে এগিয়ে আসে। রতনের দলও বসে নেই। রতন জীবনদের নিয়ে এর মধ্যে জিপ নিয়ে বের হয়েছে। তারা জানে এবার মধুর সন্ধান কোথায় করতে হবে। মোহনলাল এটা বুঝেই আগে থেকে আঁটঘাঁট বেঁধে কাজে নেমেছে। অবশ্য তার জন্য কোলিয়ারির বাবুদের নগদ কিছু দিতে হবে।

তারা এতদিন হাজিরা খাতা রেখে এসেছিল। মালকাটাদের নাম কাজের রোজ লেখা থাকতো তাতে। সে সময় খাতায় লেখা হাজিরা হিসাবে মজুরি পেতো তারা। সেই ছিল তাদের কাজে যোগদানের প্রমাণ। এবার মোহনলাল বেশ ফন্দী করে

ওইসব হাজিরা খাতাই বদলে দিচ্ছে। সেখানে লেবারদের জানাশোনারা, বেকার আত্মীয়দের নাম ভাঙানো হচ্ছে, নতুন হাজিরা খাতা করে। তাদেরই বাঁধা চাকরি হবে। সুতরাং প্রতিটি নাম লেখানোর জন্য হাজার কয়েক টাকাও দিতে হচ্ছে শ্রমিকদের।

রতনরাও রাতের কোলিয়ারিতে এই খেলা শুরু করেছে। তার দলের ছেলেদের নামও ঢুকিয়েছে। শ্রমিক মহলে এখন খুশির জোয়ার। এবার তাদের দুঃখের দিন শেষ হতে চলেছে। কোলিয়ারিতে তাদের বাঁধা চাকরি মাস মাইনে হবে। আর বাবুদের দয়ার উপর ভরসা করে চাকরি করতে হবে না। তারা এতকাল হপ্তা পেত। এবার তার চারগুণ মাইনে হাতে পাবে কুলি ধাওড়াতে এবার খুশির জোয়ার।

মোহনলাল সেদিন হাটতলায় মিটিং করে, গলায় মালা। চারিদিকে আনন্দ উচ্ছল শ্রমিকদের মুখ। মোহনলাল বলে,

—আমাদের দাবি এবার সরকার মানতে বাধ্য হয়েছেন। এ আমাদের সংগ্রামের জয়।

ওদিক রতনের দলও বুক ফুলিয়ে এখানে ওখানে মিটিং করে জানায় আমাদের চাপেই সরকার শ্রমিকদের মঙ্গলের জন্য এইসব করেছে।

মাইনের দিন শ্রমিকরা হাতে এত টাকা পেয়ে চমকে ওঠে।

ওদিকে হাটও জমে গেছে। এলাকার মদের ব্যবসায়ীদের এখন হাতে এনেছে জীবন।

জীবন এখন রতনের অনুচর হলেও সে নিজেও এখন এই লাইন চালু করেছে। ম্ল্যাগ-এর কারবার কয়লার পাচার ওদিকে ওয়াগনের মাল লুঠ এর কাজের জন্য রতন কার্তিকবাবুদের ভাগ দিতে হয়—ওরাই প্রশাসনকে সামলায়।

জীবন দেখছে মদ বিক্রি হবেই। তাই সে এবার এই লাইনেও তার লোকজনদের লাগাচ্ছে। এদিক সেদিক মদের ঠেক বসেছে দশ-বারোটা। এ ছাড়া স্থানীয় আদিবাসীরাও বড় মাটির হাঁড়িতে নিয়ে বসে। আজ ওই মজুরদের দল হাতে টাকা পেয়ে সগুষ্টি আকণ্ঠ মদ গিলে জয়ধ্বনি দেয়।

কেউ কিনেছে বাচ্চার জন্য নতুন জামা বৌয়ের জন্য লাল ডুরে শাড়ি, ফুলেল তেল। কিন্তু তারপর আকণ্ঠ মদ গিলে এবার পথেই গড়াগড়ি দেয় ছিটকে পড়ে শাড়ি, ফুলেল তেলের শিশি, জয়ধ্বনি দেয়।

—এতদিন কোথায় ছিলি মা গন্ধী—কেউ এত পয়সাও দেখেনি।

এত মদ জীবনে খাই না মা।

ওরা ওতেই খুশি।

কিন্তু উপর মহলের ম্যানেজার ইঞ্জিনিয়ার অ্যাকাউন্ট বাবুরাও এবার খুশি। এতকাল তারা মালিকদের অধীনে কাজ করতো। মালিকরা কোলিয়ারির সব অন্ধসন্ধির খবর জানতো। কয়লা কত কেজি তোলা হল, কত বিক্রি হল। কত থাকলো এসব নিজেরাই দেখতেন নিজেরাই কয়লার স্টক পরীক্ষা করতেন। তা ছাড়া বেশি কুলির নাম দেখিয়ে যে বেশি টাকা মজুরি থেকে মারা যাবে তার উপায়ও ছিল না। মালিকরা তাদের নিজেদের লোক রাখতো ওইসব জায়গাতে।

তবুও নানা পথে আমদানি কিছু হতো। এবার সরকারি কোলিয়ারি। মালিক বলতে তারাই। তারাই হিসাব রাখবে। সুতরাং কালো সোনার রাজ্য এবার তাদেরই থাবা বসাবে এতে তারা খুশি হয়েছে। সুতরাং মালিকদের হটিয়ে সরকার লক্ষলক্ষ কর্মচারীর হাতেই সোনার ভাণ্ডার তুলে দিয়েছে। হঠাৎ এই এলাকার বাজারে মাসে বাড়তি কয়েক কোটি টাকা ঢুকে যেতে এখানের বাজারও গমগম করে ওঠে। শিয়ালডাঙার ওই কারখানার পাশে এবার কোলিয়ারিগুলোর বাড়তি টাকা শিয়ালডাঙার মানুষের মনে কি নতুন খুশির আভাস আনে।

রতন কদিন ব্যস্ত ছিল ওই কোলিয়ারির ব্যাপার নিয়ে। এখন কোলিয়ারীতেও তার আসন কায়েম করতে হবে। শ্রমিকদের কাছে তারাই এনেছে এবার আশার আলো। এখন ভালো টাকাই চলে। উঠছে ওখান থেকে আর এতদিন মালিকরা কোলিয়ারির উপর কড়া নজর রাখতো কয়লা চুরি যে হতো না তা নয়। তবে সেটা করতে হতো খুব সাবধানে নানা কৌশলে। এখন কোলিয়ারির মালিক সরকার। পাহারাদার অবশ্য রয়েছে। রতন এখন সহজেই ওদের বশ করে চমকে দেবে। আর তারাও ট্রাকভর্তি কয়লা চলে যেতে দেখে অন্যদিকে চেয়ে থাকবে।

জীবনকে বলে রতন,

—এখানেই বেশি লোক রাখ জীবন। আমি ম্যানেজ করে দোব। তোরা যত পারিস পাচার কর মাল।

রতন এখন ক' মাসের মধ্যে বেশ ভালো টাকাই বানিয়েছে। তাই অন্যদিকে নজর দিতে পারেনি।

এই ক'বছরে রুক্ষ প্রান্তরের চেহারাটা বদলে গেছে। গড়ে উঠেছে নতুন টাউনশিপ। এখন দেশে কৃষিকাজ বাড়াতে হবে সবুজ বিপ্লব আনতে হবে। প্রচুর গাছগাছালিও লাগিয়েছে কোম্পানি। এখন জল পেয়ে গাছগুলো সবুজ সতেজ হয়ে উঠেছে। দু'একটা গাছে ফুলও এসেছে। ওদিকে স্কুল—মেয়েরা কলরব করে চলেছে। সেদিন ওই পথে ফার্টিলাইজার কারখানার একটা কর্মীসভায় গেছে রতন। হঠাৎ পথে বনানীকে দেখে চাইল। পরনে সাধারণ শাড়ি, হাতে সাধারণ চুড়ি। বেশভূষায় আগের মতো আড়ম্বর নেই। রতন ওর নতুন জিপটা চালিয়ে আসছিল। গাড়িটা ওর পাশে এসে দাঁড়াতে বনানী সেদিকে চাইল।

—তুমি!

রতন বলে—এখানে? কী ব্যাপার।

বনানী বলে—তুমি জানো না আমি তো এখন এখানের স্কুলে কাজ পেয়েছি।

রতন বলে,

—কদিন কাজের মধ্যে ছিলাম। কোনো খবর নিতে পারিনি। মোহনদা তো এখন কথাই বলে না।

—আমি শিয়ালডাঙায় আর নেই। ওই বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছি, আসতে হয়েছে।

—চলে এসেছ ওখান থেকে? অবাক হয় রতন।

বনানী বলে,

—ওই মানুষটাকে আর মেনে নিতে পারলাম না।

কোথায় আছ?

বনানী রতনের কথায় বলে—ওই তো আমার কোয়ার্টার।

ছোট দুকামরার একটা বাড়ি। সামনে একটু বাগানও করেছে বনানী। ওদিকে একটা পুরোনো ছাতিম গাছ ছায়া মেলে দাঁড়িয়ে আছে। রতন দেখছে বনানীর নতুন আস্তানাটাকে।

বনানী এর মধ্যে চা করে এনেছে। রতন বলে,

—আবার এসব কেন? দেখছে সে বনানীকে। বনানী এখানে এসে যেন অনেক শান্ত হয়ে গেছে—ওর মুখে চোখে এসেছে শান্তশ্রী। ওই হতচ্ছাড়া মোহনলালের অত্যাচারের থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে যেন নিশ্চিন্ত হয়েছে।

রতন বলে,

—মোহনলাল এখন বেশ গুছিয়ে নিয়েছে কোলিয়ারী শ্রমিকদের সংগঠন থেকে। এখন ওদিকেও নেতাগিরি করছে, শিয়ালডাঙার রাজত্ব তো আছেই। তুমিও সরে এলে।

বনানী বলে,

—ওই স্বার্থপর রাজনীতি করার সমর্থন পায়নি। এখানের মহিলা সমিতির কাজকর্ম। স্কুলের কাজ এই নিয়েই আছি। আমি বেশি কিছু চাই না।

রতন দেখছে ওর দেহ মনে তৃপ্তির স্পর্শ। সামান্য নিয়ে থাকলে বোধহয় মানুষ খুশিই থাকে। আর একবার চাওয়ার নেশা ধরলে মনের সেই খুশিটুকুও হারিয়ে যায়।

কথাটা রতন এবার বনানীকে দেখে ভাবছে। বিকাল নামছে বাতাসে ওঠে ছাতিম ফুলের সুবাস। পাখিগুলো ঘরে ফিরে কলরব করছে। কেমন বিষণ্ণতার আভাস নামে রতনের মনে ও মনের অতলে জাগে অনেক না-পাওয়ার বেদনা। এক জায়গাতে যে রতন শূন্যই রয়ে গেছে তা যেন বেশি করেই অনুভব করে সে।

অবিনাশবাবু এখন দোকান করেছেন। সময়টা দোকানেই কেটে যায়। লোকজন আসে—তাদের কাছেও এলাকার নানা খবরই পান তিনি। বহুদিন আগে তিনি এসেছিলেন শিয়ালডাঙায়।

তখন এই কারখানাই চলতো। আর দূরে দূরে দুচারটে ছড়ানো-ছিটানো কোলিয়ারি। লোকজনও কম ছিল, বাজারে দোকানপত্রও ছিল কম। এখন স্বাধীনতার পর কারখানারও প্রসার ঘটেছে। জাতীয়করণের পর তাদের শ্রমিক কর্মচারীদের দিন বদলে গেছে। কোলিয়ারির দিন বদলেছে। এতদিন কোলিয়ারির মালিকানা ছিল ব্যক্তিবিশেষের হাতে। এখন অর্থাৎ সেই প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার ডিরেক্টররাই এখন সর্বেসর্বা। ব্রিটিশ আমলের তৈরি কোলিয়ারি মালিকদের ক্লাবগুলোতে এখন ওই লোকগুলোই উড়ে এসে জুড়ে বসে নতুন ম্যানেজার। ডিরেক্টারাই দখল করেছে।

আর তারাই হাতে পেয়েছে ওই কালো সোনা খনির মালিকানা। কার্তিকবাবু

এতদিন ধরে বিভিন্ন কয়লা খাদে লেবার দিয়ে কয়লা তুলেছে। কয়লা কাটার অভিজ্ঞতা তার আছে। এখন আর তার কাজ নেই। কয়লা কাটাই করে কোলিয়ারির স্থায়ী মজুরের দল।

কার্তিকবাবু অবশ্য চতুর ব্যক্তি। সে জানে কীভাবে কোন পথে কয়লা তুলতে হয়। রোজগার বাড়াতে হয়। কোলিয়ারির অনেক ম্যানেজার—সুপার ভাইজাররা তার চেনাজানা। এতদিন তাদের অধীনে কাজ করেছে তাদের প্রণামী দিয়ে মাল তুলে অন্যত্র পাচার করেছে।

এখন কার্তিকবাবু সেই পথেই নেমেছে। অবশ্য এখন আসানসোলের শেঠ সুখলালও বেশ আটসাট করে এই ব্যবসা চালাচ্ছে। কার্তিকবাবুর চেনাজানা সে। কার্তিকবাবু বলে শেঠজীকে।

—আপনি শুধু মাল পাচার করার লাইন করুন। মাল আমি যোগান দেব আপনাকে।

কার্তিকবাবু জানে অনেক কোলিয়ারির জায়গা এখনও খালি পড়ে আছে। সেখানে গজাচ্ছে পলাশের ঘন বন। ওইসব মাটির আটদশ ফিটের মধ্যেই প্রচুর কয়লা আছে। ওইসব এলাকার ম্যানেজার সুপারভাইজারদের আর পুলিশকে মাসকাবারে মোটা টাকা দিয়ে রাত ভোর ওখান থেকে কয়লা তুলে পাচার করে কেউ দেখে না।

নবীনবাবু পুরনো ম্যানেজার। অবশ্য প্রাইভেটে ধানবাদ মাইনিং সুপার ভাইজার। এজন্য তাকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। সে তার কোলিয়ারির মালও কার্তিকবাবু পাচার করে স্টক ইয়ার্ড থেকে। নবীনবাবু বলে,

—আর কত পাচার করবে হে? পাঁচশো টন কয়লা তো পাচার করেছো।

কার্তিকবাবু বলেন,

—আপনিও তো ভালো টাকাই পেয়েছেন স্যার। আরও পাবেন।

নবীনবাবু বলেন,

—কিন্তু কয়লার হিসাব তো দেখাতে হবে হেড অফিসারকে।

কার্তিকবাবু বলে,

—সেটা কেমন করে দেখাবেন তা আর আমাকে বলতে হবে স্যার।

কী করে হিসাব দেখানো হয় পাচার করা কয়লার সেটাও এখন সরকারি হাতে যাবার পর বুঝেছে তারা। তাই প্রায়ই দেখা যায় এ কোলিয়ারি সে কোলিয়ারির কয়লার স্টকে হঠাৎ করে আগুন ধরে যায়। সেই সঙ্গে সব পুড়ে ছাই হয়ে যায়। অফিসের খাতায় লেখা হয় ভোলাটাইল কোল কট ফায়ার।

অর্থাৎ দহনশীল কয়লার স্তূপে গ্যাস হয়ে আগুন লেগে গেছে। কোলিয়ারির ওপরওয়ালারাই এখন দুহাতে রোজগার করে। সেই ক্লাবগুলোতে এখন নতুন গজিয়ে ওঠা সাহেব-মেমদের নাচগান মদ্যপান খিস্তি খেউড়ও চলে ওইভাবে সরকারের লুঠ করা পয়সায়।

এসব টাকা ঘোরাফেরা করে এই সব বাজারেই, তাই শিয়ালডাঙার বাজারেও

তার কিছুটা আসে। অবিনাশবাবুও এসব কথা শোনেন বেশ কিছু লোকজনের মুখে।

তিনি বাড়িতে দেখেছেন জীবনকে। জীবন এখন বাড়িতে কখন আসে যায় তার ঠিকঠিকানা নেই। অবিনাশবাবু ভেবেছিলেন জীবনও লেখাপড়া শিখে চাকরি করব। একটা শান্ত বাঁধাধরা জীবনের ছকের মধ্যেই থাকবে। কিন্তু জীবন সে পথেই যায়নি।

অবিনাশবাবু দেখেছেন বিজনকে। বিজন এখন প্রোমোশন পেয়েছে। এখন অফিসার্স হোস্টেলে থাকে। মাঝে মাঝে আসে অবিনাশের বাড়িতেও। দেশে পাকা বাড়ি করেছে বিজন। ভাইদের একজনকে ডাক্তারি পড়াচ্ছে। ছোটভাইকে কলেজে পড়াচ্ছে। বোনেদেরও বিয়ে দিয়েছে। সংসারের কথা বিধবা মায়ের কথাও ভাবে। অবিনাশবাবু মাঝে মাঝে জীবনের সঙ্গে বিজনের তুলনাও করেন। সেবার অসুখে পড়লেন অবিনাশবাবু। জীবনের পাত্তাই নেই। সে নিজের কাজ নিয়ে রাত দুপুর অবধি কোথায় থাকে জানে না কেউ। বাবার কথাও তার মনে নেই।

কমলা একা কি করবে জানে না। বিজনই আসে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে—ওষুধপত্র আনে। জীবন ফেরে সেই দুর্যোগের রাতে বৃষ্টিতে ভিজে, কি একটা কাজ নিয়ে ব্যস্তই ছিল সে। জীবনকে পকেট থেকে তাড়াতাড়া নোট বের করতে দেখেছেন। অবিনাশবাবু অবশ্য শুনেছেন এখানের অন্ধকারে জগতের অনেক কথা। তাদের দু-চারজনকে দেখেছেন। ভয় হয় অবিনাশবাবুর জীবন যেন অনেকটা তাদেরই মতো দেখতে। তার হাবভাব কথাবার্তায় মুখে চোখে একটা আদিম রুক্ষতা ফুটে ওঠে।

অবিনাশবাবু শুধোন,

—এত রাত অবধি এই দুর্যোগের রাতে কোথায় ছিলি। প্রায়ই রাতে বের হোস।

জীবন কঠিন কণ্ঠে বলে,

—কাজ থাকে।

অবিনাশবাবু বলেন, —কী এমন কাজ যে সারা দিনেও করা যায় না।

—ও তুমি বুঝবে না।

—কাজ তো বিজনও করে। আরও অনেকেই করে। তারা তো রাতদুপুরে বের হয় না।

বিজনের নাম শুনে জীবন চটে ওঠে। বলে সে,

—ওই ভিজে বেড়ালটা কিছু বলেছে আমার নামে? ও নিজে তো ওই কারখানায় মালিকদের দালালি করে ভদ্দরলোক সেজে। অবিনাশ বলেন,

—সে কিছুই বলেনি। সারা এলাকার লোক অনেক কথাই বলে। এত টাকা কোথায় পাস। কী করিস?

জীবন গর্জে ওঠে।

—এখানে সব শালাই সাধু। বলো তো কোন শালা বলেছে এসব? তাকে উড়িয়ে দোব।

অবিনাশ চমকে ওঠেন জীবনের কথায়। কমলা বলে,

—ওরে এসব ঝামেলায় যাসনে।

তারপর কমলা অবিনাশবাবুকে বলে,

—তোমাকেও বলি দোকানে বসে পাঁচজনের কথায় কান দিও না। জীবন আমার

ব্যবসা করে দুটো পয়সা ঘরে আনছে তাই লোকের হিংসে। যাও তুমি দোকানে যাও।

পরে জীবনকে বলে,

—হাত মুখ ধুয়ে নে বাবা। চা করছি।

অবিনাশ গজগজ করেন,

—ছেলেকে সাবধান করো কোনোদিন না বিপদে পড়ে আবার। যা দিনকাল পড়েছে। চারিদিকে তো শুনি খুনোখুনি বোমাবাজি চলছে এসব তো ছিল না। লোকের লোভ যত বাড়ছে গোলমালও তত বাড়ছে। বের হয়ে অবিনাশ দোকানের দিকে।

মনটা তার ভালো নেই। লোহা কারখানায়, ফার্টিলাইজার কারখানায় কত ছেলে কাজ করছে। সামান্য নিয়েই খুশি আছে তারা।

কিন্তু জীবনকে কি এক নেশাতে পেয়েছে। সে ছুটে চলেছে আজকের সমাজের এক নতুন শ্রেণীর লোভ ব্যাকুলতা নিয়ে। এদের ইঁদুর দৌড়ের শেষ কোথায় জানে না অবিনাশ। বিজনকে বাজারে দেখে ডাকলেন অবিনাশবাবু তাঁর দোকানে। আজ তার অফ্ ডে। বিজন এখন ছোটখাটো অফিসারের পদমর্যাদা পেয়েছে। ওই সাধারণ কর্মীদের মেস ছেড়ে এখন অফিসার্স মেসে থাকে। নিজের একটা ঘর, ওদিকে বাথরুমে, টয়লেট, একফালি কিচেন, সামনে এক টুকরো সবুজ লন। কিছু ফুলের গাছগাছালি আছে, পিছনের দিকেও একটু ফাঁকা। সেদিকেও একটা বারান্দা।

মাঝে মাঝে বিজন হোস্টেলের কিচেনের একঘেয়ে রান্নার স্বাদ থেকে মুক্তি পাবার জন্য নিজেই দু-একটা মাছ মাংসের পদ রান্না করে।

সে এখন কলকাতার পত্রপত্রিকার নিয়মিত লেখক। এখন তার বেশ কয়েকটা উপন্যাস বাজারে খুবই পরিচিতি লাভ করেছে। একটা উপন্যাস নিয়ে কোনো নামকরা চিত্র পরিচালক ছবিও করছেন।

বিজন তার কয়েকজন বন্ধুকেও তার হোস্টেলে খেতে বলেছে, ওদের মধ্যে রমেন বলে,

—আজ বিরিয়ানি আর চিকেন কারি হবে। আমি রান্না করব। তাই বিজন বাজারে এসেছিল। কাকাবাবুর ডাকে এগিয়ে যায়। অবিনাশবাবুর দেহে মনে এসেছে বার্ধক্য আর কিছু হতাশার ছাপ।

বিজন বলে—কেমন আছেন কাকাবাবু?

অবিনাশ দেখছে ওকে। বেশ সুখী নিশ্চিন্ত চেহারা বিজনের, তাতে কৃতিত্বের ছাপও পড়েছে। মনে পড়ে জীবনের কথা। জীবন যদি এমন হতে পারতো অবিনাশ-বাবুও নিশ্চিন্ত হতেন। তা হয়নি। অবিনাশ শুধোয়,

—তুমি তো রতনবাবু, মোহনবাবুদের চেন। নিতাইবাবুর ওখানে তো প্রায়ই যাতায়াত করো।

বিজন বলে—হ্যাঁ।

অবিনাশ বলে—নিতাইবাবুকে বলো না, জীবনটা যে কী করে। আমার ভয় হয়।

বিজন জানে জীবন এখন ওই রতনদের খুব কাছের লোক। আর বিজন দেখেছে জীবন রাতবিরেতে ফেরে। ওর পকেটে একটা চেম্বারও একদিন দেখেছে। এখানে কারখানা জোরকদমে চলার পর থেকে কোলিয়ারী দিনবদলের পর থেকেই বেশ একটা অন্ধকারের সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছে। যারা লুঠপাট ডাকাতি ওয়াগন ভাঙা এসব কাজ শুরু করেছে। অবশ্য এইসব কাজ যারা শুরু করেছে তারা সাধারণ ঘরের ছেলে, দমকা প্রচুর টাকা হাতাবার স্বাদ পেয়ে তারাও হিংস্র হয়ে উঠেছে।

তবে এদের পেছনে আছে শহরের নামী দামি কিছু ব্যবসাদার আর উঠতি নেতা। মোহনলাল রতনদের মত কিছু নেতা তারাই এদের লেলিয়ে দিয়ে লুঠপাট করায় আর মালের জিম্মা ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দেয়। এর বদলে কিছু টাকা পায় মাত্র। জীবন তাদেরই দলে ভিড়েছে।

কথাটা বিজন অবিনাশবাবুকে জানাতে পারেনি, তবে অবিনাশবাবু যে সেটা অনুমান করেছেন তা বুঝেছে বিজন। সে বলে,

—ঠিক আছে কাকাবাবু আমি বলব নিতাইবাবুকে।

অবিনাশ বলে,

—তাই বলো। ওসব ছেড়ে দোকানে বসুক জীবন। ব্যবসা বাড়াক। এর থেকে যা হবে তাই নিয়েই খুশি থাকুক। আমি নিশ্চিন্ত হব।

বিজন বুঝতে পারে বাবার কেন এই উৎকণ্ঠা। কারণ এতদিন কোম্পানিও ডামাডোলের মধ্যে ছিল। এখন একটা সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য বোর্ড গড়ে উঠেছে। তারাও এবার যেন নড়েচড়ে বসেছে।

এবার তাদের মালপত্র আর ওয়াগন ভেঙে যাতে চুরি না-হয় তার জন্য নিজেরাই ট্রেনে এখন সশস্ত্র পাহারার ব্যবস্থা করেছে। কড়া নজরদারি রেখেছে। দু'একবার তবু ওয়াগন ভেঙে মাল লুঠ করার চেষ্টাও করেছিল অন্ধকারের জীবগুলো। কিন্তু পুলিশও গুলি চালিয়েছিল। একজন মারা গিয়েছিল, কিন্তু পুলিশ তার কোনো পরিচয়ই পায়নি। তবে আরও সাবধান আছে তারা।

বিজনের মনে হয় জীবন ভুল পথেই গেছে। তাই বলে, অবিনাশবাবুকে—

দেখি নিতাইবাবুকে বলে।—তাই বল বাবা। তাই বল,

বিজন ভেবেছে কথাটা। মনে হয়েছে জীবন তাকে এখনও শ্রদ্ধা করে। সে নিজেই বলবে যাতে অবিনাশবাবুকে নিশ্চিন্ত করতে পারে। সীমা এখন বি. এ. দিয়ে এম. এ. পড়ছে। অবশ্য এখন আর এম. এ. পড়ার জন্য কলকাতায় যেতে হয় না। স্বাধীনতার পর বর্ধমানেও নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে গড়ে উঠেছে। এখান থেকে ট্রেনে ঘণ্টাখানেকের পথ।

সীমা এখন সেখানেই পড়ছে। ট্রেনে এখান থেকে দেড় ঘণ্টা লাগে। অনেক ছেলেমেয়েই এখন যাতায়াত করে। সীমা সেদিন ফিরছে স্টেশনে দেখা হয় বনানীর সঙ্গে। বনানীও চেনে সীমাকে। সীমাই বলে,

—তুমি!

বনানী এখানের লেবার অফিসারের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। তাদের মহিলা সমিতির একটা প্রোজেক্টের ব্যাপারে। স্টেশনে দেখা হতে বনানী এগিয়ে আসে।

—ক্লাস হয়ে গেল সীমাদি।

বনানী অবশ্য সীমার থেকে বয়সে অনেক বড়। তবুও সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে বলে বনানী ওকে দিদি বলেই ডাকে।

সীমা বলে—তুমি বনানীদি—

বনানী বলে,

—মেয়েদের সমবায়ের কাজে এসেছিলাম জেলা সদরে। সীমা বলে—বেশ আছো তোমরা। ওদিকে চাকরি এদিকে সমাজসেবা, মেয়েদের নিয়ে কাজ, নিজের কথা ভাবার সময় নেই। হাসে বনানী, ট্রেনটা চলেছে পানাগড় ছাড়িয়ে। এখানে মাটির রূপবদলের চিহ্নটা স্পষ্টতর হয়ে উঠে।

এদিকে সবুজ শ্যামল খেত, গ্রাম বসতি। বাংলার সজীব গ্রামের ছবিও ফুটে ওঠে স্নিগ্ধ ধরিত্রীর বুকে।

তারপরই শুরু হয় মাটির রূপ রংবদলের পালা। ক্রমশ উর্বর মৃত্তিকা অনুর্বর বন্ধ্যা লাল মাটিতে পরিণত হয়। তারপর আসে শালবন লালমাটি পলাশের বন। এখন এদিকে গড়ে উঠেছে দুর্গাপুরের বিশাল আধুনিক স্টিল কারখানা, অন্যান্য কলকারখানা।

তারপরই শুরু হয় কোলিয়ারির রাজ্য। মাটির উপর ঠেলে উঠেছে উঁচু পিট হেড গিয়ারগুলো। লাল মাটির অতল থেকে বের হয়ে কালো হিরের স্তূপ। সেই কয়লার জন্য এখানের মাটিও কালো হয়ে উঠেছে।

এখানের জীবনযাত্রার প্রাচুর্যের মাঝেও যেন অমনি কালো রং মাখানো। বনানী এদের জীবনযাত্রা দেখেছে। একটি মানুষকে সে ভালোবেসেছিল কিন্তু মানুষটা তাকে ভালোবাসেনি। সব হারিয়ে গেছে বনানীর। বনানীর পাশে কেউ নেই, তাই বনানী যেন নিজের একাকিত্ব নিঃসঙ্গতা ভোলার জন্যই ওইসব কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছে।

সীমার কথায় বলে বনানী,

—নিজের কথা ভেবে তো পথ পেলাম না সীমাদি, তাই এসবের মধ্যে রয়ে গেলাম। পাঁচজনকে সুখী দেখলে তবু নিজের দুঃখটা ভোলা যায়। সীমারও তার জেঠুমণির কথা মনে পড়ে। তিনিও সংসার করেননি। নিজের বিষয়ও দেখেন নামমাত্র। দেশের মানুষদের নানা সমস্যা—কোথায় জল নেই কোথায় হাসপাতাল স্কুল করতে হবে ওইসব নিয়েই ব্যস্ত।

সীমারও মনে হয় এসব কাজের মধ্যে বোধ হয় সত্যিকারের আনন্দের স্বাদ কিছু মেলে। অন্তত এরা তাই পেয়েছে। সীমা বলে—তোমার মহিলা সমিতির নাম শুনেছি, অনেক কিছুই করা হয় সেখানে। বনানী বলে,

—হ্যাঁ, হাতের নানারকম কাজ। গ্রামের অনেক মেয়ে আসে। এবার ভাবছি তাদের লেখাপড়ার ব্যবস্থাও করব। তা এসো একদিন আমাদের ওখানে। সীমা বলে,—গেলেই হয়। ঠিক আছে যাব।

ওদের স্টেশনে এসে ট্রেন পৌঁছায় তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। এখন চারিদিক আলোর ঝলক। পথে লোকজন—রিকশার ভিড়। ইদানীং ভিড় বেড়েছে মোটর

বাইক, গাড়িরও।

বনানীদের কারখানার ওদিকেই সীমাদের বাড়ি। ওরা চলেছে। আয়রন ফ্যাক্টরির টাউনশিপের মাঝখান দিয়ে। এখন বাংলোগুলোতে আলো জ্বলছে। টিভিতে গানের সুর ওঠে। ওদিকে বনানী-সীমা চলেছে, হঠাৎ সীমার মনে পড়ে বিজন কদিন থেকেই তাকে তাদের বিশ্ববিদ্যালের লাইব্রেরি থেকে কবেকার একটা বই-এর কথা বলছিল। সীমা আজ সেটা পেয়েছে। তাই যাবার পথে বিজনের হোস্টেলে নেমে বইটা দিয়েই যাবে।

রিকশাটা ওর হোস্টেলের পাশে আসতে সীমা বলে—একটু বসো বনানীদি, আমি বইটা একজনকে দিয়ে আসি।

সীমা গেটের ওদিকে চলে যায়।

ইংরেজ আমলের হোস্টেল। বিশাল এলাকা নিয়ে বাগান ঘেরা এলাকা। এখানে গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে এক একটা কটেজ। ওদিকেই বিজনের কটেজ, সেখানে আলো জ্বলছে।

বিজন আজ ব্যস্ত। বন্ধুরা অনেকেই তখনও আসেনি। রমেন এসে লুঙ্গি গেঞ্জি পরে কোমরে গামছা বেঁধে ডেচকিতে মাংস করছে। ওদিকে বিরিয়ানির চাল ভেজানো। বিজন রান্নাবান্নার কাজ কিছুই বোঝে না। হোটেলের একটা বয় ওদের সাহায্য করছে। এমন সময় বিজন সীমাকে আসতে দেখে চাইল, জিজ্ঞাসা করে—তুমি!

সীমা বিজনের হোস্টেলে আগেও এসেছে। ঐ বয়ও তাকে চেনে। রমেনও দেখে সীমাকে। সীমা এসব আয়োজন দেখে বলে কী ব্যাপার! বিরাট ভোজের আয়োজন, অথচ আমি জানি না। তবে গন্ধ পেয়ে ঠিক এসে পড়েছি।

বিজনও অপ্রস্তুত হয়ে উঠে। সীমাদের ওখানে প্রায়ই খেয়ে আসে, তাই আজ সীমাকে তাদের এই খাওয়ার আসরে নিমন্ত্রণ করতে চেয়েছিল বিজন কিন্তু বন্ধুরা কী ভাববে তাই ভেবেচিন্তে নিমন্ত্রণ করেনি।

বিজন বলে,

—না, মানে ওরা সব ধরলো ছবি হচ্ছে একটা উপন্যাসের তাই।

সীমা বলে,—তা ভালো, ভয় নেই ভাগ বসাব না। নিন আপনার বইটা। অনেক চেষ্টা করে পেয়েছি।

বইটা হাতে তুলে দেয়। ফরাসি লেখকদের লেখা বিজনের মন টানে। কাফ-কার এই বইটা পেয়ে সে খুশি। সীমাই বলে,

—চলি।

রমেন ওদিকে এর মধ্যে চা বানিয়েছে। এসে পড়েছে দু-একজন বন্ধু। রমেন বলে,

—চা তো খাবেন। অবশ্য আমি তৈরি করেছি, কেমন হবে জানি না, লোহা ঢালাইয়ের কাজ করি। চা ঠিক বানাতে পারব কি না জানি না।

সীমা দেখছে ওদের, কারখানার তরুণ কর্মী ওরা।

সীমা চা খেয়ে বলে—আজ চলি, আপনারা ব্যস্ত।

বিজন ওকে এগিয়ে দিতে আসে। সীমা বলে,

—বেশ আছেন দেখছি। চাকরির নিশ্চিন্ত জীবন, হইচই। ওদিকে লেখাপড়া। এবার এসবের মাঝে ঘর পাতুন। এই ভাবে হইচই করেই জীবনটা কাটবে?

হাসে বিজন। সে জানে তার দায়দায়িত্বের কথা। সীমাকেও তার বাড়ির কথাও বলেছে। বিজন বলে,

—অন্যদের কথা আগে ভাবি। তারপর নিজের কথা ভাবব।

সীমা দেখেছে তার জেঠুমণিকে। দেখেছে বনানীকে, বিজনকে, ওরা যেন হঠাৎ অন্য সকলের ভালো নিয়েই ব্যস্ত। কিন্তু দেখেছে রতন, আরও অন্যদের। আজ তারা নিজেদের কথাটাই বেশি করে ভাবে।

জীবনের আদর্শ মূল্যবোধ আজ এই আধুনিক সমাজে হারিয়ে গেছে। তবু তার মাঝে দু'একজন এখনও সেই পুরনো আদর্শের কথাই ভাবে।

বিজন বলে—পরে দেখা হবে। বইটা দেবার জন্য অনেক ধন্যবাদ। সীমা- বিজন আসছে গেটের দিকে। বিজন ওকে রিকশায় তুলে দিতে গিয়ে দেখে বনানীকে। মেয়েটিকে আগেও দেখেছে বিজন। অমনিতে মুখচেনা, মোহনলালের স্ত্রী। অনেক মিটিং-মিছিলে দেখেছে। মেয়েটির সতেজ কণ্ঠস্বরের ভাষণও শুনেছে। সীমাকে ওর সঙ্গে দেখে একটু অবাক হয় বিজন।

সীমা পরিচয় করিয়ে দেয়।

—এই বনানীদি। আর বনানীদি এ বিজন চৌধুরী। এখনকার নামী লেখক। আয়রন ফ্যাক্টরির ফোরম্যান। বনানী নমস্কার করে। সীমা রিকশায় উঠে চলে গেল।

বনানীদের কলোনিটা আর আয়রন ফ্যাক্টরি টাউনশিপের মাঝে। আগে বেশ কিছুটা ফাঁকা জমি পড়েছিল। ওটা কার জমি তার খবর অনেকে জানে না। এখন ওখানে এসে বসবাস শুরু করেছে পূর্ববঙ্গ থেকে আসা অনেক উদ্বাস্তু। তার মধ্যে ওই রুক্ষ প্রান্তর সবুজ করে তুলেছে। দু'একখানা পাকাবাড়িও উঠেছে। পথের ধারে গজিয়ে উঠেছে দোকানও।

বনানী বিজনের লেখা কয়েকটা উপন্যাস পড়েছে। কয়লাখনি নিয়ে বইটা তার ভালো লেগেছিল। বনানী বলে,

—আশ্চর্য ওকে এখানে দেখেছি পথেঘাটে। রিক্রিয়েশন ক্লাবের অনুষ্ঠানে। অথচ ও যে সেই লেখক বিজন চৌধুরী তা জানতাম না। তোমার সঙ্গে জানাশোনা হল কী করে?

সীমা একটু কেমন লজ্জা বোধ করে। সীমা বলে,

—বাইরে থেকে মানুষটাকে চেনা যায় না। বনানীদি, মানুষের বাইরের চেহারাটা আলাদা, ভিতরের সঙ্গে তার মিল অনেক সময় থাকে না।

বনানীও আজ বিশ্বাস করে, মোহনলালকে বাইরে থেকে দেখেই সে ভুল করেছিল,

সীমা এসেছে ওদের সমবায়ে। ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি টাউনশিপের মধ্যে নিজেদের স্টাফদের জন্য বাজার করে দিয়েছে। একসময় ওখানে একটা প্রাচীন মন্দিরও ছিল একটা বড় পুকুরের ধারে একটা প্রাচীন বট কয়েকটা সাবেকি আমলের

দীর্ঘ তালগাছ ছিল এই প্রান্তরে। তারপর টাউনশিপ গড়ে উঠেছে। তবু সেই প্রাচীন মন্দিরটা, যা এতদিন মাঠের মধ্যে জনমানবহীন পরিত্যক্ত হয়ে পড়েছিল এই টাউনশিপের কল্যাণে সেটা এখন আবার স্বমহিমায় জাগ্রত হয়ে উঠেছে। একজন গ্রামের গাঁজাখোর মাঝে মাঝে এই মন্দির চাতালে বসে বাবাকে নিবেদন করে নিজেই গাঁজা টানে। সেই গজাননই এখন এখানে লাল কাপড় পরে বাবার নামভক্ত হয়ে জাঁকিয়ে বসেছে। এখন এদিকে টাউনশিপের এটিই প্রাচীন দেবতা। তাই প্রণামীও ভালোই পড়ে। আর গজানন বাজার থেকে বাবার ভোগের জন্য তোলাও তোলে। বাবার মন্দির বেশ জমে উঠেছে। তারই একদিকে একটা বড় লম্বা চালার মধ্যে এদের সমবায়। জায়গাও দিয়েছে কোম্পানি তারা চালা শেডও করে দিয়েছে শ্রমিক কল্যাণ তহবিল থেকে।

বনানী আরও বেশ কিছু মহিলা উদ্যোগ নিয়ে গ্রামীণ কারখানার শ্রমিক মেয়েদের নিয়ে এখানে তাঁত-চামড়ার কাজ—বিভিন্ন সেলাইয়ের কাজ করে। আর আসানসোলের বাজারে বিক্রি করে। খাদি গ্রামোদ্যোগ থেকেও কাজ দেয় এদের।

সীমা দেখছে বিভিন্ন বিভাগ। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। কর্মচারীদের অনেকেই নেই। তবু সীমা বুঝতে পারে এরা একটা ভালো কাজই করছে এখানে। সীমা বলে,

—আজ চলি বনানীদি। পরে একদিন আসব।

সীমা বনানীকে ওর কোয়ার্টারে ছাড়তে চলেছে। সাজানো টাউনশিপ গড়েছে সার কারখানা। কারখানা অবশ্য এদের টাউনশিপ থেকে একটু দূরে। বড় রাস্তার ওপারে বিশাল মাঠ জুড়ে। ওখানে এখন ভালো প্রোডাকশন শুরু হয়েছে। দেশে সারের প্রচুর দরকার তাই সরকার এখন ভারতের বিভিন্ন জায়গাতে সার-কারখানা গড়ে তুলেছে। মালের চাহিদা তবু মেটাতে পারছে না।

সুখী কলোনি। কোয়ার্টারগুলো সাজানো সামনে বাগান, তাতে কেউ ফুলের চাষ করেছে। কেউ কেউ আম, কাঁঠাল প্রভৃতি গাছও লাগিয়েছে। আজ অহল্যা মাটিতে সার জল নিয়মিত পেয়ে গাছগুলো বেশ বেড়ে উঠেছে। পেঁপে হচ্ছে প্রচুর। আমের মঞ্জরী এসেছে অনেক গাছে, বাতাসে ওঠে কাঁঠাল ফুলের তীব্র সুবাস।

রিকশাটা এসেছে বনানীর কোয়ার্টারের সামনে। বনানী বলে—এই আমার কোয়ার্টার সীমা। এসো একদিন। হঠাৎ একটা মোটর বাইকের শব্দ শুনে চাইল সীমা। সে বনানীকে নামিয়ে রিকশাটা নিয়ে চলেছে। দেখে বনানীর কোয়ার্টারের সামনে একটা মোটরবাইক এসে থামলো। আর নামছে রতন।

রতন গাড়িটা লক করে চাবি ঘোরাতে ঘোরাতে খুশিমনে বনানীর কোয়র্টারে গিয়ে ঢুকলো। সীমা একটু অবাক হয়।

বনানীকে দেখেছিল সীমা আগে মোহনলালের সঙ্গে। তারপর দেখেছে বনানী চলে এসেছে এখানে। তাতে অবশ্য কিছুটা বিস্মিত হয়ে ছিল সীমা। এবার আরও বিস্মিত হয় রতনকে ওইভাবে সটান এই সময় ওর কোয়ার্টারে যেতে দেখে। মনে হয় রতনের এখানে গতিবিধি আছে না হলে ওই ভাবে ভিতরে যেতে পারত না। রতনকে চেনে সীমা। ওদের জগৎটা আলাদা বনানীর মতো মেয়ে রতনকে কী

ভাবে মেনে নেবে তা ঠিক সে অনুমান করতে পারে না। তবে এই লোহা কলোনিতে কোলিয়ারিতে অনেক কিছুই ঘটে, সহজ বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা মেলে না।

জীবন এখন তার দলবল নিয়ে রাতের অন্ধকারে ওই স্ল্যাগ ব্যাঙ্ক থেকে স্ল্যাগ পাচারের কাজ জোরকদমে চালিয়েছে। অবশ্য এখন সে সুখলাল শেঠকে মাল দেয় না। কারণ ওই শেঠজী ঠিকমতো টাকা দেয় না। টাকা দিত সে রতনকে। রতন জীবনকে কিছু দিত। অবশ্য জীবন ক্রমশ এই লাইন চিনে গেছে। তাই সে এবার নতুন মহাজন পেয়ে গেছে। নিজেই লোকজন নিয়ে মাল তুলবে। আর যোগান দেবে। স্ল্যাগ ব্যাঙ্কের এই ব্যবসার কথাটা ঠিক ঠাহর হতে দেয়নি কার্তিকবাবু। এখন সে মরিস সাহেবের উত্তরাধিকারী মিঃ মিত্র আর সেকেন্ড ম্যানেজার মিঃ প্রধানকে প্রণামীটা দেয়। বাগান বাড়িতে এনে আদর আপ্যায়ন করে যাতে স্ল্যাগের ভারটা তার উপরই ছেড়ে রাখে তারা।

রতন জীবনদের নিয়ে স্ল্যাগ বের করে পাচার করে মহাজনের আড়তে। কার্তিকবাবু পায় তার অর্ধেক। জীবন এটা দিতে রাজি নয়। সে বলে—ঝুঁকি নিয়ে মাল বের করবো আমরা, পাচার করবো আমরা, ওর কি ওইসব মাল যে ওকে টাকা দিতে যাবো। দরকার হয় তুমিই সাহেবদের সঙ্গে কথা বলো। মাঝখানে কার্তিকবাবু কেন থাকবে?

রতনকে সাবধানে কাজ করতে হয়। সে স্বপ্ন দেখছে সামনের ইলেকশনে তাকেই এম. এল. এ. করে টিকিট দেবে দল। এইবার এম. এল. এ. হতে পারলে সে তার আসন কায়েম করে নেবে। নিতাইবাবু কোনদিন ভোটে দাঁড়াবেন না। তাই রতনকেই তারা আবার দাঁড় করাবে। তারপর সে হবে মন্ত্রী।

ইদানীং সে মেয়েদের ভোট পাবার জন্য বনানীর সঙ্গেও সম্পর্কটা গড়ে তুলতে চায়। তার ভাবমূর্তিটাও বজায় রাখতে চায়, জনগণের সামনে। সাহেবদের সামনেও, না হলে কারখানায় শ্রমিকদের সমর্থনও পাবে না। তাই কম হলেও পিছন থেকে তাই নিয়েই খুশি থাকতে হবে তাকে। দুচারজনকে ভাগও দিতে হবে। তাই বলে—কার্তিকবাবুর পিছনে কাঠি দিতে যাসনে। ওর হাতে এখন অনেক টাকা। কোলিয়ারির এক নম্বর মাফিয়াও, ওর হয়েই কাজ কর। পয়সা যাতে বেশি পাস তার জন্য বলবো।

ওর সঙ্গে গোলমাল করিস না। লাইনে থাকতে পারবি না, জীবনও জানে কার্তিকবাবুর এখন বেশ নামডাক। এই মহলে তবু বলে—বলে দ্যাখো। টাকা কিন্তু বেশি দিতে হবে।

জীবনের এখন নজর টাকার দিকে। বাড়িতে মাকে অবশ্য কিছু দেয়। অবশ্য এখন তার অন্য একটা খবরও বেড়েছে ওই জীবন হঠাৎ যেন একটা নতুন স্বীকৃতি পেয়েছে প্রতিমার কাছে প্রথম দেখেছিল প্রতিমাকে আসানসোল এর পথে। ঠা ঠা রোদ্দুর। দুপুর পথঘাটে লোকজন নেই। জীবন মোটরবাইক নিয়ে গিয়েছিল শেঠ সুখলালের ওখানে। কয়েক কিস্তি মালের বকেয়া টাকা আনতে।

টাকাটা পেয়েছে সে, আসছে হঠাৎ পথের মাঝে একটি মেয়েকে দৌড়তে দেখে

চাইল জীবন। পিছনে তিনচারজন ছেলে নির্জন পথ। রেল কোম্পানির ছায়াময় পথ দিয়ে সর্টকাট করে বের হয়ে স্টেশনে যাচ্ছিল মেয়েটি। আর ওই বদমাইস ছেলেগুলো ওতার পিছু নিয়েছে একটা জিপ করে। ইদানীং শহরে নানা অন্ধকার ব্যবসা চোলাই মদ হেরোইন মদের ব্যবসা করে কিছু ছেলের হাতে প্রচুর পয়সা আসছে। তারা জানে তাদের উপর কোন দাদাও আছে। তারাই তাদের গড ফাদার, পুলিসের হাত থেকে ওরাই তাদের ছাড়িয়ে আনে নিজেদের প্রয়োজনে। তাদের কয়েকজন ওই মেয়েটাকে গাড়িতে তুলে নিয়ে যেতে চায়। মেয়েটি ভয়ে দৌড়চ্ছে জনহীন পথ। কোয়ার্টারগুলোও দূরে দূরে। তার দরজ-জানলাগুলোও বন্ধ।

এবার জীবন ব্যাপারটা বুঝতে পেরে তার বাইকে স্পিড তুলে ছুটে আসে। ধাবমান দুতিনটে ছেলেকে বাইক থেকেই পা তুলে সপাটে লাথি মারতে তার ছিটকে পড়ে, আর বেগতিক দেখে গাড়িটা এবার মেয়েটাকে ছেড়ে পাশের রাস্তা দিয়ে টার্ন নিয়ে স্পিড তুলে বের হয়ে যায়।

জীবন এবার দুতিনটে আহত ছেলেকে তুলে জবাব দিতে তারা কোনোমতে পালায়। মেয়েটি ভয়ে বিবর্ণ মুখে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ এমনি সব বিপজ্জনক নাটক ঘটবে তা ভাবেনি সে। জীবন ওর দিকে এগিয়ে আসে। ভীত কণ্ঠে বলে,

—আমাকে ছেড়ে দিন। দয়া করুন...

জীবন ওর মানসিক অবস্থাটা বুঝেছে। সে বলে,

—কোন ভয় নেই তোমার।

মেয়েটি ওর কণ্ঠস্বরে এক আশ্বাসের সুর শুনে চাইল। জীবন শুধায়—কোথায় থাকো?

মেয়েটা ভীতকণ্ঠে বলে,

—শিয়ালডাঙার কাছে আজাদ কলোনিতে। এখানে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে কার্ড রিনিউ করতে এসেছিলাম। স্টেশনে ফেরার পথে ওরা এসে পড়লো। জীবন দেখছে মেয়েটিকে। শ্রী একটা ছিল, সৌন্দর্যও। সেটা মেয়েটা জন্মসূত্রে পেয়েছিল। কৃপণ ঈশ্বর যেন ভুল করে তাকে ওটা দিয়ে সেই ভুল শোধরাবার জন্য ওকে একটা অভাবের মধ্যে শূন্যতার মধ্যে রেখেছে যাতে ওই রূপও ম্লান হয়ে গেছে প্রাত্যহিক জীবনের কাঠিন্যের আঘাতে।

জীবন বলে,

—আমি শিয়ালডাঙায় বাবুপাড়ায় থাকি। কোনো ভয় নেই, চল তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি। ওঠো গাড়িতে। অবশ্য আমায় যদি ভরসা করতে পারো।

মেয়েটি দেখছে জীবনকে। ওই তাকে আজ চরম অপমানের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। মেয়েটি বলে—না, না। চলুন।

ওর বাইকে ওঠে মেয়েটি। বেলা হয়ে গেছে। জীবনের দিনমানের খাওয়ার কোনো স্থিরতা নেই। যখন যেখানে থাকে সেখানেই খেয়ে নেয়। তাই মোটর সাইকেলটা নিয়ে বড় রাস্তার ধারে একটা নামী দামি রেঁস্তোরায় ঢোকে। ঝকঝকে পরিবেশ দুপুরের গরমের মধ্যেও এখানে ঠাণ্ডা মেসিন চলছে, এখানের আবহাওয়াকে ঠাণ্ডা আরামদায়ক করেছে। মেয়েটি এর আগে এরকম পরিবেশে

আসেনি। জীবন শুধায়, কী খাবে?

মেয়েটি সেই সকালে তাদের কলোনির বাড়িতে লাল চালের গলা গলা ফ্যানা ভাত আর আলুসেদ্ধ খেয়ে ট্রেনের ভিড়ে কোনোমতে এসে এতটা পথ হেঁটে অফিসে এসেছিল। সেখানে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় ঘণ্টা দুয়েক। দেশে কত বেকার সংখ্যা তা সঠিক কেউই জানে না। তবে একটা এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে তাদের লাইন দেখে হতাশই হয় প্রতিমা। তার মতো মেয়েও বহু এসেছে। তাদের সকলের মুখেই হতাশার কালো ছায়া।

এত কলকারাখানা হয়েছে, কাজের ক্ষেত্র তবু বাড়েনি। ওখানে কাজ পায় অন্যরা, এরা শুধু বছরের পর বছর ধরে ওই নিয়োগক্ষেত্রের দরজাতেই ঘোরে মাত্র। পেটের দানাপানিও হজম হয়ে গেছে। প্রতিমার ট্রেনেরও দেরি রয়েছে। স্টেশনে বসেই থাকতে হতো খিদের জ্বালা সহ্য করে। আজ এমন পরিবেশে এসে খাবার ডাক পাবে তা ভাবেনি তবু সলজ্জভাবে প্রতিমা বলে,

—বাড়িতে খেয়ে এসেছি।

জীবন বলে সে তো কবে হজম হয়ে গেছে। আমারও খিদে পেয়েছে। লাঞ্চের অর্ডার দিই।

ফ্রাইড রাইস, চিলি চিকেন আর দামি আইসক্রিমের অর্ডার দিয়ে জীবন শুধোয়,

—তোমার নামটা তো জানা হয়নি। আমার নাম জীবন। জীবন চৌধুরী। প্রতিমা সলজ্জভাবে নামটা জানায়। জীবন বলে,

—নাও। হাত মুখ ধুয়ে এসো, ওরা খাবার দিয়ে যাবে। এখান থেকে বের হয়ে একটা কাজ সেরে ফিরব আধঘণ্টা দেরি হবে। তোমার অসুবিধা হবে না তো।

প্রতিমা এর মধ্যেই ছেলেটাকে বিশ্বাস করে ফেলেছে। আর দেখেছে এমনিতে ভদ্র বিনয়ী। তার দেখা সমাজের ছেলেদের থেকে স্বতন্ত্র। প্রতিমার মনে হয় ওর উপর নির্ভর করে চলে। মেয়েদের সাবধানী মনের পরীক্ষায় জীবন যেন প্রাথমিক ভাবে পাস করে গেছে। বেয়ারা খাবার আনে। টেবিলে রাখতেই বাসমতী চাল জাফরানের খুশবু বাতাসে ভেসে ওঠে। প্রতিমার কাছে এসব খাবার অনাস্বাদিত পূর্ব। তাই সে বেশ তৃপ্তি করেই খায়।

শেঠ সুখলাল এই শহরের অন্যতম নামী দামি লোক। শহরে তার দুতিনটে সাজানো শোরুম। দামি শাড়ি পোশাকের দোকান, ওদিকে বিশাল শোরুম—নানা ইলেকট্রনিক গুডস কালার টিভি। ফ্রিজ, ওয়াশিং মেসিন রয়েছে।

পথের ওদিকে একটা বড় বাড়ির একতলায় গাড়ি, মোটর বাইক, ট্রাক্টরের শোরুম। সবই সুখলালের। এ ছাড়া এখন আরও সব ব্যবসা, কনট্রাক্টর ফার্মও রয়েছে। এখন সরকারি মহলে কিছুটা সুপ্রতিষ্ঠিত সে। অনেক বড় বড় ব্রীজ বিল্ডিং রোড এসব তৈরির সরকারি ঠিকাও নেয়, রেলেরও একনম্বর কনট্রাক্টর।

এসব তার বাইরের পরিচয় আসলে সে এখন নতুন হোটেলও করেছে। সাজানো বাগান বিশাল কমপাউন্ড সেই হোটেলে ওঠে সারা দেশের কয়লা ব্যবসায়ীরা। এখানের কয়লাই যায় উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, গুজরাট, মহারাষ্ট্র। সুখলাল এখন

কয়লার পারমিট রোড পরিবহনের কারবারও করে।

সরকারি স্টক থেকে পারমিট ও কয়লা যায়। সুখলালের এক ম্যানেজার সার এলাকায় কোলিয়ারির যত পারমিট পারে নানা ভাবে সংগ্রহ করে। সুখলালের নিজের কয়লার স্টকও আছে, সেখানেই রাতের অন্ধকারে সংগ্রহীত বিশাল পরিমাণ কয়লা আসে। সত্যি মিথ্যা পারমিট চালান দেয় সারা ভারতে, পাচার হয় হাজার হাজার টন কয়লা।

জীবন দেখেছে এই দুনম্বরি কয়লার ব্যবসাটা কোলিয়ারি যখন ব্যক্তিগত মালিকানাতে চলতো তখন ছিল না। কয়লা সহজেই মিলতো এসব পারমিট চালানের রমরমাও ছিল না। এটা শুরু হয়েছে কোলিয়ারি জাতীয়করণের পর। বে-আইনি ভাবে কয়লা বেশি পরিমাণ তোলা হচ্ছে, চুরি করেও রোজ হাজার হাজার টন কয়লা উঠছে। প্রকৃতির সঞ্চিত সম্পদের পরিমাণও সীমিত। এভাবে লুঠতরাজ চললে তাও ফুরোতে দেরি হবে না।

কথাটা জীবনকে সেদিন ভূতপূর্ব কোলিয়ারি মালিক আনন্দবাবুই বলে। জীবন আনন্দবাবুকে চেনে। আগে ছিল কোলিয়ারি মালিক এখন শেষ সম্বল দিয়ে শহরে এই রেস্তোরাঁ করেছেন। জীবন এখানে প্রায়ই আসেন। আনন্দবাবুও জানে জীবন কোম্পানির সাথে যুক্ত। তাই খোঁজখবর নেয়।

—আমাদের কোলিয়ারির খবর কি হে জীবনবাবু?

আনন্দ তার সেই স্মৃতি-বিজড়িত কোলিয়ারির কথা ভুলতে পারে না। আনন্দবাবু আজ সেখানে অনাহুত। যে কোলিয়ারিতে সে জন্মেছিল, মানুষ হয়েছে। যার অন্নে প্রতিপালিত একদিন যেখানে রাজত্ব করেছে আজ আনন্দ সেখানের কেউ নয়।

এখন সেখানে সরকারি ম্যানেজার এসেছে। তার আমলের স্টাফরা এখন সরকারি কর্মচারী। ম্যানেজারের নতুন বাংলো তৈরি হয়েছে। তৈরি হয়েছে বেশ কিছু তিনতলা বিল্ডিং, স্টাফ কলোনি। জীবন বলে,

—সেখানে তো মচ্ছব চলছে আনন্দদা। আপনারা দুপুরুষ ধরে কোলিয়ারির মাল মজুত রেখে ব্যবসা করেছেন। এখন চলছে লুঠতরাজ। অবশ্য আমরাও ছিটেফোঁটা পাচ্ছি। আনন্দ শোনে বলে—এভাবে লুঠতরাজ চললে কয়লা যখন ফুরোবে তখন কী হবে এদের।

জীবন বলে—বুঝবে শালারা। এখন তো লুঠপাট চলুক—

—এ যে হাঁস মেরে ডিম খাওয়া। আনন্দ বলে এই ভাবে চললে ক'বছরেই বহু কোলিয়ারি বন্ধ হয়ে যাবে। তখন এদের রাজ্যপাট চলবে কী করে।

জীবন বলে,

—এটা আপনারা ভাবতেন। তাই কোলিয়ারি ছিল। এখন কদ্দিন চলে দেখুন।

—আমরা চারশো বাহান্ন জন কোলিয়ারি মালিক ডাকাতই ছিলাম; কিন্তু এখন যে লক্ষ লক্ষ কর্মচারীকে এরা চোর বানিয়ে দিল হে।

জীবন বলে,

—আপনারা চল্লিশ টাকা টন চেয়েছিলেন কয়লার দাম। সরকার হটিয়েছিল আপনাদের। এখন কয়লার দাম বেড়ে হয়েছে তিনশো টাকা টন।

আনন্দ বলে, তাতেও এদের পেট ভরছে না। পাছে এসব কাজে বাধা দিই আমরা, তাই সরকারি ম্যানেজমেন্ট কোনো কোলিয়ারি মালিককে রাখেনি। তাদের কীভাবে দিন চলছে তা সরকার খবরও রাখে না।

জীবন দেখেছে এদের অবস্থাটা। বেশ কিছু কোলিয়ারি মালিক সব হারিয়ে পথে নেমেছে।

প্রতিমা ওদের কথাগুলো শোনে। সে এদিকে নতুন, কোলিয়ারি দেখেছে মাত্র তার অন্তরালের করুণ কাহিনিগুলোর কথা সে জানে না। জীবন এসেছে শেঠ সুখলালের হোটেলে। এখানে এমন সব বিলাসবহুল জায়গা আছে প্রতিমা তা জানতো নয়। তার জগৎটা খুবই ছোট সেখানে দেখেছে নগ্ন অভাবের ছায়া। আজ দেখে অন্যদিকে প্রাচুর্যের ঝলকানি।

সুখলাল এখন এখানের দুনম্বরি কয়লার বাজার কন্ট্রোল করে হোটেলের ঠাণ্ডা ঘরে বসে। প্রতিমা দেখেছে আগেকার কোলিয়ারি মালিককে, দেখেছে এখনকার কয়লা ব্যবসাটাকে। আজ ওরা যে সর্বস্ব লুঠ-পাটই করেছে সেটা বুঝতে অসুবিধা হয়নি প্রতিমার। এদের কাছে টাকার কোনো দামই নেই। অথচ বিশাল একটা শ্রেণী অর্থের জন্য দুবেলা খেতেও পায় না।

প্রতিমা ফিরছে জীবনের সঙ্গে। তখন বিকেল নেমেছে রুক্ষ প্রান্তরে তখনও দাবদাহ চলেছে। জীবন এখানে যন্ত্রণাময়। তবু মানুষ বেঁচে আছে।

জীবন এসেছে প্রতিমাদের বাড়িতে। তখন সন্ধ্যা নামছে। প্রতিমার মা, বৃদ্ধ বাবা, তখন তাঁর পথ চেয়ে আছে।

—এত দেরি হল কেন?

প্রতিমা অবশ্য এই শহরে সেই বিপদের কথাটা জানায় না বাবা-মাকে। শুধু বলে,

—কাজে আটকে গেছিলাম বাবা। ট্রেনেরও গোলমাল-এর সঙ্গে দেখা। জীবনবাবু শিয়ালডাঙাতেই থাকেন।

জীবনই এবার নিজের পরিচয় দিয়ে বলে,

—শহরে এলাম, দেখা হল।

প্রতিমার বাবা বলে জীবনকে,

—বড় উপকার করলে বাবা। এই ভাবে সব হারিয়ে এসে পড়েছি ছেলেপুলেদের নিয়ে। কী করে যে দিন চলে তা জানি না।

জীবনও দেখেছে এদের অবস্থা। প্রতিমার দাদা নরেশ বাজারে আনাজপত্র বিক্রি করে, কিছু পায়। আর ছোট ভাইটার পড়াশোনাও তেমন হয় না। সেও দাদার সঙ্গে আনাজ বিক্রির কাজ করে। প্রতিমা হায়ার সেকেন্ডারি পাস করে এখন টাউনশিপে দুতিনটে বাচ্চাকে পড়িয়ে কিছু পায়।

জীবনও ভাবছে এদের কথা। বাজারের বড় দোকানদার দত্তমশায় তার চেনা। দত্তমশায়কে জীবন অনেক বিপদ থেকে উদ্ধার করেছে।

জীবন বলে,—আপনার ছোট ছেলেকে কাল আমার সঙ্গে গিয়ে অফিসে দেখা করতে বলবেন বিকেলে। দেখি ওর যদি কোনো কাজের ব্যবস্থা করতে পারি।

ওর ছোট ছেলে ভবেশ বলে,

—তাই যাব জীবনদা।

জীবন বলে—আমি চলি।

প্রতিমা ওকে বড় রাস্তা অবধি এগিয়ে দিতে আসে। গাছগাছালি ঢাকা পথ। জীবন দেখছে প্রতিমাকে। ওর মুখে এসে পড়েছে একটু কৃপণ আলোর আভা। বলে প্রতিমা,

—আবার আসবেন কিন্তু।

জীবন হাসে। আজ হঠাৎ এতদিনের পথ চলার মাঝে সেও যেন একটু সবুজ মরূদ্যানের স্নিগ্ধতা পেয়েছে। বাড়িতে কোনো আকর্ষণই তার নেই। বাবা অবিনাশবাবু তাকে যেন দেখতেই পারে না। মা এখন টাকা পেয়ে চুপ করে থাকে। না পেলেই মুখ ভার হয়ে যায়।

একদিন এই কলোনিতে এসে জীবন যেন একটা আশ্রয়ের সন্ধানই পেয়েছে।

দত্তমশায় জীবনকে চেনে ভালো করেই। তার ব্যবসাপত্র বজায় রাখার জন্য ওদের মতো ছেলেদের দরকার। থানা পুলিশ এখানের মস্তানবাহিনি ওর হাতে। দত্তমশায় আগে তার মালের ট্রাকে হানা হতে জীবনের কাছেও গেছল। জীবনকে অবশ্য প্রণামী কিছু দিতে জীবন তিনদিনের মধ্যে দুজন ছিঁচকে চোরকে ধরে আর তাদের বস্তি থেকে একলট দামি মালও উদ্ধার করে দেয়।

এরপর থেকে আর কোন গোলমাল হয়নি। কয়েকজন কর্মচারী দল পাকিয়ে তার কারখানা শোরুম ধর্মঘটও করেছিল পূজার মুখেই। তিন-চার দিনে লাখখানেক টাকা লোকসান হয় দত্তবাবুর। তিনি এবার জীবনের শরণাপন্ন হতে পরদিনই সে ধর্মঘটী শ্রমিকদের উপর বোমা মেরে, দুতিনজনকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধোলাই দিতে তাদের ধর্মঘট ভেঙে যায়।

দত্তমশায় তাই এখন জীবনকে সমীহ করে চলে।

ওর কথায় বলে দত্তমশায়,

—তোমার লোক!

ভবেশকে এনেছে জীবন দত্তমশায়-এর গদি ঘরে। গণেশাদি পঞ্চদেবতা পরিবেষ্টিত হয়ে বসে দত্তমশায় তার লাভের হিসাব করছিল। ভবেশের কথা বলেছিল জীবন, এই ছেলেটিকে দেখে জীবনকে বলে,

—এরই কথা বলছিলে?

—হ্যাঁ। খুব কাজের ছেলে। ওকে যদি রাখেন—

দত্তমশায় জানে জীবনের এটা অনুরোধ নয়, আদেশই। তাই বলে,

—তুমি যখন বলছ দেখি। তবে প্রথমে ওকে শ'পাঁচেক করে দোব।

কাজ তো জানে না। শিখে পড়ে নিতে পারলে মাইনে হাজার টাকা হবে তিনমাস পরে।

ভবেশ বলে—তাই হবে স্যার।

এই টাকাও এখন তার কাছে অনেক দামি। তাই কাজটা হয়ে গেল তার।

প্রতিমার বাবাও খুশি। বৃদ্ধ দেবেশবাবু বলে,

—তবু তোমার জন্য ছেলেটার একটা গতি হল বাবা। এখন মেয়েটার কথা ভাবছি।

জীবন বলে,

—দেখছি, প্রতিমার যদি কোনো কাজের ব্যবস্থা করতে পারি। এখন জীবন প্রায়ই এদের বাড়িতে আসে।

তার পকেটে টাকার অভাব নেই। বেহিসাবি টাকা অনেক থাকে। এখন তাই তার থেকে কিছু ভবেশবাবুর সংসারেও যায়। ভবেশবাবুর স্ত্রী প্রতিমার মা অবশ্য জীবনের আনা বড় মাছ—অসময়ের ফুলকপি, নলেন গুড় এসব দেখে বলে,

—এতসব আনো কেন বাবা। ওরে প্রতিমা ভালো করে রান্না কর। আজ জীবন এখানে খেয়ে যাবে।

জীবন এখন প্রতিমাকে নিয়ে মাঝে মাঝে বের হয় শহরে। প্রতিমাও ওই কলোনির জীবন থেকে যেন মুক্তি পেতে চায়। তাই শহরের প্রাচুর্যের মধ্যে এসে তার মনও লোভী হয়ে ওঠে। জীবন ওর জন্য দামি শাড়ি জুতো পোশাকও কেনে। প্রতিমাও খুশি হয়। আর তার মনে আরও অনেক পাবার স্বপ্নই জাগে।

লক্ষ্মীপূজার আয়োজন হয় কলোনিতে বেশ ধুম করেই। অবশ্য জীবন বলে,

—যাদের ঘরে লক্ষ্মী বিরাজমান তারা লক্ষ্মীপূজা করে না। গণেশপূজা করে। প্রতিমা বলে তোমার লক্ষ্মীলাভ হয়েছে, আমাদের হয়নি—তাই জীবন বলে—না না। লক্ষ্মীর সন্ধানই পেয়েছি, লক্ষ্মীলাভ এখনও হয়নি।

—তাহলে চেষ্টা করো। বলে প্রতিমা।

জীবন বলে—বেশ তো চেষ্টা করছি। দেখি লক্ষ্মী সদয় হন কি না। প্রতিমার মা বলেন—সন্ধ্যায় আজ আসবে বাবা।

জীবনের রাজ অনেক কাজ পড়েছে। এসব কাজের কথা এদের বলেনি সে।

ওদিকে মোহনলালও বসে নেই। সে এখন কার্তিকবাবুর দলেও নেই। এখন রতনকে নিয়েই ব্যস্ত কার্তিকবাবু। মোহনলালও জানে স্ল্যাগ ব্যবসার খবর। এখন সে কারখানার ছাঁট বিক্রি করে হাওড়ার কারখানার জন্য তারা একদিন রতনের কাছেই স্ল্যাগ নিত। রতনের এটা একচেটিয়া ব্যবসা কার্তিকবাবুই ম্যানেজ করতো।

এখন মোহনলাল হাওড়ার ব্যবসায়ীদের চাপে নিজেই এবার স্ল্যাগের ব্যবসাতে নেমেছে। সেও এখন কারখানার সেকেন্ড ম্যানেজার মিঃ রায়ের লোক। মিঃ মিত্র ওয়ার্কস ম্যানেজার হয়ে এখন কার্তিকবাবুর হাতে লাখলাখ নেন। মিঃ রায় তার হিস্যা না পেয়ে এবার নিজেই মোহনলালকে ভরসা করে তাকে মদত দিয়ে চলেছেন।

স্ল্যাগ ব্যাঙ্কের এলাকা বিশাল। ওই পাহাড়তলির অরণ্যভূমি থেকে শুরু হয়ে এখন দীর্ঘ বৎসরের স্ল্যাগ জমে পাহাড় হয়ে গেছে। ওদিকে কোম্পানি এখন নিজেই স্ল্যাগ-এর ব্যবসা শুরু করবে। মোহনলালও এর মধ্যে অন্যদিক থেকে স্ল্যাগ তুলে চলেছে। রতন জীবনরা সেটা দেখেছে। অর্থাৎ তাদের ব্যবসাতে অন্যরা ভাগ বসাতে এসেছে। তাই বোধ হয় কোম্পানি নিজে এবার এই ব্যবসাতে নামবে। তাতে অন্য অফিসারদের আমদানি হবে। দুশো টন মাল বিক্রি করবে আর খাতায় জমা হবে

পঞ্চাশ টনের দাম।

মোহনলালের জন্যই এটা সম্ভব হবে। তাই রতন জীবনরা চায় এখান থেকে মোহনলালকে হঠাতে। কারণ মোহনলাল-এর মধ্যে টন প্রতি পঞ্চাশটাকা কম দরে মাল দিচ্ছে। ফলে পার্টিরা ওদিকে যাচ্ছে,

রতন বলে,

—জীবন, এই ব্যবসা তো দেখি চৌপাট করে দেবে ওই মোহনলাল।

জীবনও দেখেছে এখান শেঠ সুখলালও বলেছে তাদের দর কমাতে না হলে তারা মোহনলালের মালই নেবে।

তাই জীবন বলে—ব্যাটাদের একদিন ঘা দিতে হবে।

রতন বলে—যদি গোলমাল হয়।

রতন প্রকাশ্যে গোলমাল করতে চায় না। জীবন এখন অনেক সাহসী হয়েছে।

সে বলে—হলে হবে। ব্যাটাদের হঠাতেই হবে।

রতন বলে,—তা হবে। তবে আমি ভাবছি অন্য কথা। অন্য পথে ওদের ঘা দিতে হবে।

তারপর রতনই বলে জীবনকে তার প্ল্যানের কথা।

ওই কয়েক শতাব্দীর জমে থাকা স্ল্যাগের উপরটা লোহাপাথরের মতো জমাট। কঠিন হয়ে গেছে। উপর থেকে শাবল, গাইতি চালালে কাটবে না, ওরা পাশের দিক থেকে কোলিয়ারির ডিনামাইট জোগাড় করে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে সেখানে মানুষ ঢোকার মত করে সুড়ঙ্গ করে। আর সেই টানেলের মাল ভিতরে কিছুটা আলগা কিছুটা নেমে থাকে। ওরা সেই মাল কাটতে কাটতে বড় টানেল করে স্ল্যাগের পাহাড়ের ভিতরে চলে যায়।

ভিতরের থেকে এবার টনটন মাল কেটে বের করে আনে। বাইরে থেকে কেউ জানতে পারে না যে ভিতরে টানেল করে চলে গেছে তারা আর ভেতর থেকে এত মাল বের করে আনছে। ফলে লোকচক্ষুর আড়ালে ওদের কারবার চলে। ট্রাক ট্রাক লোহাপাথর, উপরে কিছু ডালপালা না হয় সাধারণ বোল্ডার চাপা দিয়ে ওরা পাচার করে।

মোহনলাল এখন অন্য পথে এই ভাবে মাল তুলছে। জীবনও এর মধ্যে গিয়ে ওদের কাজের টানেল, উপরে স্ল্যাগের পরিমাণ সব দেখে এসেছে। মোহনলাল সেদিন গেছে, সে গাড়ি থেকে নেমেছে, ওদিকে টানেলের মধ্যে তার লোকজন কাজ করছে। মোহনলাল উপর দিকে জীবনকে দেখে সরে দাঁড়ায় গাছের আড়ালে, জীবন ওকে দেখুক সে এটা চায় না। জীবনও দেখেনি ওকে। সে তখন অন্য জিনিস দেখতে ব্যস্ত। সে দেখে মোহনলালের লোক উপর থেকে বেশি নীচে টানেল করেনি। মাঝে মাঝে পাথরের ফাঁক দিয়ে ওদের কথা আর টানেলের কিছু অংশ দেখা যায়। এদিক সেদিকে বেশ কিছু শিশু বুনো আকড় প্রভৃতি গাছ গজিয়ে উঠেছে।

বেশ খানিকটা ভিতরে চলে গেছে ওদের টানেল। অবশ্য মোহনলালের লোকজন

এসব খবর জানে না। মোহনলালও বের হয়ে দেখতে পায় না জীবনকে। ওদের কাজ ঠিকমতো চলতে থাকে। বাধাও আসেনি।

মোহনলাল এবার বেশ অর্ডার পেয়েছে স্ল্যাগের, তাই সে কিছু বেশি লোক লাগিয়েছে। সেও বুঝেছে রতনদের স্ল্যাগের ব্যবসা সে চোপাট করে দিতে পারবে। একটা ঘা দিতে পারবে রতন আর জীবনদের। তারপর কোলিয়ারিতে কয়লা পাচারেও ওদের বিপদে ফেলবে। মোহনলালের জাতশত্রু এখন রতন। মোহনলাল বনানীকে তাড়ানোর পর একটু অসুবিধাতেই পড়েছে। মহিলা মহলের ভোট তাদের জনপ্রিয়তা হারিয়েছে মোহনলাল। কারণ বনানীই এখন এলাকার মেয়েদের কাছে জনপ্রিয় নেত্রী হয়ে উঠেছে। তাছাড়া মোহনলাল দেখেছে রতনও যায় বনানীর কাছে যখন তখন। মোহনলালের মনে হয় রতনের জন্যই তার জীবন থেকে হারিয়ে গেছে বনানী।

এর জবাব সে দেবে রতন-জীবনদের সবদিক থেকে। এই তারই সূচনামাত্র।

মোহনলাল এর মধ্যে সুখলালের কাছ থেকে স্ল্যাগের জন্য লাখখানেক টাকা আগাম নিয়ে পুরোদমে লুণ্ঠন শুরু করেছে স্ল্যাগ ব্যাঙ্ক থেকে।

টানেলে প্রায় চল্লিশ জন লোক মাল কেটে চলেছে। দমবন্ধ করা ওখানে বাতাস তেমন ঢোকে না। অন্ধকারে মোমবাতি জ্বেলে ওরা গাইতি দিয়ে ভিতরের মাল কাটছে। গাইতির আঘাতে স্তরে স্তরে জমে থাকা কয়েক শতকের পুরোনো মাল ঝরে পড়ে, ওরা ঝুড়ি ঝুড়ি মাল বাইরে এনে ট্রাকে লোড করছে।

রাতের তারাজ্বলা আকাশ। বনপাহাড়ে রাত্রি নেমেছে। এই অন্ধকারের মধ্যে স্ল্যাগ ব্যাঙ্কে গজিয়ে ওঠা বুনো তুলসী-আচাড় বনের মধ্যে জীবন ফুকনাকে নিয়ে কাজে ব্যস্ত। ওরা আগে থেকেই বেশ কয়েকটা জায়গাতে ড্রিলিং মেসিন এনে ফিট চারেক গর্ত করে রেখেছিল টানেলের ওপর বরাবর। এবার রাতের অন্ধকারে ওই পথ দিয়ে গর্তের ভিতর কোলিয়ারির বারুদের স্টক থেকে সংগৃহীত বিস্ফোরক জিলেটিন স্টিক ডিনামাইটগুলো ঢুকিয়ে সরু তার টেনে চলেছে ওদিকে পাহাড়ের কাছে। নীচেই পথের রেখা। ওদের গাড়ি রয়েছে ওখানে। অন্ধকারে ছায়ামূর্তির দল দ্রুতগতিতে কাজ করে চলেছে।

জীবন নজর রেখেছে, ওদিকে খান পাঁচেক ট্রাক দাঁড়িয়ে। ওরা টানেল থেকে মাল এনে লোড করছে তাতে। জীবন এদের ইঙ্গিত পেতে এবার ওর চ্যালা ফুকনা বলে,

—সব কানেকশন করে দিয়েছি।

ফুকনা কোনো কোলিয়ারীর সর্ব হায়ারার। ওর কাজই হচ্ছে ডিনামাইট চার্জ করে পাথরের স্তর ধসানো। কয়লার স্তরে বারুদ পুরে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে কয়লার স্তরকে কাটানো, যাতে কয়লা তোলার কাজ সহজে করা যায়।

টানেলের ভিতর জনা চল্লিশেক মানুষ তখন কাজে ব্যস্ত। কয়েক ঘণ্টার কাজের জন্য ভালোই মজুরি পায় তারা। ওরা জানে না যে তাদের ওপর চরম সর্বনাশ নেমে আসছে।

ডিনামাইটের তারগুলো দূরে টেনে নিয়ে গেছে তারা, এবার ফুকনাও তৈরি

একবার সুইচটা জোরে টিপলেই একসঙ্গে এতগুলো ডিনামাইট-এর বিস্ফোরণ ঘটবে। জীবনদের এখন বাঁচা-মরার প্রশ্ন। তাদের অস্ত্রে হাত দিয়েছে মোহনলালের দল। জীবনের ইঙ্গিতে এবার মেনসুইচে চাপ দেয় ফুকন।

আশপাশ গর্জে উঠে গুরু গুরু শব্দে। তারপরই দেখা যায় আবছা অন্ধকারে ধুলোর একটা আস্তরণ। সামনের পাহাড়ের অনেকখানি বিস্ফোরণের চোটে ধ্বসে গেছে আর টানেলের রাস্তাটা পথের ওপর ধসে পড়েছে। ওই জমাট স্ল্যাগের স্তর। গাছপালা সমেত।

পুরো টানেলের অংশটাই বন্ধ হয়ে গেছে ওই ধসে আর ভিতরে এতগুলো মানুষ এক নিমেষে চাপা পড়ে গেছে ওই জমাট ধসের নীচে। বাইরের আলোর মুখ ওরা কোনোদিনই দেখতে পাবে না। ওদের খবরও আর পাবে না বাইরের জগতের মানুষ।

ফুকন বিস্ফোরণের বহর দেখে বলে—একদম কিলিয়ার। ওরা পিছনের পাহাড় দিয়ে নেমে চলে যায় রাতের অন্ধকারে। এদিকে স্ল্যাগ ব্যাঙ্কের বাইরে রাখা ট্রাকের খালাসি ড্রাইভার কজন কুলি চমকে ওঠে প্রচণ্ড শব্দে পায়ের তলায় মাটি কাঁপছে। ধ্বসে গেছে ওই উঁচু স্ল্যাগ ব্যাঙ্কের জমাট পাথর। যেন প্রথমে একটা ভূমিকম্পে চাপা পড়ে গেছে। কে বলে—হায় রামজী এতনা আদমী বিলকুল খাল্লাস।

ওদের মধ্যে একজন বলে,

—ভাগ বে। ফির অউর কে হোগা কে জানে।

ওরা গাড়ি নিয়ে পালাতে থাকে। তখন ধুলার আস্তরণ ছেয়ে আছে এখানের আকাশ বাতাস।

মোহনলাল হিসাব করছে এবার মোটা টাকা দাঁও মারবে। এখন তার বাড়িতে রোজই আসর বসে। তার চ্যালারা মোহনলালের এসব খোরাক জুগিয়ে দেয়। সুবিধাই হয়েছে।

বনানী থাকলে এসব রাসলীলা বাইরে করতে হতো। মদের আসরও বসানো যেত না। কিন্তু এখন আর বাধা নেই। আজও আসর বসেছে। কালই হাতে আসবে নগদ লাখ পাঁচেক টাকা। এবার কারখানাতেও ছাট-এর ঠিকেটা পেয়েছে! ওদিকে দলের মধ্যে এখন তার নামটা উপরের দিকে এসেছে। সামনের ভোটে সেইই দাঁড়াবে এখান থেকে। আর জিতবেই।

মোহনলাল স্বপ্ন দেখে সে মন্ত্রী হবে। মন্ত্রীদের ঠাটবাট দেখে হিংসা হয়। তাকেও মন্ত্রী হতে হবে। তার জন্য টাকা যত খরচ করতে হয় করবে। তখন বেশ রাত হয়েছে। হঠাৎ তার দলের কেষ্টকে হন্তদন্ত হয়ে আসতে দেখে চাইল মোহনলাল। শুধোয় সে,

—সব মাল ঠিকমত চলে গেছে কেষ্টা।

কেষ্ট বলে—সর্বনাশ হয়ে গেছে বস।

মোহনলাল নেশার ঘোরে ছিল। বলে—যা ঠিক আছে।

তারপরই চমক ভাঙে তার। বিপন্ন কণ্ঠে শুধোয়—কী বললি? কী হয়েছে?

কেষ্ট বলে—সর্বনাশ হয়েছে। ওই স্ল্যাগের টানেলে কাজ করছিল লোকগুলো

বিরাট ধস নেমে তারা চাপা পড়ে গেছে। একজনও বেঁচে নেই।

মোহনলাল চমকে ওঠে—সেকি। টানেলে ধস নেমে সব শেষ।

—তা প্রায় জনা আটত্রিশ লোকই গায়েব। কুন অতলে চাপা পড়ে গেছে কোনো চিহ্নই নেই।

মোহনলালের নেশা ছুটে যায়। সে বলে,

—চলো তো দেখি গে। বাকি লোকগুলো—

—তারা ভয়ে পালিয়েছে। কেষ্ট জানায়।

তখন ভোর হয়ে আসছে পূর্ব আকাশ জেগেছে আলোর আভা। এই দিকটা নির্জন। স্ল্যাগের পাহাড়ের দিকে লোকজন বিশেষ আসে না।

ওদিকে টানেলের মুখটাও ধসে পড়েছে। আর উপরের বিশাল পাহাড়ের স্তূপ গাছপালা সমেত বিস্তীর্ণ এলাকা নিয়ে প্রায় ফিট দশেক নেমে একটা খাদানের সৃষ্টি করেছে।

মোহনলাল এদিক-ওদিক ঘুরছে। ওরই অতলে এতগুলো মানুষ চিরকালের জন্য চাপা পড়ে গেল। ওদের খবর কেউ জানবে না। এমন সাধারণত হয় না। শক্ত লোহাপাথরে ধস কমই নামে। তবু ধসে গেল এতটা জায়গা। মোহনলাল ঘুরতে ঘুরতে দেখে ওইখানে গাছপাতার মধ্যে কিছু কাগজের টুকরো পড়ে আছে নতুন লালচে কাগজের টুকরো। এসব ডিনামাইটের মোড়কের কাগজ আরও অবাক হয় ওদিকে পড়ে আছে কিছু ফিউজের তার। ওদিকে কিছু ছেঁড়া তারও পড়ে রয়েছে।

এবার মোহনলালের মনে পড়ে এই পাহাড়ে একদিন সে দেখেছিল জীবনকে ঘুরতে।

সেদিন কারণটা ঠিক বুঝতে পারেনি। আজ বুঝেছে মোহনলাল ওই রতনের লোক জীবন আজ তার চরম সর্বনাশই করেছে। সেইই সারা এলাকায় ডিনামাইট দিয়ে প্ল্যানমতোই প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে, আর ধস নামিয়ে শেষ করেছে। এই বিপর্যয়ের জন্য দায়ী ওই রতন আর জীবন। তার স্ল্যাগের লাখো লাখো টাকার কারবার ওরাই এবার বন্ধ করে দিল। কারণ এই সর্বনাশের খবর মালকাটা মহলে ছড়িয়ে পড়বেই।

অবশ্য এ নিয়ে পুলিশে কেউ যেতে সাহস করবে না। এতগুলো লোক নিঃশব্দে গায়েব হয়ে যাবে। এমন দুর্ঘটনা চোরাকারবারে প্রায়ই ঘটে। ধসে চাপা পড়ে অনেকেই। তার কোনো সুরাহা হয় না।

ব্যাপারটা গোপনই থাকে। তবে পুলিশ ঠিক টের পায় আর কার দলের লোক মরেছে তাও জানে। তখন সেই দলের মালিক মোটা টাকা দিয়েই সব পাথর চাপা দিয়ে দেয়।

মোহনলাল আজ বিপর্যস্ত। তারও বেশ কিছু টাকা বের হয়ে যাবে এসব ব্যাপার পাথর চাপা দিতে। অসহায় রাগে জ্বলছে সে। তার করার কিছু নেই। আজ বিকালে শ্রমিকদের বিরাট সমাবেশ আছে। সেখানে শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিয়েও আলোচনা হবে। দুর্ঘটনায় পতিত শ্রমিকদের যথাযোগ্য ক্ষতিপূরণের জন্য লড়াই-এর ডাক

দেয়।

মোহনলাল সেই মহতী জনসভায় আজ হাজির হয়েছে। মঞ্চে মালা পরে শ্রমিকদের দুর্ঘটনা নিরসনের জন্য নানা ফিরিস্তি দিয়ে চলেছে। তারস্বরে ঘোষণা করে—

—একজন শ্রমিকের দুর্ঘটনায় ক্ষতি হলে মোহনলাল তার সর্বশক্তি দিয়ে তার যোগ্য ক্ষতিপূরণের জন্য লৌহ কঠিন সংগ্রাম করে চলবে। সারা আকাশ-বাতাস শ্রমিকদের করতালিতে ভরে উঠে।

সংগ্রামী শ্রমিকদরদি নেতার এই কণ্ঠস্বর বোধ হয় ঐ স্ল্যাগে ব্যাঙ্কের অতলে পৌঁছবে না। পৌঁছলে সেই নিহত শ্রমিকদের আত্মা খুশি হতো।

জীবনের দলও মিটিং-এর আশপাশে ছিল। জীবনও দূরের কোনো চায়ের দোকানে বসেছিল। অন্যদলের মিটিং হলেও তারা আশপাশে থাকে। তাদের দলের প্রভাব দেখার জন্য। তাই জীবনও ছিল।

সে বলে—শালা খচ্চর।

আজকের রাতের ঘটনার পর মোহনলালের ঐ দরদি ভাষণ শুনে মুচকি হাসে।

প্রতিমা চাকরির চেষ্টা করছে। এখানে ওখানে। কারখানায় কিছু মেয়ে প্রাথমিক শিক্ষিকা নেবে। আগে এসব কাজের লোক নেবার জন্য কত জনই পরীক্ষা দিত —যোগ্যতার বিচারে নিয়োগও হতো। এখনও পরীক্ষা টরীক্ষা হয়। তবে নিয়োগের ব্যাপারে যোগ্যতাটা আলাদা। এখন কর্তাদের না-হলে ইউনিয়নের নেতাদের কাছের লোক হতে হবে। তাদের সুপারিশ ছাড়া কোনো নিয়োগ হবে না।

মোহনলাল সেদিন অফিসে বসে আছে। হঠাৎ প্রতিমাকে ঢুকতে দেখে চাইল। মেয়েটার সৌন্দর্য আর যৌবন রয়েছে। মোহনলালের চোখও ঘোরে সেই দিকে। প্রতিমা বলে,

—কারখানার টাউনশিপের প্রাথমিক স্কুলে কিছু শিক্ষিকা নেবে তাই এলাম আপনার কাছে।

মোহনলাল বলে,

—দরখাস্ত দাও ওঁখানে, ওরাই তো পরীক্ষা করে তার থেকে নেবেন। প্রতিমা দাঁড়িয়ে থাকে। সুন্দর মুখে তার বেদনার হতাশ ছায়া। সে বলে,

—ওসব তো হবে। কিন্তু কারও সুপারিশ না হলে হবে না।

এসব ব্যাপারে ইউনিয়নের নেতাদের কথাও দামি। চাকরির খুবই দরকার। রিফিউজী আমরা।

মোহনলাল বলে—বসো।

প্রতিমা বসে। বলে—আপনার নাম শুনে এসেছি অনেকের জন্য অনেক কিছু করেছেন। যদি আমার জন্য কিছু করেন, বেঁচে যাব।

মোহনলাল দেখছে ওকে। তার মনে হয় মেয়েটাকে হাতে আনা খুব কঠিন কাজ হবে না। চাকরি দেওয়াটা পরের কথা, ওর লোভী মন অন্য কিছু ভাবছে। মোহনলাল বলে,

—অফিসে এসব কথা হবে না। আমার বাসা চেনো তো?

প্রতিমা আগে ওর বাসাতেই গিয়েছিল সেখানে না পেয়ে অফিসে এসেছে। এখানে শ্রমিকও অন্য লোকজনের খুবই ভিড়। প্রতিমা ওর কথায় বলে,

—হ্যাঁ। আপনার বাসাতেই গেছলাম প্রথমে।

—তাহলে কালই সন্ধ্যার পর এসো ওখানে। দরখাস্ত সার্টিফিকেট এসবও আনবে। দেখি তারপর কী করা যায়।

প্রতিমা আশাভরা কণ্ঠে বলে,

—আপনি বললেই হয়ে যাবে। কারখানার সাহেবরা আপনাকে খাতির করে বলে শুনেছি।

নিজের স্তুতিতে দেবতাও খুশি হয়। মোহনলাল তো কোন ছার। মেয়েদের মুখ থেকে স্তুতি শুনলে আরও খুশি হবার কথা। মোহনলালেরও তাই হয়েছে। তবে সে তার স্বার্থটা আগে দেখে। ওটার বেলায় কোনো ভুল করে না।

আশা নিয়ে প্রতিমা চলে যেতে এবার মোহনলালের এক অনুচর বলে—গুরু মেয়েটাকে ওই জীবনের সঙ্গে ঘুরতে দেখেছি। ওর সঙ্গে খুব ইয়ে ইয়ে ব্যাপার চলছে মেয়েটার।

—তাই নাকি। মোহনলাল একটু অবাক হয়।

ওর চ্যালা নানা কারণেই রতন জীবনদের উপর নজর রাখে। অনেক খবর রাখে ছেলেটা। সে বলে,

—ওই কলোনিতে থাকে মেয়েটা। জীবন ওর ভাই-এর কাজও করে দিয়েছে দত্তমশাইয়ের দোকানে। মেয়েটার কাজের জন্য এখানে ওখানে বলেছে। তবে কলোনির মেয়ে চালু পুরিয়া, ও নিজেও চেষ্টা করছে। যদি কোনো কাজ পায়।

মোহনলাল ভাবছে কথাটা। বনানীর কথা—মানে বনানীকে রতনই তার কাছ থেকে ভাগিয়ে নিয়েছে। নিজের চোখে দেখেছে রতনকে ওখানে যাতায়াত করতে। চুপ করে সহ্য করেছে মোহনলাল।

জীবনের হাত থেকে প্রতিমাকে সরিয়ে আনতে পারলে তার কিছুটা জবাব দিতে পারবে মোহনলাল। তা ছাড়া মোহনলালের চালু কারবার বন্ধ করে দিয়েছে জীবনই। স্ল্যাগের ব্যবসা লাটে তুলে দিয়েছে। জীবনকে সে ছাড়বে না।

ওই মেয়েটাকে চাকরি দিতে পারলে কলোনির মানুষও তার ক্ষমতার বহর দেখে তার উপর ভরসা করবে। তাই এবার মোহন ওই ঘটনাকেই গুরুত্ব দেয়।

প্রতিমা খুশি হয়ে বাড়ি ফেরে। এমনিতে প্রতিমা বেশ চালাক চতুরই। ছেলেবেলায় ওদেশে মানুষ হয়েছিল। বাবা তখন সেখানে পাটের গুদামে কাজ করতো। সামান্য মাইনে, সংসারে পোষ্য অনেক। কোনো মতে দিন চলতো তাদের।

তারপর দেশভাগ হবার পর বানে ভাসা খড়কুটোর মতো ভাসতে ভাসতে এসে ঠেকে শিয়ালদহ প্ল্যাটফর্মে। বাঁচার জন্য লড়াই করতে দেখেছে। পদে পদে সেখানে সংঘাত। একমুঠো অন্নের জন্য প্ল্যাটফর্মের বাইরে সবজি বাজারে সবজি কুড়িয়ে এসেছে। বাবা দাদা ঘুরেছে সারা দিন কাজের সন্ধানে।

তারপর আরও কিছু পরিবারের সঙ্গে তারা এখানের প্রান্তরে এসে ঝুপড়ি বাঁধে।

গ্রীষ্মের রোদে পুড়েছে, শীতের দাপট এখানে তত বেশি। সেই শীতও সহ্য করেছে। মাথার ওপর দিয়ে বয়ে গেছে বৃষ্টির ধারা। তারা এইভাবে বড় হয়েছে। জীবনের পাঠশালার অনেক পাঠই নিয়েছে। এখন এখানে দেখছে যদি বাঁচার কোনো পথ পায়। তাই জীবনের কাছেও হাত পেতেছে। মোহনলালের কাছেও এসেছে চাকরীর জন্য। তার প্রচেষ্টার কথা অন্য কাউকে জানায়নি। তার কাছে রাম-শ্যামের কোনো ভেদাভেদ নাই। বাঁচার জন্য যে তাকে পথ দেখাতে পারবে সে তার কাছেই মাথা নিচু করবে। সেখানে বিশ্বাস আদর্শের কোনো ঠাঁই নেই। এদের কঠিন বাস্তব জীবন থেকে ওই কথাগুলো মুছে গেছে। বিধিনিষেধ ভদ্রতার সব বাধাও দূর হয়ে গেছে। জীবন কদিন বেশ ব্যস্ত ছিল। ওই রাতের ঘটনার দিকে তারও নজর ছিল। ভেবেছিল মোহনলাল অন্যভাবে কোন গণ্ডগোল করবে। দু একটা বস্তিতে কয়েকজনকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। দু-একদিন তাদের আত্মীয়-স্বজন এখানে ওখানে খোঁজখবর করে, তারপর কোনো অজানা কারণে চুপচাপ হয়ে যায়। কোনো বুড়ির কান্না তবু থামে না। সন্তানহারা মায়ের আর্তকান্নায় অবশ্য কেউ কান দেয় না।

জীবনদের ব্যবসা এখন জোরকদমে চলছে। এবার তারা কয়লা পাচারের কাজও বাড়িয়েছে। এসব দলকে অর্গানাইজ করে জীবন। তাই ব্যস্ত ছিল। শক্ত কাজের মধ্যেও মনে ছিল প্রতিমার কথা। মেয়েটা তার মনে জোশ এনেছে। আর মেয়েটা বোধ হয় বেশ পয়া, তার সঙ্গে চেনাজানা হবার পর থেকেই জীবনের আয়-উপায়ও বেড়েছে।

—তুম খুদ কারবার করো জী। এসব কারবারে কার্তিকবাবু রতনবাবুকে রেখো না। ওরা তো এখন দুসরা কাম ধান্দা করে। এসব তো তুমিই করো।

জীবনও ভেবেছে কথাটা। ওদের ঝেড়ে ফেলে দিতে পারলে প্রচুর টাকা পাবে। লাইনটা নিজেই করবে মিত্র সাহেবের সঙ্গে। জীবন এসেছে প্রতিমাদের বাড়িতে। কদিন পর এসেছে। প্রতিমার বাবা দেখছে ওকে। প্রতিমার বাবা দেবেনবাবু অবশ্য জীবনের সম্বন্ধে অনেক খবরই পেয়েছে।, কলোনির অনেকেই এখন কয়লার ধান্দা করে। তারা জানে জীবনকে।

ওরাই বলে—ওই ছেলেটা তো মাফিয়া দেবেনদা। খুন, ওয়াগন ব্রেকিং আরও অনেক কিছুর সর্দার। ওই পোলাটার সাথে দেহি প্রতিমা ঘোরে শ্যাষে কোনোদিন বিপদ না হয়। ওগো বিশ্বাস নাই।

দেবেনবাবু কথাটা তার স্ত্রীকেও বলে।

—জীবনের সম্বন্ধে নানা কথা শুনছি। পোলাডা ভালো না। এহানে ঘনঘন আসে ক্যান।

প্রতিমার মা দেখছে জীবনই এখন তাদের সংসারে বেশ মোটা টাকা দেয়। ওর মা তো এবার এই মাটির ঘর ভেঙে দালান তোলার কথা ভাবছে। ওর একরাতের রোজগারেই তাদের দালান হয়ে যাবে। বড় ছেলের আনাজপত্রের ব্যবসাতে সেদিন একমুঠো টাকা দিল। ছেলেটা এখন দোকানও বড় করেছে। রোজগারও ভালোই হচ্ছে। তার ছোটছেলেটারও মাইনে বেড়েছে দোকানে। তাদেরও দুঃখ ঘুচেছে

জীবনের কল্যাণে।

জীবন কি করে তা জানার দরকার নেই। তাদের তো সুখে রেখেছে এইভাবে কিছুদিন চালাতে পারলে হয়। ওর মা বলে,

—প্রতিমার সাথে চেনাজানা তাই আসে।

গলা নামিয়ে বলে,

—টাকা তো ভালই দেয়, ঘরও হইব। তোমার মুরোদও শ্যাষ। এহন এই কইরাই বাঁচতে হইব। লোকের কথায় কান দাও ক্যান। কলোনির কে কী করে তা আমার জানতি বাকি নেই।

—ওই ঘোষমশয় কইছিল—

এবার ফুঁসে ওঠে প্রতিমার মা।

—ওর পোলার বউটা কি করে শহরে? বিউটি পার্লারে কাম করে না ছাই। আমারে ধাঁটাইও না।

দেবেশ সরে যায়। জীবনকে দেখে আজ চুপ করে যায়। প্রতিমা নেই। সে গেছে মোহনলালের কাছে। আজ সন্ধ্যায় তাকে যেতে বলেছে। প্রতিমার মা বাড়িতে নাই, প্রতিমাও নেই। জীবন জিজ্ঞাসা করে,

—মেসোমশাই। মাসিমাকে দেখছি না, প্রতিমাও নাই।

দেবেশবাবু ওদের গতিবিধির খবর জানে। তাই বলে,

—তোমার মাসিমা দোকানে গেছে আর প্রতিমাও বাইর হইল কারখানা ইস্কুলে শিক্ষিকা লইব কইছিল। ওই যে মোহনলালবাবু, তোমাগো কারখানার লিডার, ওর বাসায় গেছে গিয়া।

চমকে ওঠে জীবন. মোহনলালের বাসায় গেছে এই রাতে.

—তাই তো কইল, দেবেশবাবু জানায়।

জীবন ওই মোহনলালকে খুব ভালো করেই জানে। লোকটা একনম্বর লম্পট। চরিত্রহীন, বনানীকে তাড়িয়ে এখন রোজ রামলীলাই চালিয়েছে, আর ওখানে গেছে প্রতিমা।

জীবনের মাথায় রক্ত চড়ে যায়। সে বের হয়ে যায়।

দেবেশ বলে—বসো।

তার কথায় কান দেয় না জীবন। এটা যেন আজ তার ইজ্জতের প্রশ্ন হয়ে উঠেছে। তার কাছ থেকে প্রতিমাকে কেড়ে নেবে ওই মোহনলাল চাকরি দেবার নামে—এ হতে পারে না।

মোহনলাল অবশ্য জানতো প্রতিমা ঠিকই আসবে। চাকরির ব্যাপারে তাকে কিছুটা আশ্বাসও দিয়েছে। তাই মোহনলালও আজ সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরে অপেক্ষা করছে। তার বাড়িটা বেশ ফাঁকা, কোম্পানির এলাকার বাইরে। চারিদিকে দুচারটে পুরোনো বট, অশ্বত্থ গাছের জটলা, সন্ধ্যার পর এখানে ছায়া অন্ধকার ঘনিয়ে আসে, টিলার ওপর বাড়িটা। নীচে কারখানার রেললাইন চলে গেছে। তাই এদিকটা নির্জন থাকে। প্রতিমা তার কাগজপত্র নিয়ে এসেছে অনেক আশা নিয়ে, চাকরিটা পেলে তার সুরাহা হবে। সেও নিজের মতো করে বাঁচতে পারবে। প্রতিমা এসে বেল বাজায়।

মোহনলাল দরজা খুলে দেয়,

—এসো।

প্রতিমা ওর বসার ঘরে ঢোকে। বেশ সাজানো ঘর। তবে এখন অগোছালো। বনানীই তার ঘর সাজিয়ে রাখতো। এখন সেই ছবিটা রয়ে গেছে। তবে অযত্নে অবহেলায় ধুলো জমেছে এখানে সেখানে। পর্দার কাপড়, ঢাকাগুলোও ময়লা। ফুলদানিটাও শূন্য।

মোহনলাল বলে,

—কাগজপত্র এনেছো?

প্রতিমা ওগুলো তার হাতে দেয়। মোহনলাল বলে,

—খবর নিলাম এর মধ্যে প্রায় আড়াই হাজার দরখাস্ত পড়েছে। শিক্ষিকার পদ মাত্র চারটে।

প্রতিমা হতাশ হলেও বলে,

—আপনার খুব নামডাক, আপনি চেষ্টা করলে কাজটা ঠিকই হয়ে যাবে। হাসে মোহনলাল,

—বড়ই কঠিন কাজ প্রতিমা। তবে তুমি এত করে বলছ চেষ্টা করব, চা খাবে তো?

মোহনলাল তার কাজের ছেলেটাকেও রাখেনি আজ। তাকে অন্য কাজে শহরে পাঠিয়েছে। তাই নিজেই ওঠে। চা করার জন্য। প্রতিমা জানে কীভাবে সেবা করতে হয়। তাই প্রতিমা বলে,

—আপনি আবার কষ্ট করবেন কেন?

মোহনলাল চা করার জন্য গ্যাস ধরায়। বলে,

—হাজার হোক বাড়িতে এলে একটু চা খাওয়াব না।

প্রতিমা উঠে যায়, বলে—

—আপনি সরুন। আমি চা করছি,

ওকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই চা করতে থাকে।

মোহনলালের মনে হয় ওর শূন্য ঘর আজ যেন ভরে উঠেছে। বনানী চলে যাবার পর তার ঘর শূন্য পড়েছিল।

প্রতিমা চা নিয়ে ঢোকে। বিস্কুট কোথায়?

মোহনলালও এসবের খবর জানে না। সে বলে—

—দ্যাখো ওদিকে আছে কোথায়? আমিই তোমাকে খাওয়াব তা নয় তোমাকে নিজেকেই খুঁজতে হচ্ছে।

প্রতিমা চা নিয়ে বসেছে ওদিকের সোফাতে।

মোহনলাল দেখছে প্রতিমা এখন অনেকটা সহজ হয়েছে। হেসে কথা বলছে। হাসলে ওকে আরও সুন্দর দেখায়। মোহনলাল সাবধানে এগোতে চায়। এখন মনে হয় প্রতিমার জন্য কিছু করা দরকার। আর তার ব্যাপারে মোহনলাল সাবধানে পা বাড়াবে। অন্য মেয়েদের মতো সহজে একে পাওয়া যাবে না। একটু সময় নিতে হবে। সেটার জন্য অপেক্ষাও করবে মোহনলাল। তাই বলে,

—তোমার দরখাস্তটা রেখে যাও। আমি কাল জমা দিচ্ছি। পরীক্ষাতে বসো। তারপর দেখা যাক কী করতে পারি। যোগাযোগ রেখো, আমি সন্ধ্যার পর বাড়িতে থাকি। চলে এসো মাঝে মাঝে।

প্রতিমা বলে,

—তা আসব, তবে আপনার উপর ভরসা করে থাকলাম কিন্তু। বের হয়ে যায় প্রতিমা।

মোহনলাল দরজা থেকে তাকে হাত নেড়ে বিদায় দেয় খুশি মুখে পথটার উপর প্রাচীন গাছের ছায়া পড়েছে। প্রতিমা খুশি মনে চলেছে চাকরিটা হলে সে নিশ্চিন্ত হয়।

হঠাৎ সামনে জীবনকে দেখে অবাক হয়। জীবন যেন ওখানে হঠাৎ মাটি ফুঁড়ে উঠেছে। গাছের ফাঁক দিয়ে এক ঝলক আলো পড়েছে ওর মুখে তাতে কাঠিন্যই ফুটে উঠে। প্রতিমারও নজর এড়ায় না, সে বলে—তুমি এখানে?

জীবন এখন বদলে গেছে। তার নিজের উপর জোরও বেড়েছে অনেক। সে আজ মনস্থির করে ফেলেছে—প্রতিমাকে তার চাইই। মোহনলালের হাতে সে ওকে পড়তে দেবে না। জীবন বলে—হ্যাঁ। ওই শয়তানের কাছে এসেছ চাকরির সন্ধানে। খবরটা পেয়ে সোজা এখানে চলে এসেছি। তা চাকরির কী হল? প্রতিমা বলে—উনি চেষ্টা করবেন বললেন।

জীবন বলে,—সারা শহরের মেয়েদের চাকরি পাইয়ে দেবে বলে তাদের সর্বনাশ করেছে। তোমাকেও ছাড়বে না ব্যাটা। তাই এসেছিলাম তেমন কিছু দেখলে ব্যাটার মগজে একটা দানা সেঁধিয়ে ফিনিশ করে দেব।

প্যান্টের পকেট থেকে জীবন তার সঙ্গী ছ ঘরা রিভলবারটা বের করে দেখায়। প্রতিমা চমকে ওঠে।

—একী। এ যে রিভলবার।

জীবন বস্তুটার উপর সস্নেহ স্পর্শ বুলিয়ে বলে,

—এটা আমার সঙ্গেই থাকে। সঙ্গী বলতে পারো। এটা দেখিয়ে অনেক কাজই সহজ হয়ে যায়। ব্যাটা আর কী বল্লে?

প্রতিমা বলে—আসতে বললো।

—না। আর ওখানে যাবে না কোনোদিন।

প্রতিমা বলে—তাহলে চাকরির কী হবে?

—চাকরি ফাকরি করতে হবে না।

—সে কী, চলবে কী করে! বাবার এই অবস্থা।

জীবন বলে—আমি ঠিক করেছি তোমায় বিয়ে করব। তোমার সব ভার আমার।

প্রতিমা অবাক হয়ে বলে—সেকী? বিয়ে করতে হবে? তোমায়!

—কেন? পাত্র হিসাবে আমি শালা কি ফালতু। কি নেই আমার, টাকা, হিম্মত—কি নেই?

প্রতিমা তবু এক নিমেষে নিজের ভবিষ্যৎ ওর সঙ্গে জড়াতে দ্বিধা বোধ করে। তাই বলে,

—কিন্তু।

কোন কিন্তু টিন্তু জানি না। একবার বলেছি বিয়ে করব তোমাকে, ব্যস, বিয়ে হবে। মরদ কা বাত, ওঠো বাইকে। তোমার বাড়িতে সে কথাটা জানাতে হবে। কালই বিয়ের দিন আছে। শালা শুভ কাজটা ফিনিস করতে হবে। না হলে ওই শালা মোহনলাল হড়কে দেবে—তোমার বারোটা বাজিয়ে দেবে। শালা পয়লা নম্বরের ঘুঘু।

দেবেশবাবু বসে বিড়ি ফুঁকছিল। ওর স্ত্রী চাল বাচছে ছোট ছেলেটা ফিরেছে দোকান থেকে। নরেশও। এবার খাওয়া দাওয়া হবে। দেবেশ বলে,

—প্রতিমা এখনও ফিরলো না যে।

শোনা যায় জীবনের মোটর বাইকের শব্দ। প্রতিমার মা বলে—আইয়া পড়ছে।

বলিষ্ঠ পদক্ষেপে ঢোকে জীবন। পিছনে প্রতিমা। সে ওই বিয়ের কথা শুনে চিন্তিত। নিজের জীবনকে সে এইভাবে বাধা পড়তে দিতে চায় না। জীবনের সঙ্গে মিশে ছিল কিছু অর্থ ইত্যাদি পাবার জন্য। ওর টাকা আছে। কিন্তু তার জন্য এমনি দাম দিতে হবে তা ভাবেনি। জীবন বলে—আপনারা সবাই রয়েছেন। একটা কথা বলছি,

—কথা। দেবেশ অবাক হয়।

জীবন বলে,

—হ্যাঁ। আমি ঠিক করেছি প্রতিমাকে বিয়ে করব।

চমকে ওঠে দেবেশবাবু—বিয়ে করবে? প্রতিমাকে? তোমার বাবা আছেন তাঁদেরও অনুমতির দরকার। তা ছাড়া আমরা সরকার, কায়স্থ, তোমরা ব্রাহ্মণ।

প্রতিমার মা শুনছে কথাটা। ভাবছে সে। দেবেশ বলে—প্রতিমারও মত চাই।

জীবন বলে—ওসব হয়ে যাবে। আর বাবা-মায়ের অনুমতির দরকার হবে না। আমি যা করব তারা মেনে নেবেন। আমি ঠিক করেছি বিয়ে করব ব্যস। এ বিয়ে হবেই।

—কিন্তু। দেবেশ কিছু বলতে চায়।

প্রতিমার মা এমন পাত্র হাতছাড়া করতে চায় না। সে জানে জীবনের হাতে অনেক পয়সা আছে। তাদের দিনও বদলে যাবে। তাই স্বামীর কথায় বলে প্রতিমার মা।

—ওরা ঠিক করেছে বিহা করবো। অহন তুমি বাধা দিবা না।

জীবন বলে—ঠিক বলেছেন। অবশ্য বাধা দিলে শুনতাম না। তাহলে কালই বিয়ের দিন আছে,

প্রতিমার মা বলে—কিন্তু উদ্যোগ আয়োজন তো করতে হবে। খরচ পত্তর আছে।

জীবন পকেট থেকে একমুঠো নোট বের করে দিয়ে বলে,

—হাজার দশেক আছে। এটা দিয়ে চালান আরও লাগলে কাল সকালে বলবেন, দিয়ে দোব। তাহলে কালই বিয়ে হবে। আমিও দুচারজনকে বলব। খাবার দাবারের

আয়োজনও হয়ে যাবে। ভাবতে হবে না।

অবিনাশবাবু কদিন জীবনের দেখাও পাননি। কমলাও বলে, ছেলেটার খবরও পেলাম না। কদিন আসেনি বাড়িতে, একটু খোঁজখবর নাও।

অবিনাশবাবুর দোকান এখন ভালোই চলছে। একটা কাজের ছেলেকেও রেখেছেন তিনি। সকালবেলা থেকেই দোকানে ভিড় জমে। মাসের প্রথম দিকে কেনাকাটা বেশি হয়। অনেক মাসকাবারি খদ্দেরও আছে। তাদেরও হিসাব রাখতে হয়। এসব নিয়ে অবিনাশবাবু এখন ব্যস্ত। অবিনাশবাবু বলে—তোমার ছেলে কি আমাদের কোন খবর রাখে? এখন তো শুনি এদিকের উপর মাস্তান। দুহাতে টাকা রোজগার করছে। তার জন্য ভাবতে হবে না। সে ঠিকই আছে। বের হয়ে যায় অবিনাশবাবু, কমলাও গজগজ করে।

—ওই দোকান নিয়ে থাকো। পাঁচটা নয় সাতটা নয় একটা মাত্র ছেলে তার জন্যও মাথাব্যথা নেই। কী মানুষ গো। জীবন এখন খুবই ব্যস্ত। সকালে রতন তার দলের দু-চারজনকেও নিমন্ত্রণ করেছে। ভজার দোকানে অর্ডার দিয়েছে। ওরাই শ-দুয়েক লোকের খাবারের আয়োজন করে দেবে।

দেবেশবাবু এ-বিয়েতে মত দিতে চায়নি। জীবনদের মতো ছেলেদের উপর তার তেমন আস্থা নেই। নরেশ ভবেশ দুই ছেলেও জীবনের সাহায্যেই এখন কিছু রোজগার করছে। তারাও জানে জীবনের সঙ্গে প্রতিমার বিয়ে হলে তাদের সুবিধাই হবে। এখন সমাজে মস্তানদেরই দাপট। প্রতিমার মা বলে স্বামীকে—ঘাড় থেকে মেয়েটা নাবুক। বিনা ঘরচায় বিহা হইব উল্টে এতগুলান টাকা পাইছ।

দেবেশ বলে,

—টাকার জন্য মাইয়ারে বিক্রি করব? প্রতিমার ভবিষ্যৎ তো দেখতে হইব।

কিন্তু অসহায় বৃদ্ধের কথা কেউ শোনে না।

বিয়ের কোনো অনুষ্ঠানের ত্রুটি রাখেনি জীবন। তার চ্যালারাই কোনো পুরোহিতকে ডেকে আনে। রতন বলে,

—জীবন বাড়িতে জানিয়েছিস বিয়ের কথা?

জীবন বলে—এখন সময় তো নেই। তবে বাবা মায়ের দিক থেকে কোনো অমত হবে না। মা তো বলে বিয়ে-থা করে সংসারী হ। তাই হচ্ছি। ব্যস, পরে সব জানাব।

বিয়ে হয়ে গেল। প্রতিমা প্রথমে ঠিক রাজি হতে পারেনি। তার মনেও কেমন এক খটকা বেধেছিল। কিন্তু জানে জীবন যখন বলেছে তখন বিয়ে হবেই। না করলে গোলমাল করবে। তাদের শহরে কোনো এক ছেলে একটা মেয়ে তাকে বিয়ে করতে রাজি হয়নি তাই মেয়েটার মুখে অ্যাসিড বাল্ব মেরেছিল।

জীবনের পকেটে সেও দেখেছে যন্ত্রটাকে। প্রতিমার ভয় হয় বাবা প্রতিবাদ করতে সেইই বলে,

—তুমি আর অমত করো না বাবা।

তবে প্রতিমা ভুলতে পারে না যে জোর করেই জীবন তাকে দখল করতে চায়।

মোহনলাল সেদিন সন্ধ্যার পর বসে আছে তার ঘরে। রাত নামছে। আজ প্রতিমার আসার কথা। তার চাকরির খবর নিতে। মোহনলাল কথাটা কারখানার মিত্র সাহেবকেও জানিয়েছে।

—একটি মেয়ের চাকরি করে দিতে হবে স্যার।

মিঃ মিত্র বলে,

—আবার কাকে হাতে আনতে চাও হে মোহনবাবু।

মিত্রসাহেব জানে মোহনলালের স্বভাবের কথা। অবশ্য মোহনলাল তাকেও নানা ভাবে খুশি করে। মিত্রসাহেব অবশ্য মোহনলাল আর রতনের দলকে সমান তোলাই দিয়ে যায়।

মোহন বলে—এসব মানে রাজনীতির ব্যাপার স্যার। চাকরি দিতে পারলে ওই রতনদের একটু ঘা দিতে পারা যাবে। মেয়েটা কাজের ওদের দলে তাই যেতে দিতে চাই না।

মিত্র সাহেব বলে—দেখি চেষ্টা করে। পরীক্ষা তো দিক—

মোহনলাল কিছুটা খেত তৈরি করেছে। আজ প্রতিমাকে সেই সুখবরটা দেবে। তার চোখে ভাসে ওই প্রতিমা। মোহনলাল তার অপেক্ষায় বসে আছে। আজ বাজার থেকে সে সন্দেশ কেক এসব কিনে এনেছে অতিথি সৎকারের জন্য। কিন্তু অতিথির দেখা নেই, মদের নেশাটাও জমে উঠেছে। এমন সময় দরজা খোলার শব্দে খুশি হয়ে বলে,—কখন থেকে বসে আছি তোমার জন্য, এই আসার সময় হল প্রতিমা।

তারপরই ওর দিকে চাইতে দেখে মোহন—এ প্রতিমা নয় তার দলের বিশ্বাসী অনুচর কেষ্টা। ওর ডাকনাম চোরাকেষ্টা। আসলে ছেলেবেলায় কেষ্ট নাকি চুরি করেছিল আর এখন ধেড়ে বয়সে দোকানে সিঁধ কেটে মালপত্র চুরি করে আর দিনের বেলায় মোহনের দলের হয়ে গলা ফাটিয়ে স্লোগান দেয়। কেষ্টা বলে,

—খবর শুনেছ বস। ওই শালা জীবনের আজ বিয়ে। শালা সানাই বাজিয়ে ঘটা করে বিয়ে করেছে ওই কলোনির একটা মেয়েকে। মোহনলাল বলে—তাই নাকি? ব্যাটা আবার একটা মেয়ের সর্বনাশ করলো।

কেষ্টা সব খবর রাখে। বলে—

—মেয়েটা পরশু তোমার কাছে চাকরির জন্য এসেছিল।

চমকে ওঠে মোহন—কে প্রতিমা!

কেষ্টা বলে—হ্যাঁগো। জীবন বেশ দমকা খরচা করে মেয়েটাকে গেঁথেছে মাইরি। বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালা। সেদিন মেয়েটা এলো, ভাবলাম তোমার জালেই শিকার পড়লো, তা নয় শিকার ধরলো ওই জীবন।

এ যেন মোহনেরই অপমান। মোহন বলে,

—তুই যা।

কেষ্টা বুঝেছে গুরুর মন-মেজাজ ভালো নেই। তাই কাছে এসে বলে—মেয়েছেলের অভাব নেই বস। বলো তো একটাকে আনি—ধমকে ওঠে মোহন—যা তো। ওসব ঝুটঝামেলায় আমি নেই। কেষ্টা হতাশ হয়ে চলে যায়। মোহনলালকে আজও জীবন টেক্কা দিয়ে গেল। ওই ছেলেটা এবার মোহনলালকে এখান থেকে

হটিয়ে দেবার চেষ্টা করছে। আর তারই জন্য শক্তি সংগ্রহ করেছে জীবন।

জীবন তখন গরদের ধুতি পরে খুব চেষ্টা করে মন্তর পড়ছে পুরোহিতের সঙ্গে। গলায় মালা পাশে বসে কনের সমাজে প্রতিমা।

সেদিন দোকান বন্ধ। অবিনাশবাবুর সেদিন ছুটি। বিজনও এসেছে সকালে। অবিনাশবাবুর ওখানে আসে বিজন খোঁজখবর নিতে। কমলা বলে—বাবা বিজন! জীবন কদিন বাড়ি আসেনি। ওকে খোঁজ নিতে বললাম ওর দোকানের কাজ। সময় নেই। তুমি বাবা একটু রতনের অফিসে খবর নাও—

বিজন জানে জীবন এমন মাঝে মাঝে পাঁচ-সাত দিন উধাও হয়ে থাকে। তার নানা কাজ। বিজন বলে—ঠিক আছে। আজই যাব। হঠাৎ এমন সময় একটা গাড়ি এসে থামে বাড়ির সামনে। পাড়ার ছেলে-মেয়ে-বউঝিরাও ভিড় করেছে। কে একজন ছুটে এসে খবর দেয়ে কমলাকে।

—মাসিমা, জীবনদা বিয়ে করে বউ এনেছে গো। বেশ সুন্দর বৌ, কমলা চমকে ওঠে—বিয়ে করেছে জীবন!

অবিনাশবাবু চায়ের কাপটা মুখে তুলতে যাবেন। এহেন সুখের খবর শুনে তিনি চমকে ওঠেন। তাঁর মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে।

—সে কী? জীবন বিয়ে করেছে? কোথায়?

ছেলেটা বলে—ঐ যে আজাদ কলোনির একটা মেয়েকে।

অবিনাশবাবু এবার গর্জে ওঠেন।

—এসব বাঁদরামি মেনে নেব না। ওকে নিয়ে জ্বলেপুড়েই কি মরতে হবে চিরকাল? এবার একটা হেস্তনেস্ত করব।

এর মধ্যে জীবন নতুন বরের বেশে প্রতিমাকে নিয়ে দরজার সামনে এসে পড়ে। কমলা গিয়ে দাঁড়িয়েছে। পাড়ার বউঝিরাও ভিড় করেছে নতুন বর-বউ দেখার জন্য। জীবন মাকে প্রণাম করে। প্রতিমাও। কমলা কী করবে বুঝতে পারে না, ঘটনার নাটকীয়তায় সেও হকচকিয়ে গেছে। বিজনও দেখছে ওদের। বাড়ি ঢুকতে যাবে এবার অবিনাশবাবু বলে কঠিন স্বরে—দাঁড়াও।

জীবন চাইল। প্রতিমা ঘামছে। জীবন বাবাকে প্রণাম করতে যাবে। অবিনাশবাবু বলেন,

—থাক। ওসবের দরকার নেই। তোর এসব ব্যাপার আমি মেনে নিতে পারব না।

—বাবা। জীবনও ঘাবড়ে গেছে বাবার ওই কণ্ঠস্বরে।

অবিনাশবাবু বলেন,

—এ বাড়িতে আর এসো না তোমরা। যা খুশি করেছো তার সব দায় তোমার। তোমার দায় থেকে এবার আমাদের মুক্তি দাও। চলে যাও এখান থেকে।

কমলা আর্তনাদ করে—কী বলছো তুমি? নতুন বিয়ে করে ঘরে এলো—ঘরের লক্ষ্মী।

—অলক্ষ্মী। একবার জানবার দরকারও বোধ করেনি? কোথাকার একটা মেয়ে

কি তার বংশ পরিচয় জানা নেই। তাকেই মেনে নিতে হবে? বিজন দেখছে ব্যাপারটা। কমলা কাঁদছে, জীবনও ভাবেনি যে বাবা এইভাবে তাদের অভ্যর্থনা করবে। প্রতিমার চোখে জল নামে। বিজন বলে—কাকাবাবু, এ আপনি ঠিক করছেন না।

অবিনাশ বিজনকে স্নেহ করেন—তার কথার দাম দেন।

—কেন। অবিনাশবাবুও এবার যেন বুঝতে পারেন রাগের বশে তিনি বেশ কড়া একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে বসেছেন।

বিজন বলে—বিয়ে যখন করেছে জীবন তখন মেনে নিন। জীবন বাড়িতে না জানিয়ে ঠিক করেনি কিন্তু ওই মেয়েটি এসেছে স্বামীর ঘর করতে। ওর আশা স্বপ্নকে মিথ্যা করতে পারেন না। ও তো কোন দোষ করেনি।

কমলা পুত্রস্নেহে অন্ধ। স্বামীর ওই সিদ্ধান্তে সে ভয়ই পেয়েছিল। তার প্রতিবাদ করার শক্তি নেই। এবার বিজনকে প্রতিবাদ করতে দেখে বলে কমলা,—তাই বল বাবা। মেয়েটির কী দোষ। যা করার করেছে জীবন। মেয়েটা কেন শাস্তি পাবে?

অবিনাশবাবু দেখছেন প্রতিমাকে। মেয়েটি ফুপিয়ে কাঁদছে। অবিনাশ বলেন—তুমি বলছ বিজন।

বিজন বলে—হ্যাঁ, কাকাবাবু। ওদের মেনে নিন, আশীর্বাদ করুন।

অবিনাশবাবু বলেন—ঠিক আছে।

এর মধ্যে পাড়ার বউ-ঝিরা বরণডালা, প্রদীপ সাজিয়ে এনেছে। শাঁখও এসেছে। উলুধ্বনি দেবার জন্য মেয়ের অভাব হয় না। কমলা নতুন বৌকে বরণ করে ঘরে তোলে।

ছোট শহর। সবাই সবাইকে চেনে। তা ছাড়া জীবন এখন এখানে সুপরিচিত। তাই ওদের এই বিচিত্র বিয়ের খবরটা সহজেই শহরে ছড়িয়ে পড়ে। বিজন কদিন ব্যস্ত ছিল। আজ গেছে সীমার ওখানে—সেই বইটা ফেরত দিতে। বাইরের ঘরে নিতাইবাবুও রয়েছে।

এখন প্রায়ই তাকে দলের কাজের জন্য শহরে না হয় কলকাতায় থাকতে হয়। কদিন হল এসেছেন এখানে, তার দলের হয়ে নানা খবর পেয়ে। নিতাইবাবুরও এবার ভাবনা হয়। দেশ স্বাধীন হবার পর তারা দেশকে নতুন করে গড়তে চেয়েছেন কিন্তু দেখা যায় দেশ যারা গড়বে সেই আদর্শবান মানুষই গড়া হয়নি। দুশো বছরের পরাধীন মানুষগুলো হঠাৎ স্বাধীনতা পেয়েছে। তারপরই তাদের দেশকে ভালোবাসার জন্য শিক্ষা দেওয়া হয়নি, ফলে দেশকে গড়ার চেয়ে নিজেদের ভাগ্য গড়ার দিকেই তাদের নজর বেশি। সর্বত্রই সেই মনোভাব ফুটে উঠেছে তাই এবার দেশের বঞ্চিত মানুষের দলও বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে। সামনে ভোট আসছে। এবার প্রতিপক্ষও তৈরি হচ্ছে সর্বশক্তি দিয়ে। দেশের মানুষও এবার তাদের অক্ষমতা অকর্মণ্যতার জন্য ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। ভোটের বাক্সে জবাবই দেবে।

তাই এসেছেন তিনি। রতন কার্তিকবাবু মায় জীবনদের কর্মস্পৃহার কিছু খবরই পেয়েছেন। বিজনকে দেখে চাইলেন। নিতাইবাবু।

—এসো।

বিজন প্রণাম করে, নিতাইবাবু বলেন,

—এদিকের খবর কি হে বিজন। বেশ তো রামরাজত্বে চলছে।

বিজনও জানে এখানের অনেক খবর। সে দেখে যায় মাত্র তার কাছেও এই পরিস্থিতি কে মেনে নিতে পারেনি।

বিজন বলে—সৎ মানুষের বড় অভাব। আজ এদল কর্তৃত্ব করছে এরা লুঠ করছে। কাল অন্যদল এলে তারা তো এই মানুষদের জগতের বাইরে থেকে আসবে না। তারাও লুঠবে না তা কে জানে?

নিতাইবাবু বলেন,

—তা সত্যি হে। আমরা ড্যাম গড়ছি—বড় বড় কারখানা শহর গড়ছি, কিন্তু মানুষ গড়তে চেষ্টাই করেনি। তাই মনে হয় যেইই আসুক এসব রক্ষা করতে পারবে কিনা কে জানে?

বিজনেরও মনে হয় স্বাধীনতা আসার পর স্বাধীন জাতির যে আদর্শ মূল্যবোধ সেসবই আজ হারিয়ে যেতে বসেছে। এর পরিণতি কি হবে তা জানে না সে।

সীমা অবশ্য আশা হারায়নি। দেখেছে সীমা বনানীর সমবায়ের কাজ। মেয়েরাও এখন সুযোগ পেলে অনেক কিছুই করতে পারে সেটাই মনে হয়।

বনানীও এসেছে সীমার কাছে, সীমার টাকার অভাব নেই। সেই টাকা আবার সীমাও সদ্ব্যবহার করতে চায়। সেও বনানীকে বলে,

—নতুন কিছু বিভাগও খোলো বনানীদি, ছোট করে একটা চিনামাটির জিনিসপত্র তৈরির কারখানাই করো সমবায় থেকে।

বনানী বলে—সে তো অনেক টাকার দরকার।

সীমা বলে—টাকার জন্য ভাবতে হবে না। আর ফায়ার ক্লে পাবে আমাদের খাদান থেকে।

এমন সময় বিজনকে আসতে দেখে চাইল সীমা।

—তুমি! এসো—

বিজন বলে—তোমাদের কাজে বাধা দিলাম না তো। কি বনানীদি। বনানী বলে—না না।

সীমা বলে—তুমি এসে ভালোই করেছ। তুমি তো এসব ব্যাপার কিছু জানো। ফায়ার ক্লে দিয়ে তৈরি কাপ ডিশ ইলেকট্রিক ফিউজ ইনসুলেটর এসব তৈরি করতে চাই। একটা প্রোজেক্ট রিপোর্ট বানাতে হবে। উইলসন সাহেবকে বলে দ্যাখো না।

বিজন বলে—তাহলে সত্যিই কিছু করতে চাও। সীমা বলে—এম. এস. সি. পাশ করে ওই নিয়েই থাকব। মেয়েদের কাজের ব্যবস্থা হবে।

বিজন বলে—ঠিক আছে, বলছি মিঃ উইলসনকে।

তিনিও এবার রিটায়ার করবেন—আর ওদিকেই ওই পাহাড়তলীর ধারে একটা বাংলো খামার বাড়ি করেছেন। তিনি বলেন আশ্রম হবে। উনি যদি একাজে হাত দেন ভালোই হবে।

বনানী বলে—দ্যাখো। আজ চলি সীমাদি, পরে দেখা হবে।

বনানী চলে যায়। বিকালের ম্লান আলো নামছে পাহাড় বনে। বাগানের গাছে ঘরে ফেরা পাখিদের কলবর উঠে। সীমা বলে,

--জীবন নাকি বিয়ে করেছে।

জীবন যে বিজনের আত্মীয় তা জানে সীমা। এও জানে যে দুজনের মধ্যে আসমান জমিন ফারাক রয়েছে। বিজন বলে,

—হ্যাঁ, কাকাবাবু তো ঘরেই নেবেন না ওদের। শেষ অবধি রাজি হন।

সীমা বলে—দ্যাখো এবার যদি জীবন বদলায়।

বিজন বলে—কে জানে। যদি সত্যিকার ভালোবাসা থাকে, তাহলে সুফল কিছু ফলতে পারে। কিন্তু আমার মনে হয় আজকের জীবনটা মানুষকে ভালো- বাসতে ভুলে গেছে। তারা ভালোবাসে নিজেকে, জানে নিজের স্বার্থ আর টাকা। তাই ভয় হয় এর পরিণতি কী হবে কে জানে।

সীমা দেখছে বিজনকে। বলে,

--তা সত্যি, প্রকৃত ভালোবাসা মানুষকে এগিয়ে দেয়। বাঁচার পথ দেখায়। জীবনভর মানুষ সেই ভালোবাসার সন্ধান করে। কেউ পায় কেউ পায় না। শূন্য হাতেই ফিরে যায়।

সীমাকে দেখছে বিজন। মনে হয় সীমাও যেন এমনি পড়ন্ত দিনে ঝরা বকুলের গন্ধ মেলা এক স্বপ্নের জগতে সেই পরম পাওয়ার সন্ধান করে চলেছে। একা সীমা নয়, বিজনও। নিজের মনের এই ব্যাকুলতাই যেন বকুলগন্ধে ফুটে উঠেছে।

মিঃ উইলসন এবার রিটায়ার করতে চলেছেন। দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর ধরে উইলসন এখানে কাজ করেছেন। তরুণ বয়সে এসেছিলেন এখানের কারখানায়। তখন ইংরেজদের যুগ ওদের মালের বাজারও ছিল। ক্রমশ কারখানা আরও বড় হয়। সেই বাড়বাড়ন্ত দেখেছে সে। তারপর দিন বদলে গেল। স্বাধীনতার পর কারখানার কাজ ভালোই চলছিল। কিন্তু এবার সরকারি উদ্যোগে বেশ কিছু আধুনিক স্টিল কারখানা হবার পর লোহার প্রোডাকশন হতে শুরু হয়েছে অনেক কম খরচে সেখানে। এখানে পুরনো আমলের ব্লাস্ট ফার্নেস। এতে লোহার ইনপুট বের করতে খরচ অনেক বেশিই পড়ে। বাইরের থেকে মাল কিনলে অনেক কম দামেই তার স্পান-পাইপ বিভিন্ন সাইজের পাইপ জয়েন্ট কাস্টিং এসব করতে পারবে। তাই এই পুরনো ব্লাস্ট ফার্নেস তুলে দেবার সিদ্ধান্তই নেওয়া হল।

এই মিটিং-এ মিঃ মিত্র মিঃ রায় উইলসনও ছিল। মিঃ রায়, মিত্রসাহেব এই প্রস্তাবে নীরব থাকে। কিন্তু উইলসন বলে,

—ব্লাস্ট ফার্নেস তুলে না-দিয়ে এখানেও আধুনিক প্রযুক্তির ফার্নেস করা হোক। আমাদের প্রয়োজন মতো ইনসট রেখে বাকি মাল আমরাই অন্যত্র বিক্রি করব। তাতেও লাভ হবে। বাইরের থেকে মাল এনে কাজ করতে গেলে খরচও বাড়বে আর কোয়ালিটিও থাকবে না। নতুন ব্লাস্ট ফার্নেস করা হোক।

এই খবর ছড়িয়ে পড়ে বাইরে। কারখানার গৌরব ওই ব্লাষ্ট ফার্নেস। ভারতের প্রাচীনতম ফার্নেস। শ্রমিকদের মধ্যেও এবার আন্দোলন শুরু হয়। ব্লাস্ট ফার্নেস

তুলে দেওয়া চলবে না। তাতে কারখানার চরম ক্ষতি হবে। এত স্টাফ ছাঁটাই হয়ে যাবে।

এই নিয়ে শুরু হয় আন্দোলন। ওদিকে বোর্ডের কিছু সভ্য গোপনে অন্য কারখানা থেকে লোহা কেনার চুক্তিও করেছে অবশ্য তারা ভাল কাটমানিও পাবে। তারা ওই হুকুম রদ করতে চায় না। জেনারেল ম্যানেজার মিঃ আগরওয়াল।

উইলসন যে এমন একটা কথা বলবে তা ভাবেনি ওরা।

মিঃ মিত্র বলে,

—উইলসন এই প্রস্তাব তুমি তুলে নাও। কেউ চান না।

উইলসন বলে,

—কারখানার ধ্বংসের কাজ শুরু করবেন না মিঃ মিত্র। ব্লাস্ট ফার্নেস চলে গেলে এই কারখানাও বিক্রি হয়ে যাবে।

মিঃ মিত্র বলেন—তোমার প্রমোশন যদি হয়, তাই দেখব।

উইলসন বলে,

—শ্রমিকদের বঞ্চিত করে কারখানার ক্ষতি করে আমি প্রমোশন চাই না মিঃ মিত্র।

ক্লাবেও অনেকে বলে—ব্যাটা পাগল।

মিঃ মিত্র এবার রতন, মোহনলালের শরণাপন্ন হয়। তাদের বলা হল যে ব্লাস্ট ফার্নেস হবে তাই পুরনোটাকে ভেঙে ফেলতে হবে।

কার্তিকবাবুর বাগান বাড়িতে মিঃ মিত্র এসেছে, মোহনলালও আসে। মিঃ মিত্র তার হাতে বেশ কিছু টাকা দিয়ে ওই খবর দিয়ে বলে—শ্রমিকদের বোঝান এই বলে পুরোনো ব্লাস্ট ফার্নেস না-ভাঙলে নতুন ব্লাস্ট ফার্নেস বসাবার জায়গা হবে না। তাই ওটা ভাঙছি। ওদের কোনো ভয় নেই।

মোহনলাল বলে—পরে তো করবেন না তখন—

মিঃ মিত্র বলে—এখন তো আপনাদের লাভ হলো। পরে বলা যাবে মেশিনারি আসছে বিদেশ থেকে তাই দেরি হচ্ছে।

এইবার শ্রমিকদের সভায় ঘোষণা করে মোহনলাল,

—ভাই সব! কোম্পানি এবার আধুনিক ফার্নেস বসাবে। আমাদের চাপে আমাদের আন্দোলনে তারা বাধ্য হয়েছেন। এ আমাদের জয়।

এবার তুমুল জয়ধ্বনি উঠে। মোহনলালও বুঝেছে শ্রমিকরা তার টোপ গিলেছে। সে বলে,

—তাই ওই পুরনো ফার্নেস ভেঙে ফেলে ওখানেই আধুনিক প্রযুক্তিতে ব্লাস্ট ফার্নেস গড়া হবে। সস্তায় আরও অনেক বেশি লোহা পাওয়া যাবে। প্রোডাকশনও বাড়বে। তাই আমার অনুরোধ ওই সেকেলে ফার্নেস ভাঙতে আপনারা বাধা দেবেন না—আপনাদের মঙ্গলের জন্যই। আমরাই জয়ী হয়েছি।

তুমুল হাততালি পড়ে। উইলসন ওসব শুনে অবাক হয়। কিন্তু তার কণ্ঠস্বরকে ওদের নেতার জয়ধ্বনি থামিয়ে দিয়েছে।

সেই ম্যান সাহেবের প্রতিষ্ঠিত কারখানার ভারতের প্রথম ফার্নেস এবার ভেঙে

পড়লো।

রতনের দল বাধা দিতে গিয়ে পারলো না। কর্তৃপক্ষ আগে থেকে পুলিশের ব্যবস্থা করেছিল। পুলিশ তাদের কিছু লোককে এ্যারেস্ট করে নিয়ে গেল। ভেঙে পড়লো সেই ফার্নেস। শিয়ালডাঙা কারখানার বুক থেকে যেন একটি অধ্যায় বিলুপ্ত হয়ে গেল। তখনও সেই মহান নেতা ঘোষণা করে চলেছে, নতুন ব্লাস্ট ফার্নেসের কত ক্যাপাসিটি হবে তার কথা। শ্রমিকরাও আশা করে আছে।

উইলসনের প্রমোশন আর হয়নি। অবশ্য তার জন্য উইলসন দুঃখিত নয়। ওই বাংলোও ছাড়তে হবে তাকে। কোম্পানি আর চাকরিতে এক্সটেনশন দেয়নি। ওকে চলে যেতে হবে বাংলো থেকে।

ওদিকে শ্রমিকরাও জেনে গেছে যে উইলসন সাহেব ব্লাস্ট ফার্নেস তোলার বিরোধিতা করেছিলেন, তাই তাকে আর চাকরিতে রাখতে রাজি নয় বোর্ড।

মোহনলাল বলে—তা কেন? ব্যাটা ওই কার্তিকবাবুর কাছ থেকে গোপনে ছাঁট বিক্রি করতো ধরা পড়েছে। তাই ওকে চাকরিতে রাখবে না কোম্পানি।

উইলসনের বাংলোতে রতন এসেছে। এখন বাংলোতে একাই থাকে উইলসন। তার দেখভাল করে এক আদিবাসী বুড়ি আর একটা ছেলে, বুড়ি বলে—এই সাহেব, চাকরির পর তু তোর মেমসাহেবের কাছে চলে যা। ঘর সংসার করগে সি দেশে। ইখানের লুক তুকে কি দিয়েছে রে।

উইলসন হাসে! সে বলে—এই আমার দেশ মাই, ভিনদেশে তুর মত মাই কি পাব রে।

বুড়ি বলে—তু সত্যিই পাগল বটে রে।

উইলসনের মনে পড়ে, এই বাংলোতে সে প্রথম নোরাকে এনেছিল। তাদের সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে তার মেয়ের কথা। আজ তারা কতদূরে কোন মহাদেশের বাসিন্দা। বড়দিনে ওদের কার্ড আসে মাত্র। ঐ টুকুই তাদের সাথে তার যোগসূত্র। তারা উইলসনকে আপন করে নিতে পারেনি।

যা করতে পেরেছে এই বুড়ি।

রতন আসে। উইলসন তখন বেশ নিবিষ্ট মনে তবলায় বোল তুলছে। এবার যাত্রার পালা ধরবে। রিটায়ার করার পর নিশ্চিন্তে যাত্রাগান করবে।

রতন বলে—সাহেব, তোমাকে কোম্পানি এক্সটেনশন দেবে না শুনলাম।

উইলসন বলে—আমি নিচ্ছি না। অনেক নোকরি করলাম, ব্যস, এবার ছুটি। ওই আশ্রমে শান্তিতে থাকব। রতন বলে—মোহনলাল-এর দল মিথ্যে কথা বলছে শ্রমিকদের, ফার্নেস আদৌ হবে না।

উইলসন বলে—তুমিও কিছু করতে পারবে না রতন। মোহনলালের দল এখন অনেক বেড়েছে। কোম্পানি নাকি ওদেরই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। মোহনলাল তাদের পাইয়ে দেবার স্বপ্নই দেখাচ্ছে। ওদের ফেরাতে পারবে না।

রতনও জানে সেটা। সে বলে,

—কিন্তু কোম্পানিকে মেরে শ্রমিকদের পাওনা কিছু দিলে কি সমস্যার সমাধান হবে। তাদের দেবার কথাই বলছে, তাদের তো কাজ করার কথা বলছে না।

উইলসন বলে,

—তাহলে তো শ্রমিকরা চটে যাবে।

রতন বলে—কিন্তু প্রোডাকশন না হলে কোম্পানিই বা টাকা দেবে কী করে?

উইলসন বলে,

—এর জন্যই তোমার দলে শ্রমিক কমে যাচ্ছে রতন। এখন ওদেরই যুগ আসছে।

রতন বলে—কিন্তু এতে আখেরে কোনো লাভই হবে না?

—বর্তমানে তো হচ্ছে। ওরা অতো ভাবে না।

এবার উইলসন পিছনের পরিচয় ভুলে নতুন করে বাঁচার চেষ্টা করবে সে।

রতন চলে যাবার পর উইলসন তবলায় বোল তুলছে। ঢুকছে বিজন, বিজনকে দেখে চাইল উইলসন।

—তুমিও কি সান্ত্বনা দিতে এসেছ আমাকে বিজন? আরে আমি সবসময়ই অলরাইট থাকি। এখন তুমি তো নামী লেখক। একটা বেশ জমিয়ে এখানের ঘটনাটি এখানের মানুষের জীবন নিয়ে নাটক লেখ। বিজন বলে—নাটকের জন্য আসিনি। এসেছি একটা কাজের কথা বলতে।

—কাজের কথা? অবাক হয় উইলসন।

—সীমাদের ওই ফায়ার ক্লে কারখানার কথা। টাকার জন্য আটকাবে না। যদি উইলসন সাহেব ভার নেন। তাহলে প্রজেক্ট রিপোর্ট করে দিতে হবে—আর কাজও শুরু করতে হবে।

উইলসন শোনে ওর কথা। উইলসনও ভাবছে ওর কথাটা। বিজন ওকে মহিলা সমবায়ের কথা বলে,

—গরিব মেয়েদের জন্য ওরা অনেক কাজ করছে।

উইলসন বলে,

—আমি শুনেছি ওদের কথা। এখন নিতাইবাবুর ভাইয়ের মেয়ে যদি ওই কারখানার জন্য টাকা-পয়সা জায়গা-জমি দেয়, আমিও চেষ্টা করব ওই কারখানা গড়তে।

বিজন বলে,

—তাহলে একদিন চলুন—সাইট, ওদের ফায়ার ক্লের খাদান, এসব দেখে আসবেন, আর ওদের সঙ্গে আলোচনাও হবে।

উইলসন বলে,

—নিশ্চয়ই যাব।

সাহেবদের ক্লাবের কর্ণধার এখন ওই আগরওয়াল, মিঃ মিত্র, মিঃ রায়দের দল, বিদেশি সাহেবদের চলে যাবার পর এখন ওদেরই রাজত্ব। মিসেস সহায়ের মুখে চোখে এখন বয়সের ছাপটা আর প্রসাধনেও ঢাকা যায় না। ফুটে ওঠে।

এখন নতুন ইঞ্জিনিয়ারদের অতি আধুনিক বউরাও এসেছে। ক্লাবে তারা কেউ সালোয়ার কামিজ কেউ বা জিনস-গেঞ্জি পরে দেহের রেখাগুলোকে স্পষ্ট করে মিঃ আগরওয়াল, মিঃ মিত্রর গায়ে ঢলে পড়ে হাসতে হাসতে। হাসির তোড়ে সারা দেহ

কেঁপে ওঠে।

রীনার এই পরিবেশ ভালো লাগে না। সে এর মধ্যে বাবুপাড়ার ওদিকে স্কুলের এক শিক্ষিকা। ওখানে নাচগানের স্কুল খুলেছে, রীনা সেখানে গান সেখায়। মাঝে মাঝে তাদের নাচগান শেখানোর স্কুলের অনুষ্ঠানও করে এই রিক্রিয়েশন ক্লাবের হলে। টাউনশিপে এখন রীনা পরিচিতা ওয়ার্কস ম্যানেজারের স্ত্রী হিসাবে নয়। তার গানের জন্য।

মিঃ মিত্র অবশ্য বলে,

—তোমার জন্য আমার সামাজিক স্ট্যাটাসও নেমে যাচ্ছে।

রীনা শুধোয়—কেন? তোমার মাথা নীচু করার মতো কোনো কাজ তো করিনি।

মিঃ মিত্র বলে,

—আগের ওয়ার্কস ম্যানেজারের স্ত্রীরা ওই বাবুপাড়ার দিকে যেতো না, আর তুমি ওখানে গিয়ে নাচগান শেখাও। বাবুদের ক্লাবে ফাংশন করো।

রীনা বলে,

—তোমাদের ক্লাবে গিয়ে মদ খেতে আর বড়কর্তাদের গায়ে হেসে গড়িয়ে পড়লেই তোমার সম্মান বাড়তো, তাই না? ওয়ার্কস ম্যানেজার হয়েছ বলে কি সমাজের মাথায় চড়ে বসেছ?

মিঃ মিত্র বলেন,

—তোমাকে বোঝানো যাবে না।

রীনা বলে—কি ওয়ার্কশপের কাজ দ্যাখো। কর্তাদের কয়েকজনকে খুশি করার জন্য ফার্নেসই তুলে দিলে। কারখানার প্রোডাকশন কমে গেল। লাভ হল বড় কর্তাদের। নিজের কাজটা করতে পারো না ঠিকমতো, আবার স্ট্যাটাসের কথা বলো।

—ওটা বড়কর্তাদের পলিসি।

—এতগুলো লোকের অন্ন গেল। আর ওদিকে লোহা কেনার কাজ তো ভালোই চলেছে, কমিশনও আসছে ভালোই।

মিঃ মিত্র স্ত্রীর কথায় অবাক হয়। রীনা বলে,

—উইলসনকে তাড়ালে, ওর মত সৎ কাজের লোক আর আছে কারখানায়! ওই কার্তিকবাবুই এখন কারখানাকে লাটে তুলে দেবে তোমাদের হাত দিয়েই।

মিঃ মিত্র বলে,

—এসব কথা কারা বলে?

—শহরের চায়ের দোকানের লোকরাও এসব জানে, রিকশায় তো চড় না, চড়ো, দেখবে রিক্সাওয়ালারাও এসব কথা শুনিয়ে দেবে।

—মিঃ মিত্র বলে,

—শত্রুর রটনা। এখন কারখানা ভালোই চলছে তাই অনেকে গায়ের জ্বালায় এইসব কথা বলে।

রীনাও ভাবে কারখানা নিয়ে স্বাধীনতার পর বেশ কিছুদিন কারখানা ঠিকমতো চলেছিল, তারপরই কর্তৃপক্ষ, সাহেবদের নিজেদের স্বার্থে লোভ ক্রমশ বেড়ে উঠেছে আর তার জন্য খেসারত দিতে হচ্ছে কোম্পানিকে। উইলসন এরই প্রতিবাদ

করেছিল তাই তাকেও চলে যেতে হচ্ছে। অফিসার্স ক্লাব তার ফেয়ারওয়েল দেবার কথাও ভাবেনি। ওই লোকটা সাহেবদের কাছেও ছিল অচ্ছ্যুৎ আজকের দিশি সাহেবদের কাছেও সে ব্রাত্যই। তবু বিজন অন্যদের উদ্যোগে বাবুদের রিক্রিয়েশন ক্লাবে উইলসনের ফেয়ারওয়েলের আয়োজন করে। সেদিন রীনার নাচগানের স্কুলের ছেলেমেয়েরাও অনুষ্ঠান করে। উইলসনকে ওরা ধুতি-পাঞ্জাবি পরিয়েছে। গলায় মালা। এক বিদেশিও এই ভারতকেই তার ঘর, ভারতীয়দের তার আপনজন করে নিয়ে আজ পরিবার-পরিজনদের ছেড়েও রয়ে গেছে।

উইলসন গানও গায়। বিশুদ্ধ উচ্চারণে সে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইল সকলের সঙ্গে হইচই করে।

বিজনও আজ উইলসনের প্রসঙ্গে অনেক কথাই বলেন। শ্রমিকদের স্বার্থের পরিপন্থী কাজে বাধা দিয়েছে তাই তাকে বিদায় নিতে হয়েছে। এটাই জানে সকলেই।

উইলসন বলে—আমি এখানেই থাকব। আর যাত্রা করব এই আমার ঘর একে ছেড়ে যাব কোথায়?

হাততালি পড়ে।

রীনা শুনছে ওর কথা। উইলসন এখন এখানেই একটা ফায়ার ক্লে কারখানা করছে, তাও অনেকে জেনেছে। রীনাও চেনে বনানী, সীমাকে, ওদের স্কুলে সীমাও আসে। বনানীও ক্রমশ সার কারখানা লোহা কারখানার টাউনশিপের অনেক মেয়েকে নিয়ে এসেছে তাদের সমিতিতে। ফলে রীনা বলে উইলসনকে,

—তোমার নতুন কারখানার জন্য আগাম জানিয়ে রাখলাম। বেস্ট অব দি লাক্ উইলসন।

উইলসন বলে—অনেক ধন্যবাদ।

বিজন উইলসনকে নিয়ে এসেছে পাহাড়তলির ওদিকে শালবনের মধ্যে। বসতি একটু দূরে। সীমা বনানীও এসেছে। বনের মধ্যে দিয়ে মোরামের রাস্তাও রয়েছে। এখানের শালবনের মাঝে বেশ কিছুটা জায়গা গভীর করে খোঁড়া লাল মাটির পরই রয়েছে সাদা মাটির স্তর।

এই খড়ির মতো মাটিতেই রয়েছে চায়না ক্লে। এর থেকেই তৈরি হয় চায়না ক্লে। এর থেকেই তৈরি হয় কাপ প্লেট অন্য দামি ডাইনিং সেট। আর তার নিরেস ওই সাদা মাটি দিয়ে তৈরি হয় বৈদ্যুতিক নানা ধরনের ইনসুলেটর—ফিউজের স্ল্যাব—অনেক কিছু। বাজারে এর চাহিদাও প্রচুর।

উইলসন লোহা ফ্যাক্টরিতে এতদিন কাজ করলেও এদিকের দু-একটা ফায়ার ক্লে ফ্যাক্টরিতেও গেছে। তার চেনাজানা অনেকেই এই কাজের সঙ্গে জড়িত। কারণ এই অঞ্চলে কয়লা ছাড়াও ফায়ার ক্লেও প্রচুর মেলে। তাই এখানে এসব কারখানাও গড়ে উঠেছে। উইলসনও দেখেছে তাদের কাজ।

উইলসন খাদান দেখে বলে,

—এখানে অনেক মালই রয়েছে। এর কাছাকাছি কারখানা করতে হবে।

সীমা বলে,

—ওইদিকে গ্রামের পাশেই আমাদের অনেক জমি রয়েছে। ওখানেই কারখানা হতে পারে।

মাটির বুক চিরে পাহাড় থেকে একটা ছোট নদী বয়ে গেছে, ওখানে বারো মাসই জল থাকে। সীমা বলে,

—ওই জলও ব্যবহার করা যাবে।

উইলসন এবার মাঠের এদিকে এসে ঘুরছে। নিজেই নদীর জলে নেমে যায়। দেখছে এই গ্রীষ্মেও জলের গভীরতা, প্রবহমানতা।

উঠে আসে। তারপর বলে,

—সব ঠিকঠাক আছে মনে হচ্ছে। আমি একটা প্ল্যান রেডি করছি তারপর কাজে নামা যাবে সব হিসাবপত্র করে।

সীমা বলে—তাহলে আশা দিচ্ছেন আপনি।

উইলসন বলে—নিশ্চয়ই। ঠিকমতো করতে পারলে এই প্রজেক্ট কার্যকর হবেই। এখন চলি পরে দেখা হবে।

উইলসন চলে যায় বনানী বলে,

—এটা করতে পারলে সত্যি কাজের কাজ হবে।

সীমা বলে—করতেই হবে। কি বিজনবাবু।

বিজন বলে—উইলসন সাহেবের মাথায় পোকা নড়লে এই কারখানাও করিয়ে ছাড়বে। ও সত্যিকার কাজই করতে চায়।

বনানী কথাটা মনে করিয়ে দেয়—সীমাদি আজ মহিলা সমিতির মিটিং, যেতে হবে তো।

সীমার খেয়াল হয়—তাই তো।

বিজন বলে—মহিলা সমিতিতে তো আমার প্রবেশ নিষেধ। সুতরাং তোমরা যাও। আমি পথে নেমে যাব; দেখি উইলসন সাহেব কী প্রজেক্ট প্ল্যান করছে।

এবার ভোটপর্ব শুরু হয়েছে। নিতাইবাবু কিছুটা হতাশ হয়েছেন। যে স্বাধীনতার জন্য তারা সংগ্রাম করেছিলেন সেই স্বাধীনতা আসেনি। স্বাধীনতার পর বেশ কিছু স্বার্থপর মানুষের ভিড়ই দেখা যায় সর্বত্র। এই হতাশার জন্য এখন একশ্রেণী গজিয়ে ওঠে। তারা মানুষকে আরও অনেক কিছু দেবার কথা বলে,

এবার রতনও বুঝেছে তার দলের যতখানি কাজ করার উচিত ছিল তা করেনি। ওদিকে মোহনলালের দল বিপক্ষে থেকে তাদের কাজের সমালোচনাই করছে আর শ্রমিকদের বলেছে।

—তোমাদের বঞ্চনাই করেছে ওরা। তাই ওদের ভোট দিও না। আমরা এলে তোমাদের দুঃখ দূর করে দেব।

কৃষকদের কাছেও এবার আবেদন পৌঁছেছে তারাও তেমন সুবিধা কিছু পায়নি। জমিদারি প্রথা উঠে গেলেও কৃষক যেখানে ছিল সেখানেই রয়ে গেছে। এবার এরা শোনায়,

—লাঙল যার জমি তার। এমন প্রচারে কাজ হয়, তাই এবার ওদের জয়ী

হবার সম্ভাবনাই বেশি হয়ে ওঠে। ভোট হয় নানা ভাবে। মোহনলালের দল এখন এই অঞ্চলে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। কারখানা কোলিয়ারি অঞ্চলেও তারা দলে ভারী।

মোহনলাল এবার সব খুলে প্রচারে নেমেছে। এবার সে ভোটে দাঁড়াচ্ছে এখান থেকে। বসন্তবাবুর বিরুদ্ধে। মোহনলাল জানে ভোটজয়ী হবার মন্ত্রটা। মস্তান সমাজেও নতুন পুরোনোর ভেদ বিভেদ আছে। এককালে যে মস্তানি করেছে চিরকালই সে গদিতে থাকবে তার কোনো মানে নেই। নতুন শক্তি সাহস নিয়ে এবার মোহনলালও তার নতুন মস্তান বাহিনীর সৃষ্টি করেছে। তার এখন টাকার অভাব নেই। কার্তিকবাবুও হাওয়া বোঝে। সে এতদিন রতনদের মদত দিয়ে নিজের ব্যবসা চালিয়েছে।

এবার বুঝেছে হাওয়া অন্যদিকে বইছে। তাই সেও এবার পালটি খেয়েছে। সেদিন মোহনলাল তার বাড়িতে ভোটের কাগজপত্র দেখছে, ভোটার লিস্ট মিলিয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটের জন্য বলতে হচ্ছে।

সেদিন মোহনলাল ফিরছে রাতে ক্লান্ত হয়ে। কার্তিকবাবুকে দেখে চাইল। মোহন বলে—আপনি?

কার্তিকবাবু বলে—এলাম তোমার কাছে মোহনলাল, এবার ভোটে তুমি দাঁড়াচ্ছ শুনে মনে হল ঠিক কাজই করেছ। তুমি এখানের লোক। আরে বাইরে থেকে বসন্তবাবুকে দাঁড় করিয়ে কী হয়েছে এখানের মানুষের?

মোহনলালও জানে কার্তিকবাবুকে। আজ রাজনীতির ক্ষেত্রে এসে মোহনলাল বুঝেছে কার্তিকবাবুদের তাকে এখন দরকার। আর মোহনলালেরও দরকার কার্তিকবাবুকে।

কার্তিকবাবু একটা প্যাকেট বের করে বলে,

—এটা রাখো, দশ হাজার আছে। ভোটের জন্য টাকা তো লাগবে। আরও দেব। ওই বসন্তবাবুকে হঠাতেই হবে। কিছুই করেনি এখানের জন্য।

মোহনলাল টাকাটা নেয়। বলে,

—জানতাম আপনি পথে আসবেন কার্তিকবাবু।

কার্তিকবাবু বলে—আসব না! কতকালের পুরোনো বন্ধু।

আপনি এলে এলাকার চেহারাটাই বদলে যাবে।

ভোটের বাক্সে এবার অনেক কিছুই ওলট-পালট হয়ে যায়। এবার ভোটের দিন মোহনলালের দলও মরিয়া হয়ে ওঠে। দুচারটে মহল্লাতে প্রথমেই তারা বোমা ফেলে আতঙ্কের সৃষ্টি করে। লোকজনও ভয়ে পথে বের হয় না। এখানে ওখানে বোমা পড়ছে, কখন কার ওপর পড়বে কে জানে।

তাই তারা বের হয় না। অবশ্য তাদের ভোটও ঠিক পড়ে যায়। রতনের দলও বের হয়েছে জীবনের নেতৃত্বে। তারাও ওদের দলের ছেলেদের উপর বোমা ছোড়ে, তারাও প্রতিরোধ করে। ফলে ওই দিন এলাকায় আতঙ্কের ছাপই ফুটে ওঠে।

ভোট নয় যেন যুদ্ধই শুরু হয়েছে। জনগণের দ্বারা প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য এই স্বরূপ দেখে মানুষ—গণতন্ত্রের ভবিষ্যতের কথা ভেবে চিন্তিত হয়।

এবার মোহনলাল-এর দলই জিতেছে। বিপুল ভোটে। আর এবার শাসকের আসনে বসবে তারাই। মোহনলালকে নিয়ে শোভাযাত্রা বের হয়েছে। কার্তিকবাবুও রয়েছে মোহনলালের পাশে। সেও আবীর মেঘে শূন্যে দুহাতে তুলে চিৎকার করে—মোহনবাবু।

চ্যালারা ও চিৎকার করে জিন্দাবাদ।

সারা টাউনশিপ পরিক্রমা করে চলেছে মোহনলালের বিজয় রথ। এবার মোহনলালও খুশি তার স্বপ্ন সত্যি হতে চলেছে।

নদীর একদিকে গড়ে উঠে সবুজ শস্যক্ষেত্র, গ্রাম বসতি, আসে পূর্ণতার আশ্বাস। তখন নদীর অন্যদিকে চলে ভাঙনের পালা। সেখানে জাগে নিঃস্ব বালুচরের শূন্যতা। প্রকৃতির নিয়মটা সামাজিক জীবনে শূন্য হয়েই প্রতিফলিত হয়।

শিয়ালডাঙার সামাজিক জীবনেও সত্য হয়েই প্রতিফলিত হয়েছে সেটা।

নিতাইবাবু জানতেন যে এমন একটা কিছু ঘটবে। স্বাধীনতার পর জনসাধারণ তাদেরই বিপুলভোটে জয়ী করে এনে দেশগড়ার ভার দিয়েছিল। কিছু কর্মসূচিও নেওয়া হয়েছিল, গড়ে উঠেছে বড় বড় কারখানা জলাধার নদী প্রকল্প। যার থেকে জলও যাবে বিস্তীর্ণ জমিতে কৃষিপ্রধান দেশে শুরু হবে সবুজ বিপ্লব।

বেশ কিছু মানুষ দেশকে গড়ার কাজে এগিয়ে এসেছিলেন তারা কাজও শুরু করেন। কিন্তু তাদের মধ্যে এবার কিছু স্বার্থপর লোভী মানুষও জুটে গেল। তাদের শক্তিও কম নয়। উপরের তলায় বসলো তারা। আর তারাই সমাজের নীচু তলায় এক নতুন লুঠেরার দলের সৃষ্টি করল। মস্তান বাহিনীর জন্ম দিল তারাই। সেই লোভী স্বার্থপরের দল মস্তান বাহিনী কাজে লাগিয়ে এবার সমাজের বুকে একটা ক্ষতের সৃষ্টি করল।

জনসাধারণ দেখেছিল এসব নীরব দর্শকের মতো। আর অত্যাচারিত হয়েছিল তাদের হাতে। সেই অত্যাচারের কোনো প্রতিরোধও হয়নি। এই প্রতিবাদ হয়েছে এবার ভোটের বাক্সে। ওই রতন জীবনের দল সেই প্রতিরোধকে ঠেকাতে পারেনি তার পেশী বল দিয়ে। নিতাইবাবু আর সমরবাবু বহুদিনের পুরোনো বন্ধু। একসঙ্গে রাজনীতি করেছেন, জেলেও গেছেন। সমরবাবু পাশের শহরে শিক্ষকতা করতেন। বিয়ে-থা করেনি।

এখানে চাকরির জন্য এসে এই কারখানা কোলিয়ারী এলাকায় মানুষদের ভালোবেসে এখানেই রয়ে যান। ক্রমশ দুইজনে দুইপথে রাজনীতি করতে শুরু করেন। সমরবাবু এই এলাকায় কৃষক শ্রমিকদের নিয়ে কাজ শুরু করেন। তবে তাদের বন্ধুত্ব অটুটই রয়ে গেছে। তার কারণ তারা কোনো স্বার্থ নিয়ে রাজনীতি করেননি। মানবিক কর্তব্য বলেই সমরবাবু দরিদ্র নিপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। তার কর্তব্যবোধ আর বন্ধুত্ব দুটোর মধ্যে তাই কোনো টানাপোড়েন হয়নি।

সেবার নিতাইবাবুরা জিততে সমরবাবুরা এদের বলেন—এবার দেশের মানুষে

জন্য কিছু করো।

এবার নিতাইবাবুরা বিদায় নিয়েছেন। তবু নিতাইবাবুও গেছেন সমরের বাসায়। সমরবাবু তখন খুবই ব্যস্ত। তাই অক্লান্ত পরিশ্রমেই এবার এদিকে তারা জিতেছে। তাই সমরবাবুর দায়িত্বও বেড়েছে। নানা জায়গা থেকে কর্মী বিজয়ী নেতার দলও আসছে সমরবাবুর কাছে—তাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা গ্রহণ করার জন্য। এখন তাদের উপরই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবার দায়িত্বভার সমর্পণ করেছে মানুষ।

নিতাইবাবুকে আসতে দেখে সমরবাবু বলেন,

—এসো নিতাই।

নিতাই বলে—অভিনন্দন জানাতে এলাম সমর। এবার দেশকে নতুন করে গড়ার ভার তোমারই। তাই আগে থেকেই শুভেচ্ছা জানাতে এলাম।

সমরবাবু বলেন—এসো-এসো। ও ঘরে গিয়ে বসো, তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে। তোমার কাছে যাব ভেবেছিলাম। ভালোই হয়েছে তুমি নিজে এসে পড়েছো।

নিতাইবাবু বলেন,

—ঠিক আছে, বসছি আজ হাতে সময় নিয়ে এসেছি।

সমরবাবুর কাজের লোকও চেনে নিতাইবাবুকে। এদিকের নামীলোক। ভূষণ তার জন্য চা আনে। বলে,

—আজ খেয়েই যান বাবু।

নিতাইবাবু প্রায়ই এখান আসেন তাই ভূষণও তাকে ভালো করে জানে। বলে—পোস্ত কলাইয়ের ডাল আর মাছের টক করছি।

দুপুরে ভিড় একটু কমেছে। সমরবাবুও আজ নিতাইবাবুর কাছে জানতে চায় তাদের দলের পরাজয়ের কারণটা কী। এ নিয়ে অবশ্য সমরবাবুও ভেবেছেন। তাঁরও একটা ধারণা আছে তবু নিতাইবাবুর কাছে সেটার সত্যাসত্য যাচাই করে নিতে চান।

নিতাইবাবু অকপটে স্বীকার করেন তাদের অক্ষমতার কথা।

—সমর তোমাদের নীতিকে আমিও সমর্থন করি। সব রাজনীতির মূল কথা একই। দেশের মানুষের সার্বিক কল্যাণ সাধনা। তার জন্য পথ কিছু আলাদা। কিন্তু শাসক যে হয় তার চারিদিকে ভিড় করে স্বার্থপর মানুষের দল। তারাই নিজেদের সুবিধামতো রাজনীতির ব্যাখ্যা করে। তারাই আমাদের করেছিল। তোমাদেরও সেই ক্ষমতালোভী মানুষেরদের থেকে সাবধান করছি সমর।

সমরবাবু বলেন,

—আমারও সেই ভয় হয় নিতাই। আমাদের শুচিতা বজায় কি রাখতে পারব? নাহলে কিন্তু জনসাধারণেই একদিন আবার বাতিল করে দেবে।

নিতাইবাবু বলেন,

—দেশগড়ার সঙ্গে সত্যিকার মানুষ গড়ার কথাও ভাবতে হবে। না হলে যত চেষ্টাই করো ব্যর্থ হতে হবে।

মোহনলাল এসেছে সমরবাবুর কাছে। জেলাস্তরের প্রধান এখন সমরবাবু। কলকাতার নেতারাও তাকে গণ্যমান্য করেন। মোহনলালের খুবই ইচ্ছা সে এদিক

থেকে মন্ত্রী হন। কিন্তু জানে মোহনলাল দলের মধ্যে তার প্রতিষ্ঠা তেমন নেই। তার চেয়ে অনেক যোগ্য লোকই আছেন এখানে। তারাও ভোটে জিতেছেন। তবু তাদের ছাড়িয়ে যেতে চান মোহনলাল। কিন্তু সমরবাবু বলেন,

—এই প্রথম জিতেছো, এলাকার জন্য আরও কাজ করতে হবে যোগ্যতা পেতে হবে।

মোহনলাল ওই লোকটাকে সমীহ করে। আরও জানে সমরবাবু নিতাইবাবুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। মোহনও ভেবে নেয় সমরবাবুকে ওই নিতাইবাবুই তার সম্বন্ধে কিছু বলেছে। মোহনলাল বলে,

—আমার নামে নিশ্চয়ই কেউ কিছু বলেছে আপনাকে। তাই এসব বলেছেন, সমরবাবু ওর কথায় যেন অন্য কিছুর গন্ধ পান। তিনি জানেন যে মোহনলাল গোপনে কী কী করে থাকে। ওই লোকটাকে তারও পছন্দ নয়। তবু ওর কথায় স্থির কণ্ঠে বলেন,

—কারো কথায় আমি চলি না তা তুমি জানো। নিজেকে এবার বদলে ফেলে সত্যিকার কাজ করে যোগ্যতা দেখাতে পারলে নিশ্চয়ই আরও বড় দায়িত্ব পাবে।

বেশ বুঝেছে মোহন, এত খরচা এবং কৌশল করে ভোটে জিতেও মন্ত্রিত্ব পাবার হক তার জন্মায়নি। মোহনলাল বেশ চাপা রাগ নিয়েই ফিরে আসে।

তবে মোহনলাল চতুর স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি। সে জানে এই রাগটাকে চেপে রাখতেই হবে। এবার তাই হাসি মুখে সে নতুন করে দেশসেবার কাজ শুরু করে।

কার্তিকবাবু জানে কীভাবে পা ফেলে এগোতে হবে। এবার কার্তিকবাবু তাই আরও গভীরে জাল ফেলেছে। মিঃ মিত্রকে হাতে এনে এখন অনেক কাজই করছে। তবে ব্লাস্ট ফার্নেস উঠে যাবার পর কারখানার কাজ প্রায় অর্ধেক কমে গেছে। এভাবে চললে এরপর কোম্পানিকে লোকসানই দিতে হবে।

কার্তিকবাবু এবার মোহনলালের মারফত সার কারখানাতে ঢুকেছে। তাদের ওখানেও কাজ ভালোই হয়। তাই এবার মোহনলাল জিততে তাকে বিরাট সংবর্ধনা দিতে চায়। এবার কারখানার খেলার মাঠে বিশাল প্যান্ডেল করে সেই অনুষ্ঠান করা হচ্ছে। মঞ্চে রয়েছে মিঃ মিত্র, ফার্টিলাইজার কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার আরও অনেকে।

কলকাতা থেকে কোনো নামী গাইয়েকে আনা হয়েছে। লোকসমাগমও কম হয়নি। কার্তিকবাবু নিজে কোনো রকমে খুঁজে খুঁজে বিজনের কাছেই আসে।

এখন বিজনের নামও কিছু ছড়িয়েছে শহরে, লেখার জন্যে। তার একটা কাহিনি সিনেমাতেও খুব নাম করেছে। এখানের হলেও এসেছিল সেই ছবি। তারপর থেকে বিজন এখানে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

কার্তিকবাবু ওর হোস্টেলে এসে বলে,

—ইটা বেশ জব্বর করে লিখে দিতে হবেক বিজনবাবু।

বিজন শুনছে ওর কথা। কার্তিকবাবু বলে,

—মোহনলালের হয়ে মানে গুণটুনের কথা, মনদরদী, সমাজসেবী, একনিষ্ঠ কর্মী এইসব গালভরা কথা দিয়ে মানপত্র একটা লিখে দিন।

আমি শহরে ভালো করে লিখা বাঁধাই করে দোব।

বিজন একটু অবাক হয়, বলে---মানপত্রে ওসব কথাও লিখতে হবে।

কার্তিকবাবু বলে—সবাই লেখে ওসব কথা।

একটু লিখে দ্যান বিজনবাবু। কর্তাদের ব্যাপার, অর্থাৎ মোহনবাবুকে এখন সবাই হাতে রাখতে চায়। বিজনও ভাবছে কথাটা এইসব মিথ্যা কথাই লিখতে হবে তাকে।

অর্থাৎ তাকেও সব মিথ্যাকে মেনে নিতে হবে। কিন্তু জানে এখানের ব্যাপার রাজি না হলে তাকে বিপদে ফেলে দেবে এরা।

বাধ্য হয়ে বিজন বলে,

—ঠিক আছে। কালই পাবেন।

কার্তিক এবার পকেট থেকে খান দুয়েক একশো টাকার নোট বের করে বলে—খরচ খরচা যা লাগে।

বিজন বলে—না, না। ওসব লাগবে না। আমি লিখে দোব।

কার্তিক খুশি হয়, টাকাটা বেঁচে গেল তার। বলে,

—তালে কাল বৈকালে এসে নে যাব। বেশ রগরগে করে একটু গ্যাস ট্যাস দিয়ে লিখবেন কিন্তু।

মোহনলালকে আজ এই এলাকার মানুষ যেন নাগরিক সংবর্ধনা দিচ্ছে। বিজনকে নেমন্তন্ন করেছে কার্তিক। আর তার মানপত্রের প্রশংসাও করে অনেকে। মোহনলালকে তারা প্রায় দেবতার আসনে বসিয়ে দিয়েছে। এখন আকাশ-বাতাসে মোহনলালের জয়ধ্বনিই ওঠে। আর মোহনলালও জানে কী ভাবে এগোতে হবে তাকে। প্রতিপক্ষকে শেষ করার কাজে এবার নামতে হবে তাকে।

বনানী এখন শান্তিতে আছে। এখানের প্রাইমারি স্কুলে চাকরি করে সকালে। কচিকাঁচাদের নিয়েই কেটে যায় সময়টা। দুপুরে ফিরে স্নান খাওয়া সেরে কিছু লেখাপড়ার কাজই করে। সমবায়ের হিসাবপত্র দেখে। এখানে ওখানে চিঠিপত্র লেখার কাজও করতে হয়। বিকেলে যায় সমবায়ের অফিসে। সেখানে নানা কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। বাড়ি ফেরে তখন রাত আটটা বেজে যায়।

মাঝে মাঝে শ্রীমতীদের বাড়িতেও যায়।

বনানী লক্ষ্য করে এই পটপরিবর্তনটা। এসেছে মোহনলাল রাজনীতির মঞ্চে। সেদিন তাকে মঞ্চে মালা পরে সংবর্ধনা নিতে দেখেছে, আবার সার কারখানাতেও এসেছে। সেখানের শ্রমিকদের ভাষণ দিচ্ছে উদাত্ত কণ্ঠে,

—আপনাদের সব সমস্যা নিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করছি। আপনাদের বোনাস দেবার দাবিকে স্বীকার করে নিতেই হবে কর্তৃপক্ষকে। তুমুল হাততালি পড়ে। শ্রমিকরাও এবার স্বপ্ন দেখছে, প্রোডাকশন বোনাস এবার দ্বিগুণ হবেই।

মোহনলাল এসেছে মেয়েদের সমবায় অফিসে। কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে। মোহনলাল তাঁতঘর চামড়ার কাজের জায়গা, তাদের কাজ, অন্যসব কাজও দেখে। নিজেও মনে মনে অবাক হয়। এসব গড়ে উঠেছে বনানীর কয়েক বছরের অক্লান্ত

পরিশ্রমে। বনানীও রয়েছে ওই কর্মীদের সঙ্গে যেন ওরা কেউ কাউকে চেনে না। মোহনলাল কথা বলছে ওদের সেক্রেটারির সঙ্গে।

সেক্রেটারি আভাদি বলে,

—সরকারি অনুদান কিছু পেলে আমাদর সমবায় এর কাজ আরও বাড়াতে পারি। বেশ কিছু মেয়ের কাজের ব্যবস্থা হতে পারে। মোহনলাল বলে অভয়ের ভঙ্গিতে,

—দেখি চেষ্টা করে। তবে আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন। দরকার হলে আমিও আসব। আমি চাই সমবায় আরও বড় হোক। সমবায়কে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে।

বনানী এসব আওয়াজ শোনে মাত্র।

মোহনলাল-এর মধ্যে সার কোম্পানির কর্মচারীদেরও তার হাতে এনেছে। রতনদের দলের একটা ইউনিয়ন এতদিন কাজ করতো এখন তারা মোহনলালের মুখে ওইসব পাবার কথা শুনে তার দলেই ভিড়েছে।

এর কদিন পরেই সমবায় অফিসে ফার্টিলাইজার কোম্পানি থেকে চিঠি আসে যে সমবায় সমিতিকে তারা জায়গা বাড়িঘর শেড করে দিয়েছে জলও দিচ্ছে এর জন্য সমিতিকে মাসিক আড়াই হাজার টাকা করে দিতে হবে। আর বকেয়া এক বছরের ভাড়াও মিটিয়ে দিতে হবে—না-হলে সমিতির অফিস বন্ধ করে দেবে তারা।

এবার আভাদি বলে,

—বনানী এখন কী হবে? কোম্পানি এত টাকা চাইলে কোথা থেকে দেব? সমবায় তুলে দিতেই হবে। বনানীও বুঝতে পারে ব্যাপারটা। মোহনলালকে সে চেনে। সাপের চেয়েও হিংস্র। এর অনেক গোপন কাহিনির খবর জানে বনানী—ওর সার্টিফিকেটগুলোও জাল। আগেও দুতিনটে জালিয়াতির কেসে হাওড়াতে জেল খেটেছে। কেসও হয়েছে।

এখানের অনেকের অনেক সর্বনাশ করেছে, এবার বনানীর উপর প্রতিশোধ নেবার জন্যই তার সমবায়ের উপর এই আক্রমণ হেনেছে। এখন বনানী সমবায়ের সেই ফায়ার ক্লের কারখানার কাজ শুরু করেছে। আরও বাড়বে সমবায়। এমন সময় এই চিঠি পেয়ে অবাক হয় বনানী।

তাই অফিসেও খবর নিতে আসে সে। তখন অফিসে সদ্য গজিয়ে ওঠা ইউনিয়নের কর্মীরা অর্থাৎ অফিসের বাবুরা কাজ ছেড়ে কারখানার মাঠে বোনাসের জন্য মিটিং করছে। তারা ঘোষণা করে দরকার হলে ধর্মঘটই করবে। আর ধর্মঘট চলবে তাদের দাবি না-মেটা অবধি।

মোহনলালবাবু তাদের বেশ গ্যাসই দিয়েছে। তাই এবার আরও পাবার নামে সার কোম্পানিতে শুরু হয়েছে ঘনঘন কর্মবিচ্যুতি। প্রোডাকশনও মার খাচ্ছে। ঠিকমতো কাজ না হওয়ার দামি যন্ত্রপাতিও ব্রেকডাউন হয়ে পড়েছে। বিকেলে ঘণ্টা খানেকের জন্য কাজে বসতে এবার বনানী বড়বাবুকে চিঠিখানা দেখাতেও বড়বাবু বলে।

—মোহনলালবাবুই সেদিন কথাটা বলছিলেন। মানে কোম্পানির আয় বাড়াতে হবে তো!

বনানী বলে—ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজ বন্ধ, প্রোডাকসন বন্ধ হলে কি কোম্পানির আয় বাড়ে? সেটা চলছে অথচ এতগুলো মেয়ের রুজিরোজগার হচ্ছে সেটাকে বন্ধ করতে হবে? আমি বড়সাহেবের সঙ্গে দেখা করছি।

ব্যাপারটা বড়বাবুই মোহনলালের ইঙ্গিতে করেছিল। বড়সাহেব কেন ম্যানেজার সাহেবও জানেন না। এবার বনানীকে ওই কথা বলতে দেখে বলে বড়বাবু,

—এসব নিয়ে আপনি কথা বলতে পারেন না।

বনানী বলে,

—কেন আমি বলতে পারি না। আমাকেই বলতে হবে।

বড়বাবু ব্যাপারটা অনেক দূরই গড়াবে ভাবেনি। বড়বাবুই এবার বলে এনিয়ে আপনি ভাববেন না। ভাড়ার ব্যাপারটা মকুব হয়ে যাবে।

বনানী বলে,

—সেটা আগেই মকুব করার অর্ডার হয়ে আছে—কথাটা মোহনবাবুকে বলবেন। আর এ চিঠি রেখে দিলাম বড় সাহেবকেই আপনাদের জুলুমের কথা জানিয়ে দেব দরকার হলে।

বনানী মুখের উপর জবাব দিয়ে বের হয়ে আসে। এবার বুঝেছে মোহনবাবুই এসবের মূলে। তাই তাকেও তৈরি থাকতে হবে, পরবর্তী আক্রমণের জন্য।

এবার রতন-জীবনের দল বিপদে পড়েছে। এতদিন তারাই কর্তৃত্ব করেছে কারখানায়। এবার মোহনলাল ঘনঘন মিটিং শুরু করেছে সেখানে শ্রমিকদের নানা সমস্যা নিয়ে।

আর রতনরাও মিটিং করে। কিন্তু তাদের মিটিং-এ তেমন লোকজন আর হয় না। শ্রমিকরাও জেনেছে এখন যা কিছু করার তা মোহনবাবুই করবে—তাই তার দলেই এসে গেছে তারা। আর দাবিদাওয়া নিয়ে ওদের কণ্ঠস্বরও তত সরব হয়।

রতন এখনও স্ল্যাগের ব্যবসা করছে। তবে একটু সাবধানে। কার্তিকবাবুই এবার রতনকে বলে,

—ওসব কাজ বন্ধ রাখো রতন। দিনকাল ভালো নয়, একটু থিতু হতে দাও।

জীবন বলে,

—আমাদের কাজ বন্ধ করে দিতে চায়। দেখছি মোহনবাবুর দল ওই বিশে তেলিয়ারা এখন সুখলাল শেঠের ওখানে যাতায়াত করছে। রতন অবাক হয়—তাই নাকি? তাহলে ওরাই কি এবার এই কাজে নামবে?

জীবন বলে,—খবর নিচ্ছি। ত্যামন ত্যামন দেখলে সেবারের মতো এবারও ব্যাটাদের স্ল্যাগের তলে শুইয়ে দেব।

মোহনলালও ভোলেনি ওই জীবনদের কথা। ওর স্ল্যাগের ব্যবসা তারা শেষ করে দিয়েছে—ওই স্ল্যাগের অতলে পড়ে আছে মোহনের বেশ কিছু লোকজন। তাই এবার মোহনলালও তৈরি হয়েই ওই কাজে নামবে।

কার্তিকবাবু এখন তার কাছের লোক। মিঃ মিত্রকেও এখন মোহনলালের কিছু কথা মান্য করতে হয়, নাহলে মোহনলালও মিত্র সাহেবকে বিপদেই ফেলতে পারে। তাই মিত্রসাহেব টাকা পেয়েই খুশি। স্ল্যাগ ব্যাংকে যা পারে করুক কার্তিকবাবু আর মোহনলাল, কোম্পানি ওসব ব্যাপার দেখতে যাবে না।

রতন জীবনের দল তবু স্ল্যাগ-এর কাজ বন্ধ করেনি। রাতের অন্ধকারে তাদের দল মাল তুলছে। দুতিন খানা ট্রাকও রয়েছে। জীবনও রয়েছে তাদের কাজ তদারক করতে। গাছগাছালি ঘেরা জায়গা। নীচের দিকে সুড়ঙ্গের মুখ। ওই দিয়ে মালকাটারা ঢুকছে। নিপুণ হাতে গাঁইতি চালিয়ে তারা মাল কাটছে আর ওদিকে সেসব মাল এনে ট্রাকে তোলা হচ্ছে ঝড়ের গতিতে।

ওদের কাজ প্রায় শেষ, মালকাটারা তখন শেষবারের মতো মাল বের করছে। হঠাৎ অন্ধকারে কাদের টর্চের আলো জ্বলে ওঠে—একটা জিপও তেড়েফুঁড়ে আসে, ওর হেডলাইট গাছগাছালি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তারপরই শোনা যায় পুলিশের হুইসেল।

জীবনও চমকে উঠে। এর আগে কখনও পুলিশের রেড হয়নি। রতন সবাইকে হাতে রেখেই এসব কাজ করে। কিন্তু আজ পুলিশ এসে পড়বে ভাবতে পারেনি। জীবন তার দুতিনটে চ্যালাও তৈরি ছিল। দুজন নির্ভুল লক্ষ্যে দুটো স্ল্যাগের টুকরো ছুড়েছে জিপের হেডলাইট লক্ষ্য করে। পাথরগুলো হেডলাইটে লাগাতে আলোটা নিভে যায়।

জিপটাও অন্ধকারে পাহাড়ি পথে টাল সামলাতে না-পেরে ওদিকে ছিটকে পড়ে। ওদের চিৎকার আর্তনাদ শোনা যায়। আর এরাও এবার সুযোগ বুঝে যে যেদিকে পারে পালায়। ট্রাক দুটোও গতিবেগ তুলে বের হয়ে যায়। ওদের ব্যাকলাইটও নেভানো, ফলে নম্বরও দেখা যায় না। জীবন তার চ্যালারাও ওই ট্রাকে চেপে কেটে পড়ে মাল নিয়ে।

পুলিশের দল তখন জিপ থেকে কেউ খাদে কেউ পাহাড়ি ঝোরার বুকে ছিটকে পড়েছে। পাথরে ঘা খেয়ে জিপটার কারবোরেটরও তুবড়ে গেছে। রেডিয়েটর ফেটে জল গড়াচ্ছে।

মোহনলালই কার্তিকবাবুকে বলে, এবার পুলিশকে খবর পাঠান ওইসব চোরদের ধরার জন্য। মিঃ মিত্রও পুলিশকে জানান যে কোম্পানির লাখ লাখ টাকার মাল পাচার হচ্ছে।

পুলিশ অবশ্য এতদিন রতনদের প্রশ্রয় দিয়ে এসেছিল। তারাও প্রণামী পেত। এখন তাদের মোহনলালবাবুদের কথাই বেশি শুনতে হবে। তাই তারাও এসেছিল আজ রেড করে হাতেনাতে আসামিদের ধরতে। মোহনলালের কাছে খবর দিয়েছিল তেলিয়া, যে আজ মাল কাটা হবে।

মোহনের রাগ রয়েছে রতন-জীবনের ওপর। রতন এখন বনানীর ওখানে যায়। তার সমবায়ের পিছনে লেগেছিল মোহনলাল। বড়বাবুকে দিয়েই ও ভাড়ার জন্য চিঠি দিয়েছিল, এই ভাবেই বনানীর সমবায়কে শেষ করতে চেয়েছিল।

কিন্তু সেখানেও পারেনি। রতনই বনানীকে খবর দিয় যে বড়বাবু ওই

মোহনলালের ইউনিয়নের লোক। ওর কথাতেই বড়বাবু এসব করেছে। তাই বনানীও রুখে দিয়েছে সেই প্রচেষ্টা। আর ওই জীবন মোহনলালের দলের অনেক লোককে মেরেছে। তার হাত থেকে ওই প্রতিমাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। ওকেও একটা ঘা দেবে মোহনলাল। তাই অপেক্ষা করছে। যে পুলিশের সাহায্যে জীবন-রতনকে চুরির দায়ে ফেলতে পারলে সুবিধাই হবে। ওদের ভাবমূর্তিটাও নষ্ট করতে পারবে সহজে।

তেলিয়াও ছিল পুলিশের সঙ্গে তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেছিল সাইটে। তেলিয়া এসে পড়ে, হাতে কপালে চোট পেয়েছে গাড়ি থেকে ছিটকে পড়ে। জামাটাও ছিঁড়ে গেছে। মোহন ওর ওই অবস্থা দেখে বলে,

—কী হলরে! ধরা পড়েছে ব্যাটারা?

তেলিয়া বলে—কেস কিচাইন হয়ে গেছে বস্।

শালারা পুলিশের জিপে এইসা পাথর মারলো হেডলাইট চুরমার। অন্ধকার পাহাড়ি পথে জিপ ছিটকে পড়ে, ছোটবাবুও চোট পেয়েছে, তিনচারজন কনস্টেবল হাসপাতালে। আমি ছিটকে গাছের উপর পড়ে বেঁচে গেছি।

—ওদের কাউকে ধরতে পারেনি? মোহনলাল গর্জে ওঠে।

—না, শালারা সব কেটে পড়েছে।

মোহনলাল গর্জন করে—শালা অকম্মার দল, কোনো কম্মের নোস।

বের হয়ে গেল হাত ফসকে।

মোহন নিষ্ফল আক্রোশে গর্জন করে। এই পথে কাজ হল না। মোহনকে এবার অন্য পথই নিতে হবে—ওদের উচিত শিক্ষা দেবার জন্য।

অবিনাশবাবু দেখেছেন এই পট পরিবর্তন। এতদিন ছিল রতন-জীবনদের রাজত্ব। এবার তাদের দিন শেষ হয়ে গেছে এসেছে মোহনলালের দল।

রাতারাতি অনেকেই ডিগবাজি খেয়ে দল বদলেছে। বাজারেও কথা হয়। এবার রতনদের বিপদ না-হয়, মোহনলাল ওদের ছাড়বে না। অবিনাশের ভয় হয়। এখন তার সংসারে একজন পোষ্য বেড়েছে। প্রতিমা এদের বাড়িতে রয়েছে। অবিনাশবাবুও ক্রমশ মেয়েটার মায়ায় পড়ে গেছেন। প্রতিমাও বুঝেছে তাকে এখানেই থাকতে হবে। তাই সেও মানিয়ে নিতে চেষ্টা করছে। আর এর মধ্যে সে ওই বনানীর সমবায়ের খোঁজ পেয়ে বনানীর কাছেও আসে। প্রতিমা বলে,

—আপনার নাম শুনে এসেছি, আমিও কিছু কাজ করতে চাই।

বনানী দেখছে প্রতিমাকে। প্রতিমা বলে,

—আমি ওই কলোনিতে থাকতাম, এখন বিয়ে করে বাবুপাড়ায় থাকি। আমার স্বামীর নাম জীবন, ওই যে বাজারে স্টেশনারি দোকান আছে অবিনাশবাবুর, তারই ছেলে।

বনানী জীবনকে চেনে। রতনের বাহন সে। শহরে তারও কিছু সুনাম আছে। বনানী বলে,

—বেশ তো। কিছুদিন হাতের কাজ শিখতে হবে। তারপর কাজ শিখলে টাকা

কিছু পাবে। আর আমরা নতুন কারখানা করছি। সেখানেও কিছু মেয়ের দরকার। সেই কাজই শেখাব তোমাকে।

প্রতিমা দেখেছে অবিনাশবাবু এই বৃদ্ধ বয়সেও খাটছেন। জীবনকে দেখেছে বাড়িতে কখন থাকে তার ঠিক নেই। টাকাও তেমন কিছু দেয় না। প্রতিমা বলে,

—সংসারে রয়েছো, বাবা আর কত খাটবেন? সংসারের ভার তোমার। নিয়মিত টাকা দিতে হবে তোমাকে। আর রাতবিরেতে হুটহাট বের হয়ে যাবে এও চলবে না।

প্রতিমা নিজের দাবি এবার কায়েম করতে চায়। জীবন বেশ কিছু টাকা দিয়ে বলে,

—টাকা দিচ্ছি, আরও দোব, কিন্তু সব সময় বাড়িতে বসে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কাজ তো করতে হবে।

অবিনাশও এখন দেখছে প্রতিমাই তাকে টাকা দিয়ে বলে,

—এটা রাখুন বাবা সংসারের খরচ তো বাড়ছে।

অবিনাশ বুঝেছে প্রতিমাই জীবনের কাছ থেকে চাপ দিয়ে টাকা বের করেছে।

কমলা এখন অনেকটা শান্ত হয়েছে। বয়স হয়েছে। সেই তেজ, দাপট আর নেই। কিছুটা চুপসে গেছে। প্রতিমাই ওর হাত থেকে কাজ কেড়ে নিয়ে বলে,

—আপনি বসুন মা। আমিই করছি।

কমলা স্বামীর রোজগার তেমন দেখেনি। এখন প্রতিমাই মাসে মাসে কমলার জন্য শাড়ি অন্য জিনিসপত্র আনে।

কমলাও খুশি হয়। তবে বাইরে বলে,

—জীবনকে একটু বুঝেসুঝে চলতে বলো মা। এখন আর আগের মত চললে তো বিপদ হবে। ঘরসংসার করেছে। তুমি বলো ওকে। এ যেন প্রতিমারই অক্ষমতা। প্রতিমা জীবনকে এত বলেও বদলাতে পারেনি। সেদিন রতনদের একটা মিছিলে বোমা পড়ে। এখন মোহনলালের দল ওদের ওপর আক্রমণই শুরু করেছে। আর পুলিশও এই সময় উধাও হয়ে যায়। আসে ঘটনা ঘটে যাবার পরে।

তাই ভয় হয় অবিনাশবাবুরও। সেও বলে প্রতিমাকে,

—ওকে বুঝিয়ে বলো মা। এখন ওর দায়দায়িত্ব বেড়েছে।

প্রতিমা এত বলেও পারেনি। জীবন সেই রাতেও বের হয়—আর ওইভাবে পালিয়ে এসে বাড়িতে ঢোকে, তখন অনেক রাত। প্রতিমা জেগে ছিল, জীবনের চোখে-মুখে তখন উৎকণ্ঠার ছায়া।

ওদিকে অবিনাশবাবুও তখন জেগেছিলেন। রাত্রে এখন আর তার ঘুম হয় না। নানা চিন্তা এসে ভিড় করে।

প্রতিমা শুধায়,

—কী হলো? কোথা থেকে ফিরলে এমন হন্তদন্ত হয়ে?

জীবন পোশাক বদলাতে বদলাতে বলে,

—চুপ করো তো!

ওর ধমকে থমকে যায় প্রতিমা। দেখছে ওই অন্ধকারের জীবনকে নিশ্চয়ই

কোথাও কোনো অঘটন ঘটিয়ে এসেছে। অবিনাশের ভয় হয়।

উইলসন এখন রিটায়ার করে এতদিনের এই বাংলো ছেড়ে চলে এসেছে তার সেই নতুন আশ্রয়ে। একটা সাইকেলও রেখেছে। ওইটা নিয়েই ওদিকে সে নতুন কারখানার সাইটে যায়। কারখানার শেড-এর কাজ শুরু হয়েছে।

ওদিকে উইলসন নিজেই কলকাতায় যায় বিজনকে নিয়ে। বিজন কলকাতায় তার প্রকাশকদের ওখানে প্রায়ই যায়। উইলসন গেছে ওখানে তার কারখানার মেসিনারির জন্য। নানা জায়গা ঘুরে যন্ত্রপাতি কিনে এনে এখানেই সে সব পার্টস অ্যাসেম্বল করছে। এতে যন্ত্রপাতি হবে উন্নত মানের। তাতে প্রোডাকশনও ভালো হবে।

ওদিকে ফায়ার ক্লে মহলের কাজও চালু হয়েছে। সীমাও আসে, বনানীকে নিয়ে কাজ দেখতে। বিজনও অজান্তে এদের কাজের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। সীমা বলে বিজনকে,

—তোমার ভরসাতেই কাজে নেমেছি তুমি থাকবে না তা কি হয়?

বিজন বলে,

—আমার কারখানার চাকরি তারপর লেখাপড়ার কাজ এসব করে কতটুকু সময় পাব বলতে পারো?

সীমা বলে—ঠিকই সময় পাবে। না হয় আমার জন্য কিছুটা সময় নষ্টই করলে?

বিজন চুপ করে যায়। সীমার জন্য এখন বিজনও ভাবছে।

নিতাইবাবু এখন রাজনীতি ছেড়ে দিয়েছেন, বলেন—

—দেশ স্বাধীন করার জন্য রাজনীতি করতাম। এখন দেশ তো স্বাধীন হয়েছে। এবার আমাদের পরের যারা তারাই যা করার করুক। আর ওসবে নেই।

নিতাইবাবু এখন পড়াশোনার মধ্যেই নিজেকে নিমগ্ন করেছেন। তবু তাঁর কথায় একটা বেদনার সুরই ফুটে ওঠে। তিনি বিজনকে বলেন,

—এরপর কী হবে জানি না। দেশের রাজনীতি এখন বাইরের ইঙ্গিতে চলছে। এটা সর্বনাশের লক্ষণ হে। এ তো পরাধীনতার চেয়েও ভয়ঙ্কর অবস্থা। বিজনও দেখছে সেটা।

দেশের উন্নতি করতে হবে, দেশকে নতুন করে গড়তে হবে। তার জন্য চাই কলকারখানা, পথঘাট। নানা উন্নয়নের কাজ—তার জন্য টাকার দরকার। আর স্বাধীন একটা উন্নতিশীল দেশকে টাকা দেবার জন্য এগিয়ে আসে বিশ্বব্যাঙ্ক। আমেরিকা, তারাও টাকা ঢেলে দেয়। আমাদের দেশে ঢোকে সেই টাকা যার কিছুটা প্রকৃত উন্নয়নের কাজে লাগে। আর বেশ কিছুটা কোন দিকে চলে যায় তার খবরও কেউ রাখে না। দেশের দেনার দায় বাড়তে থাকে বিশ্বব্যাঙ্ক আর আমেরিকার কাছে। দেশের এক সরকার দুহাতে ঋণ নিয়ে দায়ভার বর্তায় পরের সরকারের ঘাড়ে, দেশের মানুষের ঘাড়ে।

তারপর শুরু হয় সেই ঋণ নেবার পর নানা চাপ। আমাদের দেশে এখন সারের খুব দরকার। ভারতের কয়েকটা সরকার পরিচালিত সারকারখানায় কিছুদিন

প্রোডাকশনের পরই কারখানাকে আধুনিক করার দরকার হয়ে ওঠে—প্রোডাকশন বাড়াবার জন্যই এমন সময় বাইরের থেকে চাপ এল যে তাদের পাঠানো জাহাজ জাহাজ সার নিতে হবে। নইলে ফল ভালো হবে না।

কর্তৃপক্ষ এসব কথা প্রকাশ না-করে বাধ্য হয়ে ব্যাপারটাকে মেনে নিয়ে জাহাজ ভর্তি সার নিতে শুরু করল। বাধ্য হয়েই নিতে হলো।

অনেক কোম্পানি এখানে সার জোগান দেবার জন্য কনট্রাক্ট দিয়ে গেল বাইরে। তার বেশ কিছু মাল এলোই না। টাকাই গেল তবু ওইভাবে সার কেনা চলতে শুরু হল। দিশি সারের জায়গায় এসে নাক গলালো বিদেশি সার।

ক্রমশ দেশের সার কারখানায় দিকে নজর দেওয়াও বন্ধ হলো। শিয়ালডাঙার ফার্টিলাইজার কোম্পানির আকাশে একটুকরো কালো মেঘ ফুটে উঠল। তবু কর্মচারীরা কাজ করছে সেই পুরোনো মেসিন নিয়েই। তাদের নতুন মেসিনপত্র দেওয়া আর হল না। তবু এরা চেষ্টা চালালো। কিন্তু প্রোডাকশনের খরচা বেড়েই চললো।

কারখানার অন্যতম নেতা মোহনলালও তখন মিটিং করে চলেছে স্টাফদের মহার্ঘভাতা বাড়াতে হবে। এই নিয়ে প্রায়ই টাউনশিপে মিছিল হচ্ছে। জেনারেল ম্যানেজারকে ঘেরাও করা হল। ভদ্রলোক নিজের চেম্বারে রাতভর ঘেরাও হয়ে রইলেন—শ্রমিকরা উল্লাসে জয়ধ্বনি করে, মোহনলাল বীরের সম্মান পায়। কর্তৃপক্ষ নাকি তিন পার্সেন্ট ভাতা বাড়াবার কথা বলেছেন।

মোহনলালের দল এবার মাইনের দিন, ইউনিয়নের স্পেশাল লড়াকু ফান্ডের জন্য মোটা টাকাই চাঁদা তুলে ফেললো।

লোহা কারখানায় এখনও রতনের ইউনিয়ন রয়েছে। জীবন এখন সেখানের অন্যতম নেতা। মোহনলাল এখানেও সেই পাইয়ে দেবার রাজনীতি করে। কিন্তু কোম্পানির অবস্থা ভালো নয়।

নতুন ব্লাস্ট ফার্নেস আর হয়নি। প্রতিযোগিতার বাজারে কমদামে আর মাল দিতে পারছে না কোম্পানি। তাদের কারখানা এতদিন লাভের মুখ দেখেছিল কিন্তু এবার লোকসান শুরু হয়েছে। এখানের কিছু শ্রমিকদের রতনরা সেই কথাটা বোঝাতে পারে। তারা বলে,

—বেশি চাপ দিলে সরকারই টাকা দেবে না, উল্টে প্রতিষ্ঠানই বন্ধ করে দেবে। তাই কোনো দাবি করা আইনসঙ্গত হবে না। এরা তাই সেদিন প্রতিবাদ মিছিল করে। চারিদিকে একটা মন্দার ভাব এসেছে। ওদিকে হাওড়ার এত কারখানা চলছিল সেখানে লোহা ঢালাই-এর নানা কাজ হতো। সেইসব কারখানা কয়েক বছরের মধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে আর সেই স্ক্র্যাপও যায় না। এখন অত্যাধুনিক কারখানা ছাড়া প্রোডাকশন করে লাভ করা যাবে না। তাই রতনদের দাবি কারখানাকে আধুনিক করতে হবে। কর্তৃপক্ষ এবার এদের এই দাবিতে বিচলিত হয়। তারা দু'দশ টাকা ভাতা বাড়াতে পারে কিন্তু কোটি টাকা খরচ করে কারখানা আধুনিকীকরণ চায় না। সেটা নাকি তাদের নীতিবিরুদ্ধ কাজ হবে। শ্রমিকরা এসব প্রশ্ন তুললে তার কোনো সদুত্তরও দেওয়া যাবে না। তাই এসব আন্দোলন তারা পছন্দ করে না।

মোহনলাল তাই মহার্ঘ ভাতার লড়াই নিয়েই পথে নেমেছে আর তাদের বাধা দেয় ওই রতনের দল।

তাই মিটিং মিছিলে ওদের প্রায়ই গোলমাল বাড়তে থাকে। মোহনলালের কাছেও খবর যায় যে রতন-জীবনরাও দল বড় করে তাদের মিছিলে বাধা দিচ্ছে। মোহনলাল গর্জে ওঠে।

—দেখছি ওদের।

সেদিন বনানী আর প্রতিমা ফিরছে সমবায় অফিস থেকে। এখন বনানীর কাছের মানুষ হয়েছে প্রতিমা। হঠাৎ বাসায় ঢুকে মোহনলালকে দেখে চাইল বনানী। মোহনলাল দেখছে প্রতিমাকে—বলে,—আরে প্রতিমা শুনলাম বিয়ে-থা করে সংসারী হয়েছো তা এখানে এই বনানীদের কাছে কেন?

প্রতিমা দেখছে মোহনলালকে। এখন তার দেহে আরও কিছুটা মেদ জমেছে, দামি গাড়িতে চড়ে, বনানী দেখেছে ও আগে বিড়ি খেতো এখন দামি বিলেতি সিগারেট খায়।

প্রতিমা বলে,

—বনানীদের সমবায়ে কাজ করছি।

হেসে ওঠে মোহনলাল, সুর করে বলে,

—ছুঁচোর চাকর চামচিকে,

ওই সমবায়ে কি পাও? এমন আরামের চাকরিটার জন্য আর গেলেও না।

প্রতিমা বলে,

—এখন দেখছি না গিয়ে ভালোই করেছি।

বনানী ওর তেজদৃপ্ত কণ্ঠস্বর শুনে খুশিই হয়। মোহনলাল অবাক হয়।

—কেন? কেন?

প্রতিমা বলে—এটা ছুঁচোর চাকরি নিশ্চয়ই নয়—আপনার কাছে চাকরি নিলে সেটা যে ছুঁচোর অধমের চাকরি নেওয়া হতো—সেইটাই বুঝেছি এতদিনে।

মোহনলাল এবার ওই জবাবে ফুঁসে ওঠে,

—কী বললে? আমি ছুঁচোর অধম।

বনানী শুনছিল ওদের কথা। এবার বনানী মোহনলালকে বলে,

—এখানে কি ঝগড়া করার জন্য এসেছো? আমার সমবায়ের ক্ষতি করার চেষ্টা করেছো তাতেও খুশি হওনি। এবার কি আমাদের বাড়িতে শাসাতে এসেছো।

মোহনলাল চেনে বনানীকে। সে বলে,

—ওর কথা শুনলে?

বনানী বলে,—অন্যায় কিছু বলেনি ও, তুমি অনেক মেয়ের সর্বনাশ করেছ, অনেক শ্রমিকের রক্ত চুষেছো, আজও চুষছো তোমার হাতে অনেক খুনের রক্ত লেগে আছে, সেটা আর কেউ না জানুক আমি জানি।

—বনানী! মোহন ওকে থামাবার চেষ্টাই করে।

আজ এসেছিল মোহনলাল বনানীর কাছে। তাদের দলের মহিলা মহলে যোগ

দেবার জন্য বলতে। আপস করতেই এসেছিল। কিন্তু তা আর হল না। সেসব প্ল্যান মোহনই ভুল করে ভেস্তে দিয়েছে ওই মেয়েটাকে দেখে। মেয়েটার কথাগুলোও তার ভালো লাগেনি।

জীবনের বউ জীবনের মতই শয়তান আর বনানী তাদেরই প্রশ্রয় দেয় এটা বুঝেই বের হয়ে গেল মোহন।

বনানীও বলে,

—তোমার এখানে আসার আর কোনো দরকার নেই।

মোহন বলে,

—তা কেন থাকবে? এখন রতনকেই দরকার, না? আমি এখন নো বডি, ঠিক আছে।

মোহন চলে যায়।

বনানী গর্জায়—ইতর, জানোয়ার।

প্রতিমা বলে এখন ওর হাতেই এখানের সব ভার বনানীদি। ওকে চটিয়ে ঠিক কাজ করিনি। কিন্তু থাকতে পারলাম না। ওইসব কথা বলে ফেললাম।

বনানী বলে,

—ওই অন্যায়কে মেনে না নিয়ে ঠিক কাজই করেছিস প্রতিমা।

স্ল্যাগের চাহিদা নেই। এখন কোম্পানির অবস্থাও ভালো নয়, এবার অফিসার্স ক্লাবেও মিঃ মিত্র, মিঃ রায়, মিঃ প্রধানের দল বুঝতে পারছেন যে কারখানা প্রচুর লোকসান দেবে। কারণ লোহা কিনে এনে গালাই করে কাস্টিং, কাটিং, মোল্ডিং—এসব করার খরচ জুড়ে মালের যা দাম পড়বে এখন বাজারে প্রচুর মাল এর চেয়ে কম দামে বিক্রি হচ্ছে। যার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া যাচ্ছে না।

ফলে প্রোডাকশন কমাতে হচ্ছে আর খরচ বরং বেড়েই চলেছে।

তারপর রয়েছে এই শ্রমিক আন্দোলন, এতকাল শ্রমিকরা লিখিত দাবিদাওয়া দিত—মিটিং করতো।

কদিন আগেই, মহার্ঘ ভাতা বাড়ানোর দাবিতে মোহনলালের নেতৃত্বে বিশাল শ্রমিক বাহিনী কারখানার কাজ বন্ধ করে দিয়ে অন্য দলের শ্রমিক যারা কাজ করছিল তাদের কয়েকজনকে প্রচণ্ড প্রহার করে হাসপাতালে পাঠালো।

কারখানার ভিতর কর্মরত অবস্থায় শ্রমিকদের মারার ব্যাপারে পুলিশকে জানাতে সেই জনতা এবার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং-এ হানা দিয়ে দরজা জানলার কাচ আসবাবপত্র ভেঙে ফোনের লাইন কেটে দিয়ে খোদ মিঃ আগরওয়ালকে ঘেরাও করে তাকে গালাগাল করলো। শাসালো। কোনো প্রতিকারই তার হয়নি। পুলিশ কাউকে অ্যারেস্ট করেনি। তারা বুক ফুলিয়ে টাউনশিপে ঘুরছে। মোহনলালের অনুগত তেলিয়া-বিষ্টুর দলই এসবের নারদ। সকলেই দেখছে তাদের। কিন্তু পুলিশ দেখতে পাচ্ছে না তাই অ্যারেস্টও করেনি তাদের।

সেদিন মিত্র সাহেবের গাড়ি থামিয়ে তেলিয়া বলে,

—বেশি বাড়াবাড়ি করবেন তো, বউ বিধবা হয়ে যাবে। কারখানায় তাদের

কাজেও মন নেই। অথচ মাইনে ঠিকমতো নিয়ে যাচ্ছে। সেদিন কিছু জরুরি অর্ডার ছিল, মিঃ প্রধান তার চার্জম্যানকে বলেন,

—কাজটা তাড়াতাড়ি করে ফেলুন। পরশু পাঠাতে হবে।

চার্জম্যান বলে—স্যার ওরা ওভারটাইম চায়।

—মানে? দুদিনের কাজ। এত লোক রয়েছে তারা কী করে?

চার্জম্যান বলে—স্যার, ওরা বলে—আসি যাই মাইনে পাই। কাজ করলে ওভারটাইম চাই।

অবাক হন মিঃ প্রধান। সেই কাজ পাঁচ-ছ'দিনে কোনো মতে শেষ করেন তাঁরা।

তাই সাহেবরা এবার বিপদে পড়েছে।

বোর্ড তাদের কৈফিয়ত তলব করেছে। লোকসানের জন্য তাদেরই চার্জশিট করবে। মিঃ রায় বলে,

—চেষ্টা করছি এখানের কাজ ছেড়ে অন্য কোনো কাজ পেলে চলেই যাব না হলে কোনোদিন মারই খেতে না হয়।

মিঃ মিত্র বলে,

—চারিদিকে খবর পাচ্ছি বহু কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। অনেক মালিক এখান থেকে চলে যাচ্ছে অন্যত্র।

কিন্তু মোহনলালের এসব ভাবার সময় নেই। সে এখন এই জগতের সম্রাট।

কোলিয়ারির অবস্থাও এখন খারাপ হয়ে আসছে। আনন্দবাবুর ওখানে আসে বিজন। কোলিয়ারি নিয়ে লেখার সময় বিজন ওর সঙ্গে পরিচিত হয় নিতাইবাবুর মারফত। তরুণ ওই হাসিখুশি আনন্দকে তার ভাল লাগে। তারপর থেকে পরিচয়টা নিবিড় হয়েছে। বিজন কোলিয়ারির এই পালাবদল নিয়েও লিখেছে। দেখেছে সেই মালিকদের অবস্থা। আনন্দর এখন শহরে রেস্তোরাঁ চলেছে। সে কোলিয়ারি জগতের খবরও অনেক রাখে কারণ তার হোটেলে এখন কোলিয়ারির কয়লা পারমিট নেবার জন্য বাইরে থেকে অনেকে এসে থাকে।

কোলিয়ারি থেকে বিনা পারমিটে কোনো কয়লা বের হবে না, তারা চালানও দেবে। সেই চালান দেখিয়ে ট্রাক বোঝাই কয়লা ভারতের বহু জায়গায় পাঠানো হয়। এখন পারমিট কেনাবেচা হয়। কার্তিকবাবুদের মতো লোক যাদের পিছনে মোহনলালদের মতো মাতব্বররা আছে প্রতি কোলিয়ারিতে তাদের অলিখিত কোটা আছে। সেই পারমিটের কাগজগুলো এনে এই মহাজনদের হাতে তুলে দেয় কার্তিকবাবুদের লোক—কাগজ বেচেই হাজার হাজার টাকা আমদানি হয় তাদের।

এছাড়াও আছে জাল পারমিট, সব কাগজপত্র দেখতে আসল কাগজের মতোই—সেসব দেখিয়ে চলে যায় লক্ষলক্ষ টাকার মাল। জাল পারমিটের সব টাকাই চলে যায় কোলিয়ারির বাবু থেকে উপরওয়ালার পকেটে সুনির্দিষ্টভাবে।

এছাড়াও আছে রাতের অন্ধকারে কয়লা তোলা। বিজন শুনেছে আনন্দের কাছে ওসব কাহিনি। ব্রিটিশ মালিকরাও এত বিলাস-বৈভব পায়নি এদের মতো।

আনন্দ বলে—যার ধন তার ধন নয়,—নেপোয় মারে দই। বুঝলে বিজন ভায়া।

সমাজে কয়লা চুরির পাচারের একটা নতুন শ্রেণী গড়ে উঠেছে।

বিজন এসবের কিছুটা জানে। ওই জীবনের দলও এখন স্ল্যাগের কারবার ছেড়ে কয়লা তোলার কাজে লেগেছে। কোল কোম্পানির লোকজনই খবর দেয় ওদিকে আজ পাহারা থাকবে না। ওরাও জানে কয়লার স্তর কোনখানে মাটির নীচেই। ওরাও রাতের অন্ধকারে অতর্কিতে সেখানে যায় দলবল ট্রাক নিয়ে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই লাখখানেক টাকার কয়লা পাচার দেয়। সেসব কয়লা ওই জাল পারমিটের সাহায্য রাতারাতি চলে যায় বাইরে। ওরাও মোটা টাকা পায়।

মোহনলাল জানে এসব। কে কোথায় অন্ধকারে এসব করছে সে খবরও আসে তার কাছে, আর প্রণামীও পায়। অন্য সব দলই দেয় প্রণামী। কিন্তু রতনের দল দেয় না। এবার তেলিয়া বলে,

—ওর বাপ দেবে বস। দিই একদিন চোরের ওপর বাটপাড়ি করে। তাহলেই বাপ বাপ বলে দেবে।

মোহন বলে—যদি গোলমাল করে।

তেলিয়া, বিশু জানে তাদের পিছনে কে আছে। তাই বলে,

—তাহলে ফিনিশই করে দোব।

মোহনলালও তাই চায়। ও জানে ওদের শেষ করতে পারলে তাকে বাধা দেবার মতো আর কেউই থাকবে না। নিতাইবাবুও এখন বসে গেছেন।

রতনরাই রয়েছে ওর পথে বাধা হয়ে, পথের বাধা সরাতে পারলে ভালোই হবে তার।

মোহন বলে—কোন গোলমাল হবে না তো?

বিশু বলে—তুমি ফিকির কোরো না বস।

সেদিন রাতে বৃষ্টি নেমেছে। শীতের রাত—এখানে হাড়কাঁপানো শীত পড়ে। সন্ধ্যার পার থেকেই বাবুপাড়া কেন সারা টাউনশিপ ফাঁকা হয়ে যায়। তাতে বৃষ্টির রাত। অবিনাশবাবুও দোকান বন্ধ করে ফিরেছেন। প্রতিমা এখন মা হতে চলেছে। তাদের বাড়িতে আসছে নতুন অতিথি।

কমলা বলে,

—বৌমা এখন তোমার সমবায়ের কাজ একটু কম করো। যখন তখন বাড়ি থেকে বের হয়ো না। আর জীবনকেও বলো সেও রাত-বিরেতে বেরোনো বন্ধ করুক।

জীবন বলে—এখন তো কমই বের হই মা।

জীবনও ভেবেছে কথাটা। এবার তার দায়িত্বও বেড়েছে। টাকা সে মন্দ রোজগার করেনি। এবার দেখছে মোহনলালের দল তাদের বিপদে ফেলতে চায়। যে পুলিশ এতদিন তাদের কথামতো চলত এখন তারাই কেমন যেন চোখ উলটে দিয়েছে। থানা অফিসারকে এরাও প্রণামী দেয়। তবু থানা অফিসার বলে,

—জীবনবাবু, আমাদের উপর চাপ আসছে আপনাদের তুলে দিতে হবে হাজতে নানা কেস দিয়ে। এবার চুপচাপ থাকুন। রতনদাকে তো এর মধ্যে মোহনলাল দুটো কেসে জড়িয়েছে। তাকেও জড়াবে।

জীবন তাই ভাবছে এবার দোকানেই বসবে। এর মধ্যে দুচারবার দোকানেও বসেছে, অবিনাশবাবুও খুশি হন। বলেন,

—তুই বসলে আরও মালের এজেন্সি নেব। কেনাবেচাও বাড়বে।

জীবনকে তবু আজ বের হতে হবে। কারণ আগে থেকেই এসব মালের অর্ডার নেওয়া ছিল। পার্টিও এসে গেছে। কয়েক শ' টন কয়লা পাচার করতে হবে আজই। কোলিয়ারির লোকদেরও বলা আছে তারা ওদিকে যাবে না। ওদের লোকজন চলে যাবে—ঘণ্টা পাঁচেকের মধ্যে হাজার পঁচিশ টাকা এসে যাবে।

প্রতিমা বলে—আবার এই বৃষ্টিতে বের হবে?

জীবন বলে—দেরি হবে না। নিশ্চিন্তেই ফিরে আসব।

অবিনাশবাবু খুশি নন, কমলাও। জীবন বলে,

—জরুরি কাজ সেরেই ফিরব।

অবিনাশবাবু বলে—ওসব কাজ এবার বন্ধ কর।

জীবন বলে—তাই করব বাবা। আর বের হব না। আগেকার কাজগুলো সেরেই আর বের হব না। বের হয়ে যার জীবন, রেনকোটটা মুড়ি দিয়ে জিপ নিয়ে। পিছনে বসে তার তিন চার জন চ্যালা।

পলাশবনের মধ্যে এই বৃষ্টির মধ্যেই ওরা কয়লা তুলছে, জীবন ওদিকে মালকাটাদের তাড়া দেয়।

—জলদি করো। জলদি—

ওরাও তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করতে চায়। কিন্তু বৃষ্টির জন্য ঠিকমতো কাজও করতে অসুবিধা হচ্ছে। তবু কয়লার ট্রাকগুলো লোড হয়ে গেছে।

এবার বিশু তেলিয়ার দল অন্ধকারের মধ্যে এসে ঘিরে ধরে ওদের। গর্জে ওঠে তেলিয়া।

—খবরদার কোনো মালই যাবে না। রুখে দে সব ট্রাক।

জীবন ভাবতে পারেনি যে এইভাবে তেলিয়ার দল তাদের সব মাল আটকে দেবে। তেলিয়াদের দেখে জীবনের কয়েকজন চ্যালাও চাইল। তাদের এত টাকার মাল এরা ছাড়তে রাজি নয়। ওরা গর্জে ওঠে,

—এক পা এগোবি না তেলিয়া। খতরা হয়ে যাবে।

এর মধ্যে বিশু আরও দুজন ট্রাকের ড্রাইভারদের টেনে নামায়। নিজেরাই উঠতে যাবে। তারা এদের আটকে রেখে নিজেরাই ওদের ট্রাকে এত মাল নিয়ে কেটে পড়তে চায়। কিন্তু জীবনের চ্যালা নন্দ এবার গুলিই করে বসে বিশুর দিকে। বিশে ওরা মাল সহজে ছাড়বে না। তাই ওরাও তৈরি ছিল। এবার শুরু হয় ওদের দুদলের মধ্যে গুলির লড়াই। মাল কাটারদল প্রাণের ভয়ে দৌড়েছে। পড়ে আছে দুটো ট্রাক কয়লা সমেত। এবার পাথরের আড়াল থেকে ওদের লড়াই চলছে। জীবনও গুলি করেছে। যেভাবে হোক আড়াল থেকে হটিয়ে দিয়ে ট্রাক নিয়ে বের হতে হবে। তেলিয়াও আজ এসেছে তৈরি হয়ে, ওদের দলও লড়ছে। রাতের অন্ধকারে গুলির শব্দ ওঠে। এসব এলাকায় এমন লড়াই প্রায়ই হয়।

জীবনও বুঝেছে তাকে যেভাবে হোক এই লড়াই-এ জিততেই হবে। না-হলে

এসব লাইন থেকে সরে যেতে হবে মাথা নীচু করে। তাই সেও মরিয়া হয়ে লড়ছে। গুলিগুলো পাথরে লেগে ছিটকে যায়। ওদিকে কার আর্তনাদ শোনা যায়। জীবনের সাহস বেড়ে গেছে এবার সে একপাথরের আড়াল থেকে অন্যপাথরের আড়ালে গিয়ে গুলি করে তেলিয়াকে। বের হয়ে চলেছে সেই কাছের পাথরটার দিকে। হঠাৎ গুলিটা এসে লাগে জীবনের বুকে, গুলির ধাক্কায় ছিটকে পড়ে সে।

তার দলবলও এবার জীবনকে পড়ে যেতে দেখে পিছন দিয়েই অন্ধকারের মধ্যে বনতুলসীর ঘন ঝোপের মধ্যে পালায়। মোহনলাল অবশ্য তেলিয়াদের বলে রেখেছিল জীবনকে শেষ করতে হবে। তারপর দলের সবকটাকে তাড়িয়ে খবর দেয়। তারপর যা করার করবে মোহনলাল। তার আসল উদ্দেশ্য ছিল রতনের ডান হাত জীবনকে শেষ করে পথ পরিষ্কার করা। আজ কয়লা চুরি করতে তার দলকে পাঠায়নি সে। পাঠিয়েছিল জীবনকে খুন করতে।

তার দলের তেলিয়ারা তাই জীবনকে পড়ে যেতে দেখে খুশিই হয়। সবাই পালিয়েছে, পড়ে আছে জীবনের রক্তাক্ত দেহটা। ওরা এসে মোহনলালকে খবর দেয়।

তারপর পুলিশ যায় ওই ঘটনাস্থলে। দেখা যায় কয়লা ভর্তি দুটো ট্রাক পড়ে আছে, আর পড়ে আছে জীবনের প্রাণহীন দেহটা। পুলিশ অবশ্য তৎক্ষণাৎ জানিয়ে দেয় সদরে, যে কয়লা চুরি দলের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষে মারা গেছে সেই কয়লা চোরের দলের নেতা জীবন, অন্যরা পালিয়েছে।

পরদিন কাগজে ওঠে পুলিশের কৃতিত্বের কথা।

অবিনাশবাবু সকালে দোকানে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছে। তখনও জীবন ফেরেনি। আকাশে তখনও মেঘগুলো আছে, সূর্যের দেখা নেই। প্রতিমা সকালে ওঠে চা করে দেয় অবিনাশবাবুকে। কমলা ওঠে বেলাতে, ইদানীং তার শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। প্রতিমা মা হতে চলেছে। অবিনাশবাবু শুধোন।

— জীবন ফেরেনি এখনও।

—না, প্রতিমা জানায়।

অবিনাশবাবু বলে,—এবার ওকে বলো রাতবিরেতের কারবার ছেড়ে দিক। দোকানে বসুক, আমারও শরীরে আর কুলোচ্ছে না। সেই বললে দোকান দেখবে। কি যে করে।

হঠাৎ কড়া নাড়ার শব্দে চাইল অবিনাশ। চায়ের কাপ ফেলে বাইরে এসে দেখে পুলিশের জিপ দাঁড়িয়ে আছে। একজন পুলিশ অফিসার বলেন—থানায় চলুন।

—কেন? অবিনাশ নিরীহ ধরনের লোক। থানা পুলিশকে এড়িয়ে চলে। সে বলে—কী হয়েছে স্যার।

—থানায় গেলেই জানতে পারবেন। চলুন।

এতকাল এখানে আছে, থানাটাকে অবিনাশ বাইরে থেকেই দেখেছে। ভিতরে কোনোদিন আসেনি। দেখে থানার বাইরে বেশ কিছু লোকজন, ভিতরে মোহনলালও

রয়েছে। অবিনাশকে দেখে চাইল, পুলিশ অফিসারকে বলে,

—ইনিই জীবনের বাবা,

পুলিশ অফিসার অবিনাশকে নিয়ে ভিতরে যায়। অবিনাশবাবু কিছু বুঝতে পারেন না। ওদিকে বারান্দায় একটা চাদরে কি ঢাকা আছে। চাদরটাতে রক্তের দাগ। সেই চাদরটাকে সরিয়ে নিতে চমকে উঠে অবিনাশ। আর্তকণ্ঠে বলে ওঠে—জীবন!

জীবন আর কোনো উত্তরই দেয় না। আর কোনোদিন কথা বলবে না সে। তাকে চিরকালের জন্য স্তব্ধ করে দিয়েছে ওরা। ওর রক্তাক্ত দেহটা পড়ে আছে বারান্দায়।

অবিনাশের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে, তেষ্টায় গলাও শুকিয়ে আসছে। দাঁড়াবার শক্তি নেই। কোনোমতে ভিতরে এসে বসল বেঞ্চে।

থানার অফিসার বলে—আপনার ছেলে যে কয়লা চোর তা জানতেন না? নিজে তো ভদ্রলোক সেজে থাকেন, ছেলে এইসব করে নিষেধ করেননি। বলার চেষ্টা করে অবিনাশ—জানতাম না। তবু বারবার রাতবিরেতে বের হতে নিষেধ করেছি, শোনেনি।

--এইবার বুঝুন। থানার অফিসার কঠিন কণ্ঠে বলে।

অবিনাশ কী করবে জানে না। আজ সে অসহায়। সংসারে এই বৃদ্ধ আর দুটি মহিলা।

খবরটা এর মধ্যে শহরে ছড়িয়ে পড়েছে। অবিনাশবাবুর ছেলে জীবনকে অনেকেই চেনে। তাকে নাকি পুলিশ কয়লা চুরির সময় গুলি করে মেরেছে। খবরটা শুনে বিজনও চমকে ওঠে। সেও জানতো জীবনের কাজ-কারবারের কথা। কিন্তু এই ভাবে হঠাৎ মারা পড়বে তা ভাবেনি। সে ছুটে আসে অসময়ে।

অবিনাশবাবু পাথরের মতো বসে আছেন। বিজন দেখছে অসহায় ওই বৃদ্ধকে।

—কাকাবাবু। বিজনকে দেখে এবার অবিনাশবাবু চাইলেন। অবিনাশ বলেন—একি সর্বনাশ হল বিজন। এখন কী হবে? তা বিজনও জানে না। জীবন তার ভুলের দায় দিয়ে গেছে নিজের জীবন দিয়ে। কিন্তু পেছনে যারা রইল তাদের কী হবে কে জানে।

তবু এখন করণীয় কাজগুলো করতে হবে। মোহনলালও এসেছে। সে খুশি হয়েছে। আজ তার পথের কাঁটা দূর হয়েছে। রতনের ডান হাত সে ভেঙে দিয়েছে। বিজনও বুঝেছে জীবন ওই মোহনলালের হিংসার বলি হয়েছে। লাশ পোস্টমর্টেম করাতে নিয়ে গেল। সেখান থেকে লাশ নিতে হবে। এখন যাবতীয় সবকিছু করতে হবে বিজনকেই। সে তার কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে শহরে ছুটলো জীবনের শেষকৃত্যের ব্যবস্থা করতে।

প্রতিমা চমকে ওঠে। কমলা চিৎকার করে ওঠে। অবিনাশ স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। এর মধ্যে রতনও এসেছে। অবিনাশবাবু দেখছেন ওকে। গতরাতের সব ঘটনাই

শুনেছে। বেশ বুঝেছে যে এইসব ওই মোহনলালের দলেরই কাজ কিন্তু পুলিশ এখন তার হাতে। পুলিশও নিজেদের কৃতিত্ব জাহির করার এই সুযোগ ছাড়েনি, ফলে মোহনলালের কেউ ধরা পড়বে না। জীবনের খুনীদের বিচারও হবে না।

প্রতিমার চোখে জল নামে। প্রতিমার মা-ভাইরা এসেছে। আজ ওর বাবা বলে,

—তখনই মানা করেছিলেম। গুণ্ডা-মস্তানের সাথে বিয়া দিও না। শুনলা না। এহন,

প্রতিমার মা জানে জীবন ভালো টাকা রেখে গেছে। রতনবাবুও কিছু টাকা দেবে বলেছে। তাই ওর মা বলে,

—প্রতিমা। ঢের হয়েছে, চল আমাগোর ঘর সেখানে থাকবি।

প্রতিমা চেনে ওর মা-ভাইদের। ওরা জীবনের কাছে নিয়েছে অনেক আর টাকার জন্যই জেনেবুঝে এখানে বিয়ে দিয়ে ছিল। আজও তার টাকার জন্যই ওখানে নিয়ে যেতে চায়।

কিন্তু প্রতিমা জানে অবিনাশবাবুকে, বৃদ্ধ তাকে নিজের মেয়ের মতো দেখে এসেছে। কমলাও বদলে গেছে। এখন সেও অসহায়। আজ তার একমাত্র সন্তান নিজের ভুলে হারিয়ে গেল।

প্রতিমার মায়া পড়ে গেছে এদের উপর। এখন দুই বৃদ্ধ-বৃদ্ধার দায়দায়িত্ব তার উপরই পড়েছে। প্রতিমা বলে,

—না মা। আমি এখানেই থাকব এদের ফেলে যাব না।

ওর মা বিরক্ত হয়, বলে—মরণ দশা। ঘাটের বুড়োবুড়ি দুটোর লই থাকবি।

—হ্যাঁ, তোমরা যাও। আমার কষ্ট আমাকেই সইতে হবে। বিজনও দেখছে প্রতিমাকে। আজ বিপদের মধ্যে প্রতিমাই এসব কিছু মেনে নিয়েছে। ওই বুড়োবুড়ির পাশে দাঁড়িয়েছে তাদের সাহস দিয়েছে। জীবনের শেষ কাজ করে বিজনই। অবিনাশবাবু ভেঙে পড়ছেন। ছেলের উপর কোনোদিন নির্ভর করেননি তিনি। তবু হাজার থেকে সন্তান। তাই তাকে হারাবার বেদনাটা তাঁকে যেন মুষড়ে দিয়েছে।

খবরটা অবশ্য চাপা থাকেনি, রতনের চ্যালাদের মুখে মুখে খবরটা ছড়িয়ে পড়েছে। জীবন পুলিশের গুলিতে নয় মোহনলালের দলের ছেলেদের গুলিতেই মারা গেছে।

প্রতিমা হাসপাতালে। তার ছেলে হয়েছে। অবিনাশবাবুও এসেছেন হাসপাতাল স্ত্রীকে নিয়ে। এসেছে বনানীও—বনানী জানে প্রতিমার কথা। জীবনকে মেরেছে ওই মোহনলালই। কিন্তু সে এখন ধরাছোঁয়ার বাইরে। ওদের সব অত্যাচার মুখ বুজে সহ্যই করতে হবে। আগামী দিনের আশায়।

কমলা তার নাতিকে দেখছে। তার মনে পড়ে বহু বছর আগে জীবনের কথা। ঠিক যেন এমনিই ছিল দেখতে। এমনি নাক-মুখ, জীবন যেন ফিরে এসেছে ওই শিশুর রূপ ধরেই। আজ ওই একটি শিশু যেন এদের জীবনের সব শূন্যতাকে পূর্ণ করে দিয়েছে।

মানুষ অনেক কিছু হারায়—তবু কিছু পাবার আশায় অতীতের সব হারাবার

শোক ভুলে নতুন করে বাঁচার তাগিদে পথের সন্ধান করে। এই কঠিন সওয়াটাকে যেন বিগত জীবনকে ভুলে এবার ওরা নতুন জীবনের সন্ধান করছেন। এই বৃদ্ধ বয়সে, অবিনাশ আবার লড়াই শুরু করেছেন। প্রতিমাও থেমে নেই।

জীবনের গতি থামে না। কোন অবধি কাল থেকে পৃথিবীও জীবকোষের সৃষ্টি হয়েছিল তা আজও অজানা রয়ে গেছে। তাই জীবনপ্রবাহ কবে শুরু হয়েছিল তাও অজানা কিন্তু তার গতি আজও অব্যাহত রয়েছে দিকে দিকে।

প্রতিমাও আবার কাজ শুরু করেছে বনানীর কো অপারেটিভ। এখন উইলসনের ক'মাসের অক্লান্ত পরিশ্রমে সেই কারখানা তৈরি হয়েছে। বেশ খানিকটা এলাকার মধ্যে শেড—ওদিকে ক্রাশিং মেসিনে ফায়ার ক্লেগুলোকে গুঁড়ো করে বড়বড় চৌবাচ্চাতে যাচ্ছে—সেখানে মাটি তুলে মাখিয়ে ওদিকে নানা দামি কাপ-ডিস-গ্লাস সৌখিন প্লেট ফুলদানি ডিনার সেট অনেক কিছু তৈরি হচ্ছে। অনেক মেয়েই এই কাজ করে। তাতে নিপুণ হাতে তুলির টানে ছবিগুলো ফুটে ওঠে।

বিজন আসে উইলসনের কাছে। উইলসন এখন যাত্রার পালা নিয়ে মেতে আছে। আর এখানের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে এখানের জীবন নিয়ে নাটক লিখেছে বিজন। উইলসন নাটক শুনে বলে—দারুণ হয়েছে। এবার এই লোক জীবনের নিয়ে কলকাতার অ্যাকাডেমিতে নাটক করতে যাব।

তাই সে এবার এখানের বাউল আদিবাসী ছেলেমেয়েদের নিয়েই রিহার্সাল দিয়ে চলেছে সন্ধ্যায়। আর দিনভর ফ্যাক্টরিতে কাজ করে।

এখন বয়স হয়েছে উইলসনের—দাড়িও রেখেছে। কাঁচাপাকা দাড়ি। প্যান্ট শার্টে আগে লাগত মেসিনের তেল, কালির দাগ। এখন লাগে সাদা মাটির আস্তরণ। পাদ্রী সাহেবের সাদা পোশাকের মতো হয়ে গেছে তার পোশাক।

বিজন বলে—এ যে পাদ্রী সাহেবের মতো লাগছে স্যার। এবার কি পাদ্রী হবে।

উইলসন হাসতে হাসতে বলে,

—জীবনে ওই গড-এর সন্ধান করিনি বিজন। মানুষের জন্য কাজ করেছি। শত দুঃখের মধ্যে আনন্দের সন্ধান করেছি। পাদ্রী হবার সাধ্য তো নেই।

বিজনের মনে হয় ও যেন মানুষের মাঝেই ঈশ্বরের সন্ধান করেছে। তাই জীবনের এত দুঃখ তাকে স্পর্শ করতে পারেনি।

এবারও ভোট হয়। কিন্তু কয়েক বছর ধরে কিন্তু মোহনলালের দল পরপর ক'বার ভোটে জিতে গদিতে এসেছে। তাই তাদের আসন পাকা করার সব ব্যবস্থাই করেছে। আর মোহনলালের মতো নেতারা নিজেদের পথও পরিষ্কার করেছে তাদের প্রতিপক্ষকে নানা ভাবে বিধ্বস্ত করে।

জীবন নেই। রতনকে পুলিশ জেরার জন্য আটকে ছিল। কিন্তু তেমন কোনো প্রমাণও পায়নি। ফলে তাদের ছেড়ে দেয়। এবার মোহনলালও ভেবেছিল, সেইই টিকিট পাবে। কিন্তু দলের মধ্যে নিশীথবাবু সৎ নিষ্ঠাবান ব্যক্তি। দীর্ঘদিন থেকে তিনি এই অঞ্চলে কোলিয়ারি এই কারখানা অঞ্চলে কাজ করছেন নিঃস্বার্থভাবে।

তিনি সব খবরই রাখেন, এখন ক'বছরের মধ্যে পৃথিবীর অর্থনীতিতে অনেক উলট-পালট ঘটেছে। পৃথিবীটা এখন অত্যাধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার ফলে অনেক

ছোট হয়ে গেছে। তারপর আমেরিকার কর্তৃত্বও বেড়েছে। তার সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে সে এবার পৃথিবীর উন্নতিশীল দেশের বাজার দখল করতে চায় টাকার জোরে। তাই শুরু হয়েছে প্রতিযোগিতা।

এদেশেও তার ছায়া পড়েছে। এর মধ্যে সার নিয়ে অনেক জল ঘোলা হয়েছে। বিদেশের সার আর এখানের কিছু ব্যক্তিগত মালিকানার সার কারখানার মালই চলছে বাজারে। সরকার যে কটা বড় বড় সার কারখানা করেছিল। পরবর্তী সরকারের নীতির ফলে সেগুলো মার খেতে শুরু করেছে। সেই সব কারখানার শ্রমিকদের দাবিই বাড়তে লাগলো। বাড়তে লাগলো প্রোডাকশন খরচাও। আধুনিকীকরণের ফলে কম খরচে সার তৈরির কামই করা হল না। ফলে দেখা যাচ্ছে কারখানা চললে লোকসান বাড়ছে আর কারখানা বন্ধ রেখে শ্রমিকদের মাইনে দিয়ে গেলে লোকসান হচ্ছে তার চেয়ে অনেক কম।

এতগুলো বছর ধরে সার কারখানার কয়েকশো কর্মচারী ওই ভাবে কারখানা গেছে আর ক্যানটিতে, অফিসে আড্ডা দিয়ে সময় করিয়ে বাড়ি ফিরেছে। মাইনেও পেয়েছে। আর ইউনিয়নের অফিসে বসেছে।

মোহনলাল অবশ্য বলে,

—আপনারা চাঁদা ঠিকমতো দিয়ে যান। দিল্লিতে আমার যাতায়াত আছে কারখানার আধুনিকীকরণ হচ্ছে। তবে আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে।

তাই মোহনলাল মাঝে মাঝে মোটা টাকাও পেয়েছে। দিল্লিতে দরবার করার নাম করে মোটা টাকাও তুলেছে। দুচারজন বলে,

—ওসব টাকার হিসাব দিতে হবে।

বিলিং সেকশনের মেয়েরা বনানীর দলের। তারাই প্রতিবাদ করে—কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। এসব খাতে টাকা কেন দেব?

মেয়েরাই বেঁকে বসে, এবার মোহনলাল বুঝেছে ওরা আন্দোলন করলে তাদের মুখোশ খুলে যাবে। ওদিকে বনানী কুসুম অন্য মেয়েরাও প্রতিবাদ মুখর হয়। একদিন রাতের অন্ধকারে কুসুমের উপরই আক্রমণ হয়। ওই সমাজ বিরোধীদের দল ওকে বাজারের মধ্যে বেইজ্জত করেও খুশি হয়নি।

বনানীর কাছে খবর যেতে বনানী সমবায় থেকে শ'খানেক মহিলা নিয়ে এবার মোহনলালের অফিস অবরোধ করে।

সার কারখানার অবস্থাও খারাপ হয়ে আসে, ক্রমশ দেখেছে কর্মচারীরা যে কর্তৃপক্ষ তাদের সম্বন্ধে কোনো চিন্তাই করে না। এদের আন্দোলনও এবার ক্রমশ কমে আসছে। এখানের কর্মচারীরা নিজেদের ভাগ্যের হাতেই ছেড়ে দিয়েছে। মোহনলালের ওই কাহিনি ভাষণ শুনতে তারা আসেনি।

ওদিকে কোলিয়ারির পুরনো ম্যানেজার মিঃ সেন ও হতাশ হয়ে পড়েছেন। তিনিই প্রথম এখানে ওইভাবে কয়লা চুরি বন্ধ করতে চেয়েছিলেন, কোলিয়ারিতে বেআইনি ভাবে ক্লোজিং বন্ধ করতে চান।

এই নিয়ে কর্মচারীদের সঙ্গে তারও গোলমাল শুরু হয়। মিঃ সেন নিজেই এতকাল মালিকদের হয়ে কোলিয়ারি চালিয়েছেন। তিনি সেদিন বোর্ড মিটিং-এ

বলেন,

—এইভাবে বেআইনি পথে কয়লা তুললে কোলিয়ারির বিপদ হবে। ইয়ার্ড থেকে শ'শ' টন কয়লা জাল পারমিট দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে কোলিয়ারিতে সেই বাবদ টাকাও আসে না। লাখ লাখ টাকা বের হয়ে যাচ্ছে। যোগসাজশ করে রাতের অন্ধকারে কয়লা তোলা হচ্ছে। এভাবে চললে অনেক কোলিয়ারির কয়লাই ফুরিয়ে যাবে। বোর্ড মিটিং-এ ম্যানেজাররা আসেননি বিভিন্ন কোলিয়ারি থেকে। তাদের অনেকেই এইসব কাজে নীরবে মদত দেন।

তার বিনিময়ে তারাও ঘরে বসে মোটা টাকা পান। সমবায়ের কোলিয়ারির উন্নতির কথা ভাবতে গেলে এসব রোজগার বন্ধ হয়ে যাবে।

কিন্তু মিঃ সেন-এর মতো আরও কিছু ম্যানেজার আছেন তারা এর প্রতিবাদ করেন।

বিনোদবাবু কোনো কোলিয়ারির বড়বাবু। মালিকের আমলে ছিল সামান্য কেরানি। এরই মধ্যে তিনি কয়েক লাখ টাকা খরচ করে বিরাট এক প্রাসাদ বানিয়েছেন, ছেলে বড় ব্যবসাও ফেঁদেছে।

বিনোদবাবুকে সেদিন মিঃ সেন তার চেম্বারে ডাকিয়ে এনে একরাশ জাল পারমিট দেখিয়ে বলেন,

—এত এত কয়লা চলে গেছে জাল পারমিটে আপনি কী করে সই করলেন?

বিনোদ বিপদে পড়ে। এর চক্র বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। শেঠ সুখলালের কাছেও খবরটা যায়, এবার মোহনলালের ইঙ্গিতে শুরু হয় ওই কোলিয়ারিতে শ্রমিক ধর্মঘট। মিঃ সেন-এর বিরুদ্ধে তাদের লড়াই শুরু হয়। ফোমিং বন্ধ। ওদিকে শ্রমিকদের দাবি তাদের উপর মিঃ সেনের অন্যায় জুলুম বন্ধ করতে হবে। না হলে ওই এলাকার আরও অনেক কোলিয়ারি বন্ধ হয়ে যাবে।

শেষ অবধি মিঃ সেনকেই বদলি করে দিল কর্তৃপক্ষ। ধর্মঘটের সময়ই অবশ্য অন্যদিকে রাতের অন্ধকার শতশত টন কয়লা কাটাই হয়েছে। পাচারও হয়েছে, ধর্মঘট ওই রাতের কাজে হয়নি। বেশ দীর্ঘ দিন থেকেই এইভাবে কোলিয়ারি জগতেও দলবদ্ধ ভাবে লুটপাট চলেছে এবার শুরু হয়েছে সেখানে আর এক সমস্যা।

আট দশটা কোলিয়ারিতে কয়লাই আর নেই, প্রায় সব সঞ্চিত কয়লাই এই ভাবে বেহিসাবি কাটার জন্য সময়ের আগে ফুরিয়ে আসছে। অথচ শত শত শ্রমিক রয়ে গেছে তাদের জন্য মোটা টাকা মাইনে গুনতে হচ্ছে। এবার সরকারও ভাবছে ওইসব অলাভজনক কোলিয়ারি বন্ধই করে দেবে।

এই নিয়ে ওই মোহনলালের দল আবার মিটিং মিছিল আন্দোলন শুরু করে।

শ্রমিকরাও প্রথমে মহা উৎসাহে ওই মিছিলে যোগ দেয়। কিন্তু কয়লা তো আর তৈরি হয় না সহজে। প্রকৃতির দীর্ঘ কয়েকশো বছরের ফসল ওই কয়লা। এরা অর্থের জন্য তাকে হেলায় নষ্ট করেছে। তারই খেসারত দিতে হবে তাদের।

মিঃ সেন এবার রিটায়ার করছেন কোনো কোলিয়ারি থেকে। তিনি বলেন,

—এই সর্বনাশকে ঠেকাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু অর্থের নেশায় পড়ে কিছু মানুষের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছি। এখন এই সর্বনাশকে মেনে নিতেই হবে। একে ডেকে

এনেছি আমরা নিজে।

নিশীথবাবুও এই সমস্যার গভীরে গেছেন। তিনিও বহু কোলিয়ারি ঘুরে দেখছেন। এদিকের শ্রমিক সংগঠনের নেতাদেরও চেনেন, দেখেছেন মোহনলালের মতো নেতারা এত ক্ষমতা হাতে পেয়ে শিল্পবিকাশের কাজটা করেননি।

শ্রমিকদের কিছু পাইয়ে দিয়ে নিজেরা তার সিংহভাগ পুষেছে। এইভাবে কোলিয়ারিগুলোকে বিপন্ন করে এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক অবস্থাকে বিপন্ন করে তুলেছে। তার উপর বিশ্বায়নের ধাক্কায় সার কারখানাও এখন ধুঁকছে।

এবার তাই তিনি চান নতুন তরুণ নেতাদের যারা এখনও কিছু করার কথা ভাবে। তাই মোহনলালও এবার আর ভোটের টিকিট পায়নি। এখানে নতুন একটি তরুণই দাঁড়িয়েছে। রতনের দল এখন বিধ্বস্ত। তবু তারা প্রার্থী দেয় নামমাত্র।

মোহনলাল টিকিট পায়নি বেশ জানে সে দলের নেতারা তাকে বাতিলই করেছেন তার লোভ আর লালসার জন্য। মোহনলাল এতদিন ধরে রাজ্যপাট চালিয়ে এসেছে। কিন্তু এবার তাকে এইভাবে বাতিলের দলে ফেলে দেবে ওরা, সে ভাবেনি।

নিশীথবাবুকে সে সমীহ করে। লোকটি সৎ দলের নিষ্ঠাবান নেতা। এখনও টিনের একটা মাঠকোঠাতে বাস করেন, একটু মাথার উপর ছাদও তার নেই।

মোহনলাল এসেছে কার্তিকবাবুর কাছে। কার্তিকবাবুও বুঝেছিল যে দিন বদলাচ্ছে। ওদিকে সার কারখানার কাজও বন্ধ। দুতিনটে কোলিয়ারিতে তবু হানা দিয়ে কিছু পাচ্ছিল। এখন মাল ফুরিয়ে আসতে কর্তৃপক্ষের টনক নড়েছে। শ্রমিকরাও বুঝেছে এতকাল লুঠপাঠ চালাতে দিয়ে আজ তাদের সর্বনাশ এসে গেছে। তাই তারাও সজাগ।

এখন আর কয়লা পাচারের কাজ তেমন চলে না। এখন ওদের চেষ্টা চলছে লাভজনক কোলিয়ারিগুলো পরিত্যক্ত হয়ে গেলে ওরা সেখানের বাকি ছিটেফোঁটা যা আছে তাই হাতাবে। মোহনলালকে দেখে কার্তিকবাবু আজ তত আমল দেয় না মোহনলালও আজ বাতিলের দলে। তবু বলে কার্তিক।

—এসো মোহনলাল।

মোহনলাল বলে—দেখলেন কার্তিকবাবু। আমাকে ভোটে দাঁড়াতে দিল না। আমি নির্দল হয়েই দাঁড়াব।

কার্তিক দেখছে লোকটাকে। বলে,

—আর ওসবে আমি নেই মোহনবাবু। এখন বাজারের অবস্থা খুবই খারাপ। সব কাজকর্মই বন্ধ। এতদিন এই অঞ্চল ছিল সোনার খনি—এবার হবে অন্ধকারের দেশ। আর রাজনীতি করে কোনো লাভ হবে না এখানে।

মোহনলাল হতাশ হয় কার্তিকবাবুর কথায়। কার্তিকবাবু বলেন,

—অনেক কামিয়েছ মোহনলাল এবার এখান থেকে কেটে পড়ো। না হলে বিপদ হতে পারে।

কার্তিকবাবু তাকে কাটিয়ে দেন এইভাবে।

ওদিকে নতুন প্রার্থীর হয়ে ভোটের প্রচার চলছে। মিটিং-মিছিলও হচ্ছে। কিন্তু

এখানের লোক যেন এবার নিজেদের সর্বনাশের কথা ভেবে সেই উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে। বিজনও দেখছে এখানের কারখানার অবস্থা। এখন আর বাইরের অর্ডার আসছে না। মাল তৈরির কাজ প্রায় বন্ধ। কাঁচামালের জোগানও তেমন নাই। বিজন দেখে সেই বিশাল ব্লাস্ট ফার্নেসের শূন্য জায়গায় এখন বুনো আগাছার জঙ্গল। একদিন ওইটাই ছিল এই কারখানার প্রাণকেন্দ্র। আজ সেখানে নেমেছে স্তব্ধতা।

ওদিকে বসানো পাইপের শেডগুলোতে তখন থাকতো কর্মব্যস্ততা। অটোমেটিক মেসিনে লালাভ লোহা নানা মাপের পাইপে পরিণত হয়ে কনটেনার বেল্ট থেকে গড়িয়ে পড়ত বিশাল জলের ট্যাঙ্কে। বাতাসে উষ্ণতা, যন্ত্রদানবের গর্জন। বাতাসে গলিত লোহার উত্তাপ।

আজ সেখানে কোনো কাজই হয় না। মেসিনগুলো মৃতদানবের মত দাঁড়িয়ে আছে। দুচারজন শ্রমিক শেডে বসে খৈনী টিপছে, ওদিকে দুটো ক্রেন পড়ে আছে। বিজন ওখানে মাঝে মাঝে গিয়ে দাঁড়ায়। ক্রেনের চেম্বারটাও মাটিতে বসে গেছে। ওটা আর ঊর্ধাকাশে উঠে বিশাল কাস্টিংগুলোকে আসমানে তুলে নিয়ে ফিনিশিং শেডে নিয়ে যায় না। বিজনের মনে পড়ে প্রথম দিন সে এখানে জয়েন করেছিল। উইলসন সাহেব বলেছিল,

—নাগর দোলায় চেপেছ বিজন। এটাও তেমনি। সুইচ টিপলেই ক্রেনের চেম্বারটাকে নিয়ে বিশাল ওই বিমটা ঊর্ধশ্বাসে উঠে যায়।

বিজনও আসে এ বাড়িতে। প্রতিমাকে দেখে সে বুঝেছে জীবন একটা জায়গাতে ভুল করেনি। প্রতিমাকে সে চিনেছিল। মেয়েটা সংসারে দিনরাত কাজ করে—তারপর কাজে যায় ওই নতুন ফ্যাক্টরিতে। ওর হাতের তুলির টানও দেখেছে বিজন। বিজন বলে,

—রিয়েল আর্টিস্ট হে। প্রতিমা তোমার ডিজাইনগুলোর জন্য মাল এত কাটছে। প্রতিমা বলে বিজনকে—বিজনদা। এবার নতুন কি লিখছেন। বিজনও ভাবছে। অবিনাশবাবুই বলেন,

—বিজন এখানের কথাই লেখ। একটা বিগত যুগের কথা। সেদিন ছিল আলো, ছিল প্রাচুর্য। এই কারখানা একটা মানুষের মতোই হে। শৈশব থেকে আসে কৈশোর, তারপর যৌবন, তখন চলে তার দিগ্বিজয়। চারিদিকে আশার আলো খুশির গান। তারপর আসে বার্ধক্য। কোনোরকম টিকে থাকে ধুঁকে ধুকে একদিন সব শেষ হয়ে যায়।

বিজন ভাবছে কথাটা। বলে,

—শুধু এই কারখানাই নয় কাকাবাবু। একটা অঞ্চল নিয়ে এই সত্যটা ফুটে ওঠে। এইখানে একদিন ছিল কত কলকারখানা। মাটির নীচে ছিল কত সম্পদ। কত শতাব্দী ধরে এর লুণ্ঠন চলেছে। একদিন আসবে এখানের সবকিছু অসময়ে শেষ হয়ে যাবে। সেদিন এই সবুজ উপত্যকা পরিণত হবে পরিত্যক্ত বন্ধ্যা জমিতে। সেখানে থাকবে শুধু শূন্যতা নিঃস্তব্ধতা।

প্রতিমা খোকনকে নিয়ে ব্যস্ত। ছোট দামাল ছেলেটা এখন হাঁটতে পারে। দু

একটা কথাও বলে, বাবা-মা, জানে না ওর বাবা আর কোনোদিন আসবে না। একটা দুরন্ত কালের ঝড়ে সে ঝরাপাতার মত ঝরে গেছে অকালে।

অবিনাশবাবুই বলেন,

—কারখানার অবস্থা কী হে বিজন?

বিজন বলে—কী হবে জানি না কাকাবাবু। ভাবছি কলকাতায় কোনো কাজের চেষ্টাই করব। একটা খবরের কাগজে চেষ্টা করছি। ওদিকে সার কারখানাও নাকি বন্ধ করে দেব এইভাবে চললে সরকার এই কারখানাও রাখবে না।

অবিনাশ বলে—বাজারের অবস্থাও ভালো নয় হে। তখন ছিল মাইনে নানা রকম বোনাস, ইনসেনটিভ। বাজারে কত কেনাবেচা হতো। এখন দোকানে বসে মাছি তাড়াতে হয়। একা আমার নয়। সকলের অবস্থাই তাই।

বিজন কদিন কলকাতায় এসেছিল। এখানে তার মনে হয়েছে—এই উপত্যকায় যুগের শূন্যতা নেমেছে। তাই তাকেও চলে যেতে হবে অন্যত্র রুজিরুটির সন্ধানে। কলকাতাতেই যাবার সন্ধান করে সে। ওখানে গেলে লেখার কাজেরও সুবিধা হবে আর যদি কোনো খবরের কাগজে চাকরি পায় তাতেই দিন চালানো যাবে।

তাই কলকাতায় এসেছিল যোগাযোগের জন্য। দুতিনদিন থেকে ফিরছে শিয়ালডাঙায়। হোস্টেলে পৌঁছাতে ওদের কাজের লোক শিবু বলে,

—সীমা দিদিমণি খবর পাঠিয়েছেন। এলেই যেন ওখানে যান। জরুরি দরকার আছে।

বিজন বলে—আর কিছু খবর দিয়েছেন।

শিবু বলে—না। তবে শোনলাম বাজারে নিতাইবাবুর খুব অসুখ চলছে।

বিজনও চিন্তিত হয়। কিছুদিন ধরে নিতাইবাবুর শরীর ভালো যাচ্ছে না তাই ওর অসুখের খবর পেয়ে বিজন একটু চিন্তায় পড়ে।

এখন অফিসে কাজকর্ম তেমন নেই।

বিজন অফিসে গিয়ে হাজিরা খাতায় সই করে বের হয়ে পড়ে নিতাইবাবুর বাড়ির দিকে।

নিতাইবাবু কিছুদিন থেকে ভুগছেন। সারাজীবন তিনি ঘুরেছেন এই এলাকায়। দিনরাত মাঠে ঘাটে মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করেছেন। নিজের জমিদারি ব্যবসাপত্রও দেখেননি। সীমা তখন ছোট সীমার বাবা এসব ব্যবসা-কোলিয়ারির কাজ, জমিদারি দেখাশোনা করতো। সে হঠাৎ মারা গেল। নিতাইবাবু ব্যবসা-বাণিজ্য কোলিয়ারির কাজও কিছুই তেমন জানেন না। তবে তাদের পুরোনো ম্যানেজারই সব দায়িত্ব ঘাড়ে তুলে নেন। নিতাইবাবু বলেন,

—ম্যানেজারবাবু, আপনি সব দেখাশোনা করুন।

তারপর সীমা বড় হতেই ম্যানেজার বলে,

—সীমা মা বড়বাবু তো ওই দেশসেবার কাজ নিয়েই রইলেন। তুমিই এসব দেখভাল করো মা। আমি সব বুঝিয়ে দিই।

নিতাইবাবুও খুশি হন,

—তাই দ্যাখ সীমা। ভবিষ্যতে এসব তো তোকেই দেখতে হবে। সীমাই ক্রমশ ব্যবসাপত্র দেখাশোনার কাজে জড়িয়ে পড়ে পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে।

নিতাইবাবু তারপর পূর্ণ উদ্যমে দেশসেবার কাজে লাগেন। এর জন্য নিজের টাকাও খরচ করেছেন। দেশ স্বাধীন হবার পর নিতাইবাবুর মতো নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমী মানুষ অনেক স্বপ্নই দেখেছিলেন। দেশের সমাজের কল্যাণ হবে। শিক্ষা-চিকিৎসা পানীয় জল এসবই পাবে, চাষের কাজেও নানা সাহায্য সুবিধা পাবে।

বিজন এসেছে নিতাইবাবুর ওখানে। সীমা কদিন জেঠুমণিকে নিয়ে ব্যস্ত। বিজনও নেই। ডাক্তারও তেমন আশা দিতে পারেনি। বিজন আসতে সীমা বলে,

—তোমার কথাই ভাবছিলাম বিজন। জেঠুমণি খুব ভুগছেন। একাকী যে কী করি, ওদিকে ফ্যাক্টরির কত কাজ। অবশ্য উইলসন ওসব দেখেছেন এখন যদি কিছু হয় জেঠুমণির।

নিতাইবাবু বিজনকে দেখে খুশি হন। তার মুখে চোখে যেন মৃত্যুর কালো ছায়া নেমেছে। বলেন তিনি,

—তোমার জন্য অপেক্ষা করছি বিজন।

বিজন ওর পাশে গিয়ে বসে। নিতাইবাবু বলেন,

—বিজন, এতকাল মাথা উঁচু করে লড়াই করেছি, কিন্তু জীবনের শেষ প্রান্তে এসে হেরে গেলাম। হতাশ হয়েছি।

বিজন জানে ওর বেদনার কথা। ওকে সান্ত্বনা দেবার ভাষাও তার নেই। তাই চুপ করেই থাকে। নিতাইবাবু বলেন,

—সীমার পাশে কেউ নেই। এতদিন ধরে দেখেছি তোমায়, একটা কথা মনে হয়েছে এখনও কারো ওপর বিশ্বাস করা যায়। তাই একটা অনুরোধ করব তোমাকে। রাখবে?

বিজন ওর কথায় বলে,

—বলুন, আমি আপনার অনুরোধ নিশ্চয়ই রাখব।

বিজন মানুষটাকে শ্রদ্ধা করে। সীমাও রয়েছে। নিতাইবাবু বলেন,

—তোমার ওপর নির্ভর করতে পারি বিজন, তাই বলছি সীমার পাশে কেউ নেই। তুমি ওর পাশে থাকবে।

বিজন অবাক হয়—স্যার!

নিতাইবাবু বলেন—হ্যাঁ বিজন। তুমি ওর পাশে থাকলে সীমাও সম্মান নিয়ে বাঁচতে পারবে। তাই মনে হয়েছে—সেই কারণেই অনুরোধ করছি বিজন।

বিজন চাইল সীমার দিকে। সীমা মাথা নীচু করে। বিজন বলে,

—আমি কি তার যোগ্য স্যার।

নিতাইবাবু বলে,—আমি মানুষের যোগ্যতার বিচার করি অন্য নিরিখে বিজন। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে এই ধারণাই হয়েছে। এই আমার শেষ অনুরোধ।

নিতাইবাবু উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছেন। সীমা ওকে ওষুধটা খাওয়াবার চেষ্টা করে। কিন্তু সবটা আর ভিতরে যায় না। একটা হেঁচকি ওঠে স্তব্ধ হয়ে যায় নিতাইবাবুর দেহটা। একটি জীবন শেষ হয়ে যায় একটি মুহূর্তেই। সীমা আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে।

—জেঠুমণি, ব্যাকুল কান্নায় ওর প্রাণহীন দেহটার উপর লুটিয়ে পড়ে সীমা। বিজনের চোখে জল নামে।

শিয়ালডাঙার ইতিহাসে একটি অধ্যায়ের শেষ হলো। সেই প্রাচীন শিয়ালডাঙার জীবনের সুখ-দুঃখের সাথী এখানের মানুষের একজন অকৃত্রিম বন্ধু আজ শূন্য হাতে ফিরে গেলেন। উইলসনও এসেছে। এসেছে রতন তার দলের লোকজন নিয়ে। শহর থেকে অনেকেই এসেছেন। বিজনের মনে হয় এই সমাজে যে কিছু করে গেছেন তাকেই আঘাত দিয়েছে অন্য গোষ্ঠী, তাকে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দিয়েছে মানুষ।

কেন জানে না বিজনের আজ মনে পড়ে ম্যান সাহেবের কথা। তিনিও চেষ্টা করেছিলেন, এই কারখানাকে গড়তে, একটা জাতির জন্য শ্রেষ্ঠ কারখানা উপহার দিতে। কিন্তু তাকে নিঃস্ব হয়ে ফিরে যেতে হয়েছে। আজও তার অতৃপ্ত আত্মা এই শহরের আকাশে বাতাসে যেন দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘুরে ফেরে।

নিতাইবাবুও একটি ইতিহাস গড়তে চেয়েছিলেন। উন্নত স্বাধীন দেশের গৌরবময় ইতিহাস। তার জন্য সর্বস্ব উনি করেছেন। তাকেও শূন্য হাতে ফিরিয়ে দিয়েছি আমরা।

শহরের বহু মানুষ এসেছে আজ নিতাইবাবুকে শেষ বিদায় জানাতে। বনানীও এসেছে মেয়েদের নিয়ে। সীমার চোখে জল। মিঃ উইলসন চলেছে খালি পায়ে ওই জনতার সঙ্গে। স্তব্ধ কারখানা শ্রমিকদের অনেকেই এসেছে। চলছে শহরের পথে। ওর শেষ যাত্রার মিছিলে।

তখন বরাকর নদীর বুকে সন্ধ্যা নামছে। অন্ধকারে ছায়ার মতো জেগে থাকে আদিম অরণ্যের শেষ চিহ্ন নিয়ে পাহাড়গুলো। চিতা জ্বলে ওঠে। শবযাত্রার জয়ধ্বনিতে ফুটে ওঠে শেষ বিদায়ের সুর। নিতাইবাবু চলে গেলেন।

তিনি যেন যাবার আগে এই বেদনাময় পরিণতি দেখে গেছিলেন। এবার শিয়ালডাঙা আয়রন ওয়ার্কস-এর কর্তৃপক্ষের কাছে দিল্লি থেকে চিঠি এসেছে এই কারখানাকে আর চালাতে রাজি নন তাঁরা।

এর মৃত্যু ঘণ্টা বেজে গেছে তাই এই অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি করতে চান তাঁরা। এই শতাব্দী প্রাচীন ভারতের প্রথম লোহা কারখানার কাজ বন্ধ করে দিতে চান—শ্রমিকদেরও রিটায়ার করতে হবে। ইদানীং ইংরেজীতে একটা নতুন কথা চালু হয়েছে। গোল্ডেন হ্যান্ডশেক। সাহেবরা বিদায়ের সময় হাতে হাত মেলালে কিছু প্রাপ্তিযোগও ঘটবে। অর্থাৎ তোমার পাওনা-গণ্ডা বুঝে নিয়ে তুমি বিদায় হও। তাই এই বিদায়ী করমর্দনকে ওরা গালভরা নাম দিয়েছে সোনালি করমর্দন।

স্বাধীনতার পর দেশগড়ার জন্য অনেক কিছুই কাজ হাতে নেওয়া হয়েছিল দেশকে স্বনির্ভর করার জন্য বিভিন্ন কলকারখানা গড়া হলো। তার সুফলও পেতে শুরু করল মানুষ। বহুলোকের কর্মসংস্থান হল, দেশের প্রোডাকশন বাড়লো। সুখী

হলো দেশের মানুষ।

কিন্তু সেই সুদিন সেই কর্মযজ্ঞকে ধরে রাখতে পারা গেল না। শুরু হল লুণ্ঠনপর্ব। পাইয়ে দেবার রাজনীতি আর উচ্ছৃঙ্খলতা। পেশীশক্তির প্রাধান্য। এতে উৎপাদন ব্যাহত হতে শুরু করলো।

দেশের ভিতরে এই আঘাত শুরু হলো। এরপর আরও প্রবল আঘাত এলো দেশের বাইরে থেকে। বিশ্বব্যাঙ্ক আর আমেরিকার আগ্রাসন নীতির চাপে আরও কম খরচায় বাইরের মাল ঢুকলো দেশীয় বাজারে। ফলে আমাদের উৎপাদন মার খেতে লাগল। তার জের এসে পড়েছে এই দূর মফস্বলেও। এর অর্থনৈতিক নীতির ওপর।

এরপর ওই ফার্টিলাইজার কারখানাতে এসেছে ওই স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণের আদেশ। দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে ফার্টিলাইজার টাউনশিপে বহু পরিবার ঘর বেঁধেছে। বাজার দোকান পসারও হয়েছে। তারাও ভাবনায় পড়েছে। টাউনশিপের কোয়ার্টারও ছেড়ে দিতে হবে। ওই কোয়ার্টার না-ছাড়লে পাওনা-গণ্ডা দেবে না কোম্পানি। তাই এই সাজানো জনবসতিও শূন্যপুরীতে পরিণত হবে।

বনানীও ভাবনায় পড়ে। তার সমবায় এখন এইখানেই জায়গা পেয়েছে। এখন কাজও বেড়েছে। কিন্তু শহরই পরিত্যক্ত হয়ে গেলে তারাই বা এখানে থাকবে কী করে। তবু প্রতিবাদের সুর ওঠে। মোহনলাল আবার এসে হাজির হয়েছে। এখন সার কারখানার শ্রমিকদের জন্য অন্য কোনো দলই এগিয়ে আসেনি। নিশ্চিত পরাজয় জেনে নিয়ে তারাও এদের ছেড়ে গেছে।

মোহনলালেরও পায়ের নীচে মাটি নেই। আজ সে আসে বনানীর কাছে। বনানী সন্ধ্যার পর কোয়ার্টারে রয়েছে। হঠাৎ মোহনলালকে ঢুকতে দেখে চাইল।

—তুমি! মোহনলাল জানে আজ বনানী রাজনীতি করে না। সে এখন একটা গড়ার কাজ নিয়ে ব্যস্ত। এখন জেলার বিভিন্ন জায়গাতে তার সমবায়ের কাজ শুরু হয়েছে। একটা অসহায় মেয়ে একার প্রচেষ্টাতে এমন কিছু গড়েছে তা সে দেখেছে। তাই সারা জেলায় কেন বাংলার মহিলা সমবায়ের ক্ষেত্রে বনানী একটি সুপরিচিত নাম।

মোহনলালকে লোকে আজ কোনো মর্যাদাই দেয়নি। ক'বছরে যা পেয়েছিল সেই সম্মানের যে কোনো দাম নেই—তা জানে মোহনলাল। আজ তাই এসেছে বনানীর কাছে। তার ঘাড়ে ভর করে আবার নিজের পায়ের তলায় মাটি পেতে চায়। মোহন বলে,

—সরকার এত বড় কারখানাকে অন্যায় ভাবে তুলে দেবে, এত লোকের অন্ন চলে যাবে? শুনছ আয়রন কারখানা বন্ধ হয়ে যাবে। ওদিকে বেশ কিছু কোলিয়ারিও বন্ধ হয়ে যাবে। এত লোক যাবে কোথায়? তাই একসঙ্গে প্রতিবাদ জানাতে হবে।

বনানী বলে,

—ভাঙার কাজ তো শুরু করেছিল তোমার মতই লোভী নেতার দল, আজ ঘরে-বাইরের আঘাত তাই এসেছে।

—এর কোনো বিহিত হবে না? চুপ করে থাকব? মোহনলাল বলে। বনানী

দেখছে ওকে। বলে,

—আমি রাজনীতির পথ ছেড়েছি তোমার জন্যই। আমাকে আমার পথে চলতে হবে। আমি গড়তে চাই, তার অবকাশ আজও আছে। তাই ভাঙার রাজনীতিতে যেতে চাই না।

মোহনলাল কী বলতে চায়।

বনানী বলে—আমাদের পথ অনেক আগেই দুদিকে বেঁকে গেছে। মোহন! আজ আর ফেরার ইচ্ছা আমার নেই। তুমি আসতে পারো। আমার জরুরি কাজ আছে।

মোহন চটে উঠে,

—রতনকে নিয়ে তো জিপে করে ঘোরো দেখি—তখন সময় হয়। আর আমি তোমাকে হাতে করে গড়লাম। আজ আমাকে চিনতেই পারো না।

বনানী বলে—কাজের জন্য আমি কার সঙ্গে মিশব না মিশব তার কৈফিয়ত তোমাকে দেবার কথা নয়। ওটা আমার ব্যাপার। এখন এসো আর ভবিষ্যতে আমার এখানে না-এলেই ভালো করবে। তুমি এখানে যাতায়াত করো। এটা চাই না।

মোহন নীরব রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে বের হয়ে যায়।

ফার্টিলাইজার টাউনশিপের মিছিলও আর জমেনি। কয়েকজন ছেলে বাজারের দুচারজন ফড়ে আনাজ বিক্রেতা ঘুমটির দোকানের মালিক পথে বের হয়। বাবুরা যারা এতকাল কারখানার মাঠে আওয়াজ তুলে মুখর করে রাখতো তারা আজ স্তব্ধ হয়ে গেছে।

বাবুদের স্বেচ্ছা-অবসর ফর্ম সই করা হয়ে গেছে। নিজের মৃত্যুর পরোয়ানাতে সই করে তারা এখন বিদায়ের শেষদিন গুনছে। অনেক যোগ্য লোক অন্যত্র চাকরি নিয়ে আগেই চলে গেছে। তাদের কোয়ার্টারগুলো তালাবন্ধ হয়ে পড়ে আছে। কোয়ার্টারের জানলা-কপাটগুলো এর মধ্যেই কারা খুলে নিয়ে গেছে রাতের অন্ধকারে। সাজানো বাগানে জন্মেছে বনতুলসী পুটুস গাছের জঙ্গল। ওই পরিত্যক্ত কোয়ার্টারের বাতাসে আজও মিশে আছে অনেক হাসি-আনন্দের সুর, শুধু মানুষগুলো হারিয়ে গেছে।

সীমা ক্রমশ নিতাইবাবুর শোকটা সামলে নিয়েছে। এখন তার ঘাড়ে অনেক দায়িত্ব পড়েছে। ম্যানেজার কাকা অবশ্য এদিকগুলো সামলাচ্ছেন। সীমা এখন নতুন কারখানা নিয়ে ব্যস্ত। উইলসনকে কলকারখানার অনেক প্রতিষ্ঠান চেনে এবার তারা অনেক বিদ্যুৎ কোম্পানি প্রচুর ইনসুলেটর ফিউজ আর ও নানা কিছুর অর্ডার পেয়েছে, বাইরের থেকেও অর্ডার আসছে। তাই কারখানা আরও বাড়াতে হচ্ছে।

বিজনও আসে এখন। সীমাই বলে—এদিকের কাজ কিছু দ্যাখো, একা উইলসন সাহেব কত দেখবেন?

বিজনও ভাবছে কথাটা। সীমার কথায় বলে,

—ওদিকে কারখানার অবস্থা তো সঙ্গীন। ফার্টিলাইজার কারখানার মতো এখানেও ভি আর এস নিতে হবে শুনছি। তাই ভাবছিলাম কলকাতার খবরের কাগজের অফিসে যাব। যদি কাজ পাই।

সীমা বলে,

—ওসব কথা পরে ভাবলেও চলবে। এখন মিডল ইস্টের এতগুলো টাকার অর্ডার কীভাবে সাপ্লাই দেবে সেইটাই ভাব।

সীমার কথায় অন্য সুর ফুটে উঠে।

বিজন কাজে লাগে। উইলসন বলে,

—বিজন! এতদিন লোহা নিয়ে কাজ করেছ। এবার মাটি নিয়ে কাজ করো।

সীমা বলে—আর সেই সঙ্গে যাত্রা-নাটক।

উইলসন বলে, ওটা মাস্ট। নাও কাম চালু করো—

লোকটা এখনও কাজ নিয়েই থাকে। বনানী এসেছে সীমার কাছে। বলে,

—ওই টাউনশিপ তো ভূতের রাজ্য হবে। জল কারেন্টও থাকবে না। আমাদের সমবায়ের কারখানা তো ওখানে রাখা যাবে না।

সীমা বলে,

—জায়গার জন্য ভাবতে হবে না। আমাদের বাড়ির ওদিকে তো অনেক জায়গা পড়ে আছে। ওখানেই নতুন কারখানা অফিস করো। ওই পুরোনো পতিত প্রেতপুরীর থেকে চলে এসো। কাছাকাছিই সব থাকবে।

বিজন বলে,

—তাই ভালো হবে বনানীদি। ওইসব টাউনশিপে আমাদের পরাজয়ের কলঙ্ক—ওসব ভুলে নতুন করে আবার গড়তে হবে।

কোলিয়ারির জগৎ এখানে। বহু কাল থেকেই মাটির নীচের এই সম্পদ আহরণ করছে এখানের মানুষ।

মিঃ সেন-এর বাবা ছিলেন প্রথম কোলমাইনস ম্যানেজারদের অন্যতম। ইংরেজ কোম্পানিগুলো বেশ কিছু কোলিয়ারির মালিকানা নিয়ে কয়লা তোলার কাজ শুরু করে। তাদের ব্যবসা বাড়াবার জন্যই সেদিন রেল কোম্পানি রানিগঞ্জ অবধি রেললাইন চালু করে। মিঃ সেন তখন ছোট।

এখন মিঃ সেন তিনচারটে কোলিয়ারির জেনারেল ম্যানেজার। সেকালের দু'একজন কর্মী এখনও রয়েছেন। নিরাপদবাবু তাদের অন্যতম। সেও মিঃ সেনের সঙ্গে দীর্ঘদিন কাজ করেছে। এবার তাদের কোলিয়ারি বেশ কয়েকটাকেই বন্ধ করে দিচ্ছে। এবার ওই বাবু শ্রমিকদের টনক নড়ে ওদের চাকরি যাবে না কিন্তু এই রানিগঞ্জ এলাকা থেকে ওদের চলে যেতে হবে মধ্যপ্রদেশের পাহাড় জঙ্গলের বুকে সদ্য গড়ে ওঠা কিছু কোলিয়ারিতে। সেই গহন অরণ্যে আলো পৌঁছয়নি।

দু'একজন গিয়ে সেই জায়গাগুলো দেখে হতাশ হয়ে ফিরে এসেছে। তারা বলেন,

—রেল স্টেশন থেকে জিপে করে ঘনবন পাহাড় দিয়ে পার হয়ে চারঘণ্টা যেতে হয়। থাকার জন্য শুধু শেডই রয়েছে। বাজার হাটও বহুদূরে। আর রাতে বাঘ হায়নাও আসে ওখানে। কাঁচা কয়লার আগুন জ্বেলে রাখতে হয় রাত জেগে। দিনের বেলায় তেমন রোদ্দুর শুনেছি ঠাণ্ডাও পড়ে খুবই।

এখানে তারা সবকিছু হাতের কাছে পেয়েছে। উপরি টাকাও রোজগার করেছে

দুহাতে। এবার শুরু হবে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত। নিরাপদবাবু বলেন মিঃ সেনকে,

—স্যার, আমি আর ওখানে যাচ্ছি না। এই বয়সে বেঘোরে মরতে চাই না। ছেলেটাও চাকরি করছে। এবার দেশেই ফিরে যাব গ্রামে। মিঃ সেন অবশ্য রিটায়ার করছেন। তার বুকে এক হাহাকার ও শূন্যতা ভরা।

পিট হেডের ওদিকে কোলিয়ারির অফিস, মাঠের মধ্যে। কিছু গাছগাছালিও রয়েছে। পাশে দুচারটে দোকান আর সপ্তাহে মাইনের দিন হাট বসে। লোকজনের হইচই-এর শব্দ উঠত। এখন আর সেখানে হাট বসে না। দোকানগুলো নেই। জায়গাটা নিঃস্তব্ধ, একটা সর্বনাশের ছায়া নেমে এসেছে সেখানে।

নিরাপদবাবু বলে—আগে কত জমজমাট ছিল জায়গাটা, এখন সব শূন্য।

মিঃ সেন শান্তিনিকেতনের ওদিকে বাড়ি করেছেন। সেখানে চলে যাবেন। শেষ জীবনটা ওখানে কাটিয়ে দেবেন। তাঁর একছেলে অধ্যাপক, তাকে আর মাইনিং লাইনে আনেননি।

—এ সাব। মেরা লেড়কা আভি ঘরে এল না। এ সাব! কামমে গেল রাত বেলাতে—

চাইলেন মিঃ সেন। কোলিয়ারির পুরনো মালকাটা ভুবন। ওর ছেলেও এখানে কাজ করতো। বেশ শক্তপোক্ত চেহারা। তখন কোলিয়ারি জোর কদমে চলছে। মিঃ সেন অবশ্য এত মাল তুলতে চাননি কারণ তিনি জানতেন পুরোনো কোলিয়ারি বেশি মাল তোলা ঠিক হবে না। কিন্তু ওপরওয়ালাদের দাবি যার ফলে অনেক জায়গায় পিলার কেটে কয়লার বেক্সিং বাড়ানো হচ্ছে আর তার থেকে মাল পাচার হচ্ছে রাতেই। তিনি বাধা দিতে চেয়ে পারেননি। এর আগে বাধা দিয়ে বিপদে পড়েন। সেখানে ধর্মঘট হয়। ফলে তাকে বদলি করে দেওয়া হয় এখানে। সেই অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল তাই তিনি মুখ বুজে সব দেখেন, ফলে যথেচ্ছভাবে কয়লা কাটাই চলতে থাকে। আর সেই রাতে দুর্ঘটনা ঘটে যায়। কোলিয়ারির পাঁচশো ফিট নীচে তখন কাটাই চলছে। আগে থেকে পিলারের কয়লাও কাটা হয়ে গেছে। ফলে নীচে কোন সাপোর্ট ছিল না। তাই বেশি কয়লার জন্য ব্লাস্টিং করতেই পুরো টানেলটাই ধ্বসে পড়ে। পাঁচশো ফুট নীচে সেই ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ে গেল চল্লিশ জন শ্রমিক। বেরোবার রাস্তা সব বন্ধ।

খবর আসতেই মিঃ সেনও নিরাপত্তা বাহিনী নিয়ে খাদে নামেন। তাদের উদ্ধারের চেষ্টা করেন। কিন্তু কিছুই করা যায়নি। করার কোনো উপায় নেই আর। বেআইনি ভাবে কয়লা লুঠ করতে গিয়ে প্রাণ দিতে হয় ওদের। ওরা আর ফেরেনি।

ওর বাবাও পাগল হয়ে গেছে। আজও সে তার হারানো ছেলেকে শূন্য পরিত্যক্ত উপত্যকায় কয়লাখনি, পলাশের জঙ্গলে, কুলিধাওড়ার ভাঙা বস্তিতে এদিকে ওদিকে খোঁজে ফেরে। মিঃ সেনকে আজ বিদায় জানাবার কেউ নাই। দুচারটে বুড়ো বাতিল কুলি ঘুরছে এদিকে ওদিকে।

তাদেরও যাবার কোনো ঠাঁই নেই। পিট হেড গিয়ার যন্ত্রপাতি সবই কারা খুলে নিয়ে গেছে। হাটতলাটায় স্তব্ধতা নামে। মানুষের কলরব। মদ হাড়িয়া খেয়ে নাচগান করতো সেদিন। উঠতো মাদল বাঁশির সুর।

আজ স্তব্ধ হয়ে গেছে। সন্ধ্যার পর ঘোরে শিয়াল হুড়ারের দল। কোলিয়ারির রূপই বদলে গেছে। এমনি হাল হয়েছে লুণ্ঠনের জন্য। জাতীয়করণ-এর পর এক সর্বনাশা ব্যর্থতার চিত্র ফুটে ওঠে এই পাহাড়টিলার মালভূমি অঞ্চলে।

এবার শিয়ালডাঙা আয়রন ফ্যাক্টরির অবস্থাও সঙ্গীন হয়ে উঠেছে। সরকার থেকে আগেই ঘোষণা করেছে যে অলাভজনক কোনো কারখানাকে আর চালাবে না তারা। এতদিন কথাটার তেমন কোনো গুরুত্ব দেয়নি সাহেব, বাবুরা। এখন বেশ কিছু কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। পাশে সার কারখানাও বন্ধ হয়ে গেল। এবার শিয়ালডাঙার সাহেবদের ক্লাবেও নামে চিন্তার ছায়া। সেই আনন্দমুখর পরিবেশ আর নেই।

এতদিন তারাও আরামই করেছে। তেমন কোনো কাজ ছিল না। বসে বসে মাইনে পেয়েছে, গাড়িতে চড়েছে থেকেছে এয়ারকুলার লাগানো বাংলোতে মিঃ রায় বলে,

—অন্য কোনো কারখানাতে চলে যাবে তার কোনো উপায় নেই। নতুন কারখানা তো তৈরি হচ্ছে না। যেগুলো ছিল সেগুলোও বন্ধ হয়ে গেছে।

মিসেস রায়, মিসেস প্রধানরা ক্লাবে এসে এখন বেশি মাত্রায় মদ্যপান করে না। কারণ মালের দাম এখন ক্যাশে দিতে হয়। আর তখন বাড়তি পয়সা কার্তিকবাবুই জোগাতো কারখানা থেকে নানা উপায়ে মালপত্র সরিয়ে কার্তিকবাবুও ভালো টাকা পেত। তার থেকে কিছুটা ভাগ দিত তাদের।

মিসেস মিত্র এসব খবর জানতো। এখন সে বাবুদের ক্লাবেই বেশি যায়। মদ্যপান করে না। রীনা ইদানীং বনানীর সাথে পরিচয় করেছে। ওর সাথে সীমার ওখানে গেছে। দেখেছে সীমা সমবায়ের জন্য অনেক কাজই করছে। মেয়েদের নিয়ে ওই ফায়ার ক্লে কারখানার নানা কাজ করছে। রীনা ওখানে দেখে উইলসনকে। অবাক হয় রীনা। উইলসনের বয়স হয়েছে। চুলগুলোতে পাক ধরেছে। ওই মানুষটা স্ত্রী-পরিবার ছেড়ে এই দেশের মাটিতে রয়ে গেছেন। আজ বহু মেয়ের মুখে অন্নের সংস্থান করে দিচ্ছেন।

রীনা বলে,

—মিঃ উইলসন, সত্যি তোমাকে দেখে আশ্চর্য হই। আমরা এদেশে জন্মেছি। অথচ এদেশের জন্য ভাবিনি। তুমি তো ইচ্ছে করলে অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে সুখে শান্তিতে থাকতে পারতে।

হাসে উইলসন—সুখ। মিসেস মিত্র ওই কথাটার অর্থ ঠিক জানি না। তবে এখানে যে আমি অসুখী নই, সেটা বুঝেছি। কারখানার অবস্থা তো ভালো নয় শুনেছ।

রীনা বলে—তাই তো শুনছি। সকলেই ভাবনায় রয়েছে।

—থাকবারই কথা। রুজিরুটির প্রশ্ন। কিন্তু এটা যে ঘটবে তা কেউ ভাবেনি। তার জন্য সাবধানও হয়নি।

তখন নগদ পাওয়ার কথাই ভেবেছিলাম। ভবিষ্যতে টিকে থাকার জন্য বর্তমানেই তার আয়োজন করতে হয়। এটা কেউ করেনি।

রীনা বলে,

—হয়তো তাই, ওরা কাজই করেনি। ওয়ার্ক কালচারটাকে পাইয়ে দেবার স্বপ্নটাকে মুছে ফেলেছিল জীবন থেকে।

উইলসন বলে—তার জন্য দামও দিতে হয়।

ওদিকে কাজ চলছে। প্রতিমা এখন ড্রইং সেকশনের কর্মী। আরও কয়েকজন মেয়ে ওখানে নানা ডিজাইন করে। সেগুলো দিয়ে ওরা প্রোডাকশন সাজিয়ে তোলে।

বনানী ডাকে—প্রতিমা, ইনি মিসেস মিত্র। প্রতিমা নমস্কার করে, রীনা দেখছে ওকে। চিনতে পারে।

—তুমি জীবনের স্ত্রী না?

প্রতিমা ম্লান মুখে জানায়—হ্যাঁ। সবই তো শেষ হয়ে গেল। এখন সীমাদি-বনানীদের চেষ্টাতে কোনোমতে সংসার চালানোর চেষ্টা করছ।

বনানী বলে—ম্যাডাম, এখানে অনেক মেয়েরই জীবন নানা করুণ কাহিনিতে ভরা। সব দুঃখ বেদনাকে ভুলে তবু এরা কাজ করে। আজকের এই যন্ত্রসভ্যতার কথা বলি আমরা সবাই। তবু সেই যন্ত্রযুগ অনেকেই দেখেনি।

মিসেস রায়, প্রধানদের সমাজের এই করুণ ছবিগুলোকে দেখেনি। তাদের দুঃখ হয় তাদের জুয়ো খেলার, মদখাওয়ার মতো টাকা নেই। কার্তিকবাবু এতদিন এইসব রসদ জুগিয়েছে। এখন তার অবস্থাও কাহিল। লুটেপুটে নেবার মতো আর কোনোকিছুই কারখানাতে নেই। শুধু শেড আর বাতিল কিছু মেসিন পড়ে আছে মাত্র। কারখানা থেকে এখন ওই স্ল্যাগের মাল বিক্রি শুরু করেছে। কিছু সিমেন্ট ফ্যাক্টরি ওই মাল থেকে সিমেন্ট তৈরি করছে। আর কিছু সরকার রাস্তার কাজের জন্য কেনে।

মিসেস রায় বলে,

—কার্তিকবাবু, আপনি আমাদের ভুলেই গেছেন। বাংলোতেও আর আসেন না।

কার্তিকবাবু বলে,

—যাবার পথ আর নেই ম্যাডাম, তবে কারখানা যদি উঠেই যায় বাকি শেড যন্ত্রপাতির দামও নেই। তখন ওগুলো কালোয়ারদের ওজন দরে বেচতে হবে। মিঃ মিত্রকে বলে রাখুন যদি ওইসব মাল আমাকে বেচেন।

সেদিন রীনা সে কথা শুনে কার্তিকবাবুকে বলেন,

—আপনি দেখছি শকুনের জাত। সব শেষ করে হাড় মাংসও খেতে চান।

কার্তিকবাবু বলেন,

—আমাদেরও তো বাঁচতে হবে ম্যাডাম।

রীনা বলে,

—ওইটাই বাকি আছে। এতগুলো পরিবার-এর অন্ন যাবে, সেটা বড় হল না। বড় হল ওর শেড যন্ত্রপাতি কেটে কুটে বেচে দেওয়া। কার্তিক চেনে রীনাকে, ওকে সে হাতে আনতে পারেনি। তাই সরে গেল কার্তিকবাবু। এখন ঘুরছে কারখানাকে

শেষ করে কিছু পাবার জন্য।

রীনার মনে হয় একটা শকুন যেন মুমূর্ষু একটা জরাজীর্ণ গরুর দিকে চেয়ে আছে। কখন ওর শেষ নিশ্বাস বের হবে আর ঝাঁপিয়ে পড়বে তা বোঝা দায়।

সাহেবদের ক্লাবের ভাবনাগুলো এবার বাবুদের ক্লাবেও এসে পৌঁছেছে নগ্ন রূপ দিয়ে। প্রতিবার ওদের ক্লাবের বার্ষিক অনুষ্ঠান হয় তিনদিন ধরে। গত বছর থেকেই ওই বাইরের শিল্পী আর আনা হয় না টাকার অভাবে। প্রোডাকশন বোনাস কমে গেছে। কার্তিকবাবু-রতনরাও কারখানার লুটপাটের কিছু টাকা ওই অনুষ্ঠানের জন্য দিত।

তাও বন্ধ হয়ে গেছে।

গতবার ওই ক্লাবের হলেই কোনোমতে অনুষ্ঠান হয়েছিল। একবছরের মধ্যে কারখানার অবস্থা আরও করুণ হয়ে গেছে। সার কারখানা বন্ধ হবার পর এরাও ঘাবড়ে গেছে। অনেক গুজব রটেছে।

এখনও সেই অনুষ্ঠানের জন্য মিটিং হয়নি, এখনও দু একজন বলে—ক্লাবের হলেই একটা দিন করো অনুষ্ঠান। একেবার বন্ধ করে দেবে।

অনেকে বলে—শ্মশানের উপর আর নাচগান করো না হে। কদিন পর সার কারখানার মতো এখানেও না ভূতের রাজত্ব হয়।

এতদিনের সেই মানসিকতাই আজ অন্ধকারের মধ্যে পড়ে কেমন বদলে গেছে।

অনুষ্ঠানও হবে না। সন্ধ্যার পর দুচারজন আসে ক্লাবে। বিজনও আসে মাঝে মাঝে, এর মধ্যে সার কারখানাতে গেছে সে। এখন অনেক ফাঁকা হয়ে গেছে টাউনশিপ কোয়ার্টারগুলো পড়ে আছে। চারিদিক স্তব্ধ শুনশান।

দু-একটা পরিবার এখনও যাবার কোনো জায়গা বের করতে পারেনি পড়ে আছে। আলো নেই, জলটুকু এখনও রেখেছে কোম্পানি, তাও বন্ধ করে দেবে সামনের মাসেই।

বাজার উঠে গেছে। দোকানঘরগুলো খালি পড়ে আছে। খাবারের দোকানের উনুনগুলোও ভেঙে দিয়েছে।

চোখের সামনে ফুটে ওঠে দীর্ঘ দেড়শো বছরের গড়ে ওঠা শিয়ালডাঙা টাউনশিপের ভবিষ্যৎ ছবি। সুন্দর সাজানো বাংলো, বাগান ছেয়ে গেছে আগাছায়। লুঠপাট করে নেবে দামি দরজা-জানলা। লোহার রেলিং কারখানায় জীর্ণ শেডগুলোকেও। সেগুলো আর থাকবে না, এই ক্লাবেও আর কেউ আসবে না।

অবিনাশবাবুর দোকানেও তার পুরোনো বন্ধুবান্ধব দুচারজন আসে রথীনবাবু—নরেশবাবুরাও রিটায়ার করেছে। এখন তাদের ছেলেরা চাকরি করে এই কারখানায়। এই ভাবে দুতিন পুরুষ ধরেই কাজ করেছে এখানের মাটিতে, তাদের শিকড় গজিয়েছে।

কিন্তু এবার সেই মূলে টান পড়েছে। নরেশবাবু বলে,

—এই বয়সে ছেলেটা বেকার হয়ে যাবে। বিয়ে থা করেছে, ঘর সংসার হয়েছে। চাকরি গেলে কী হবে?

রথীনবাবু বলে,

—তবু তুমি তো ঘরবাড়ি করেছ এখানে। আমার—আমার তো ছেলের কোয়ার্টারই সম্বল।

নরেশ বলে—আরে! কোলিয়ারি বন্ধ হয়েছে। সার কারখানাও বন্ধ হল। এই কারখানা গেলে এখানে বাড়িতে কি মাটি খেয়ে থাকব? তা ছাড়া সব লোকই চলে যাবে। তখন এখানে এই ভূতের রাজ্যে আর থাকা যাবে না। ঘটিবাটিও লুঠ করে নিয়ে যাবে।

অবিনাশ ভাবনাতে পড়ে।

তার দোকানের বিক্রিও অর্ধেক হয়ে গেছে। দোকানও তুলে দিতে হবে। বৌমা তবু ওই কারখানায় কিছু রোজগার করে। তাতে কি দিন চলবে?

অবিনাশ বলে—আমিও ভাবছি হে এরপর কী হবে?

এর জবাব এরা কেউ জানে না।

এর মধ্যে সন্তোষবাবু তার বাড়ি কোন কয়লার ব্যাপারীকে সাড়ে তিন লাখ টাকায় বেচে দিয়েছে। বলেন,

—দেশেই ফিরে যাব হে। এরপর বাড়ি কেনার লোকও থাকবে না। ওই টাকায় দেশে জমিজমা আছে কোনো মতে চলে যাবে।

ভূদেববাবু চলে গেছে। এবার চলে যাচ্ছে সন্তোষবাবু। অবিনাশ বলেন—চলে যাচ্ছো সন্তোষ।

দীর্ঘ চল্লিশ বছরের চেনাজানা কত সুখ দুঃখের সঙ্গী এরা। ভেবেছিল শেষ জীবনটা এখানেই সকলে মিলেমিশে থাকবে—তাদের স্মৃতির জগৎ নিয়ে। কিন্তু এমন একটা বিপর্যয় আসবে তা কেউ ভাবেনি। রথীন বলে,

—মোহনলাল এখনও মিটিং করে। দিল্লিতে যাচ্ছে। হাইকোর্টে কেসও করেছে। ও তো বলে কোম্পানি ঠিকই চলবে।

মাঝে মাঝে মোহনলাল এখনও হইচই করে। বাইরে থেকে শহরের লোকজন কোলিয়ারির লোকজন শ্রমিকদের নিয়ে মিটিং করে। নরেশ বলে—ওরাই কারখানার সর্বনাশ করেছে। ওই মোহনলাল কার্তিকবাবু মায় এই সাহেবের দল কারখানাকে লুঠপাট করে যখন তখন ঘর্মঘট ঘেরাও করে এমন কারখানাকে শেষ করে দিল।

তবু অনেকে আশা হারায়নি। হয়তো এতগুলো পরিবারের কথা ভেবে সরকার একটা সিদ্ধান্ত ঠিক নেবে। আবার নতুন করে চালু হবে কারখানা।

এবার কারখানার বাইরে প্রাচীন বটগাছের নীচে পড়ে থাকা শিলাখণ্ডকে ঘিরে ওঠা মন্দির আর কুসংস্কার মানুষকে পেয়ে বসল। একসময় যখন এই এলাকায় আদিবাসী অধ্যুষিত ছিল তখন ওই পাথরকে বোঙ্গা দেবতা বলে তেল সিঁদুর দিয়ে পুজো করত।

সে আজ বহুদিন আগেকার কথা। তারপর এখানে কারখানা তৈরি হয়। ইংরেজদের বসবাস শুরু হয়। সেসব আদিবাসীও কোথায় চলে যায়। সেই সময় সেই পাথরখানাও অনাদৃত হয়ে পড়ে থাকে।

হঠাৎ কোনো গাঁজাখোর ওখানে একদিন গাঁজার নেশায় স্বপ্ন দেখে। ওইটা পাথর নয়—স্বয়ং বাবা মহাদেব। আর্তজীবের উদ্ধার কল্পে এখানে অধিষ্ঠিত হয়েছে শিলারূপে, সেই জয়ধ্বনি দেয়।

—ব্যোম। হর হর মহাদেব।

ত্রিশূল গড়িয়ে ওকে পুঁতে দিল। ক্রমে দুচার জন ভক্ত জুটে গেল। শুরু হল তাদের গাঁজার ঠেক।

সেই গাছতলার পাথরটা এখনও অঞ্চলের জাগ্রত দেবতা। আর তার পূজারী ওই গাঁজাখোর গুপীনাথ। সেখানে মন্দির গড়ে উঠে। শিবরাত্রির দিন সারা টাউনশিপের মেয়েরা শিবের মাথায় জল ঢালে। এখন সেই গুপীনাথ প্রচার করে,

—বাবা অভয় দিয়েছেন, এই কারখানা তার ত্রিশূলের চাপে রয়েছে একে তোলে কার সাধ্য। বাবাকে ডাকো। বাবাই এই কারখানাকে আবার মজবুত করে গড়ে দেবেন।

কথাটা সারা টাউনশিপে ছড়িয়ে পড়ে মুখে মুখে। এখন বাবুদের মানসিক জোর নিঃশেষ হয়ে গেছে। বউ-ঝিরাও চিন্তায় পড়েছে। কারণ কারখানা বন্ধ হয়ে গেলে এরা সব কোথায় যাবে জানে না। মোহনলাল, রতনের দলও মিটিং মিছিল করে। ভাষণ দিয়েছে। কিন্তু শ্রমিকদের আর কোনো আস্থা নেই তাদের উপর। মোহনলাল তবু চাঁদা তুলে দিল্লি যাবার কথা ঘোষণা করতেই বেশ কিছু শ্রমিক গর্জে ওঠে,

—শালা চোর, এতদিন ধরে লুঠপাট করেও মন ভরেনি, আবার চাঁদা চাই।

একজন গর্জন করে,

—ওই শালাই শেষ করেছে। মার শালাকে—।

অধৈর্য শ্রমিকরা পাথর ছোড়ে। অন্য সময় হলে মোহনলালের লোকজন তুলে এনে পিটিয়ে সোজা করে দিত। মোহনলালের বিরুদ্ধে কথা বলতে গিয়ে অনেকেই মার খেয়েছে।

আজও মোহনলাল মেজাজ নিয়ে বলে,

—কে রে?

এবার একজন জবাব দেয় তোর বাপ। শালা—

তারপরই ছুটে আসে বেশ কয়েকটা আধলা ইট পাথরের টুকরো। মোহনলাল ভাবতে পারেনি প্রকাশ্য সভায় এইভাবে তাকে কেউ আক্রমণ করবে।

তেলিয়া বিচ্ছুরাও এখন মোহনলালের সঙ্গে নেই। ওরা অন্য দলে যোগ দিয়েছে। তারা পাশে নেই। এবার উত্তেজিত জনতা আক্রমণ করে মোহনলালকে, এতদিনের হয়ে থাকা ক্ষোভ ফেটে পড়ে জনতার। মোহনলালের কপাল মন্দ। একটা ইট তার কপালে গিয়ে পড়েছে। চশমা ছিটকে পড়ে।

ওর দু-চারজন চ্যালা বেগতিক দেখে পালায়। মোহনলালও পালাবার চেষ্টাই করে। এখন সে বুঝেছে কতখানি অসহায় সে। কোনোমতে জিপে গিয়ে ওঠে।

জিপটা ওকে নিয়ে ভিড়ের মধ্যে কোন গতিকে পালায়। তখনও ক্ষুব্ধ জনতা গর্জন করছে।

—মার শালাদের। ছুটিয়ে দে ব্যাটাদের ন্যাতাগিরি।

মানুষ আজ ওদের উপরও আশা হারিয়েছে। তাই তারাও একটা নির্ভরতা খুঁজছে। যেখানে তারা পাবে বাঁচার আশ্বাস। ওই মহাদেবের আশ্বাস তাদের কানে এসে বাজে। তাই এবার তারাও এসেছে। ওই মন্দিরে অনেকেই এবার মানত করে।

—বাবা, কারখানা টিকিয়ে রাখো বাবা। ঘটা করে পুজো দেব।

অনেকেই আসে মন্দিরে, এবার গুপীনাথও হুঙ্কার ছাড়ে,

—বাবা। দয়া কর বাবা। তোর চরণতলে পড়ে আছে এরা, এদের রক্ষা কর। জয়বাবা ভোলানাথ।

মহোৎসবও শুরু হয়। মন্দিরে। মানুষগুলো যেন দিশাহারা হয়ে গেছে, গুপীনাথও এই অবসরে বাবার জয়ধ্বনি দেয়। বেশ দু-পয়সা রোজগার করে নেয়। আর গাঁজা খেয়ে উদ্দাম নৃত্য করে, বাবার আরতি করে।

বিজনও দেখেছে এসব। তার মনে হয় এটা যেন একটা অসহায় মনোভাবেরই পরিচয়। আজ বাস্তব পরিস্থিতিকে এরা মেনে নিতে পারছে না। এতদিন যাদের বিশ্বাস করেছিল তারা যে বিশ্বাসের পাত্র নয়, সেটাই বুঝেছে এবার। অরণ্য দেবতার আশ্রয় নিয়ে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে।

অবিনাশবাবু অবশ্য যায়নি। কমলা বলে,

—বাবা মহাদেবের পুজো দিতে যাবে না? ওগো বাবা ইচ্ছা করলে সব বিপদ দূর করে দিতে পারে। সকলেই যাচ্ছে,

প্রতিমা বলে,

—বাবা মহাদেবের আর কাজ নেই কারখানা বাঁচাতে আসবে?

বিজন বলে,

—ঠিক বলেছ প্রতিমা।

অবিনাশ বলে—কী করব তাই ভাবছি।

ছোট খোকন এখন হাঁটতে পারে। অবিনাশের মনে হয় ওই ছোট শিশুও যেন তাকে আবার একটা মায়ায় জড়িয়েছে। তাই ভাবনা হয় ওর ভবিষ্যৎ নিয়ে। কিন্তু বয়স হচ্ছে তার সেই সামর্থ্য থাকলে আবার যে ভাবে হোক দিন চালিয়ে নিত। কিন্তু তাও নেই। তাই অসহায় বৃদ্ধ আজ চিন্তায় পড়েছে। অবিনাশ বলে,

—মনে হয় গ্রামেই ফিরে যাই। তবু সেখানে জায়গা জমি আছে। দুবেলা ভাতও জুটবে। এখানে কীভাবে চলবে জানি না। দোকানও তুলে দিতে হবে।

বিজন বলে,

—এত ভাবছেন কেন? দেখুন না কী হয়।

প্রতিমা বলে,

—বাবাকে তাই বল বিজনদা। বাবা এত সহজে ভেঙে পড়েন কেন বুঝি না।

অবিনাশের চোখে জল নামে। খোকনকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলে,

—জীবন যে এমনি করে আবার বাঁধনে জড়িয়ে ফেলবে তা ভাবিনি মা।

হঠাৎ কলরব শোনা যায়। মোহনলাল আহত, রক্ত ঝরছে। জিপ নিয়ে পালাচ্ছে। পিছনে ক্রুদ্ধ জনতা। আজ তারাও চিনেছে মোহনলালকে। তাই এবার ওর শয়তানির জবাব দেয়। জানলা দিয়ে দেখছে অবিনাশ-বিজন, পলায়মান মোহনলালকে। প্রতিমা বলে,

—আগে ওকে চিনতে পারলে হয়তো অনেক সর্বনাশকে এড়ানো যেত বাবা।

অবিনাশও তা জানে। কিন্তু বেশ বুঝেছে সে যা ঘটার তা ঘটবেই। তাই ওদের পরিবারে এই সর্বনাশ ঘটেছে। একে এড়ানো যেত না। এ ছিল তার ভবিতব্য।

.

এত পূজা এত প্রার্থনা সবই ব্যর্থ হয়েছে। সেদিন জরুরি খবর আসে এই মাসের মধ্যেই কারখানার কর্মীদের স্বেচ্ছা-অবসর নিতে হবে। সকলকেই। অর্থাৎ এরপর সরকার কারখানা বন্ধই করে দেবে। একখানা কয়েক লাইনের চিঠি সারা টাউনশিপের মানুষের সামনে এনেছে মৃত্যুর পরোয়ানা। একশো বছর আগে এক জার্মান ভদ্রলোক যে কারখানা গড়েছিল তা ইংরেজের জমানাতে টিকেছিল। তারপর এল স্বাধীনতা, স্বাধীন ভারতের বুকেও তার অস্তিত্ব এতদিন ছিল। কিন্তু এবার সব শেষ হয়ে গেল।

খবরটা মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে। টাউনশিপের বাজারে দোকানে পথে ঘাটে সে একই আলোচনা চলে। বাজারে ক্রেতা আর নেই, সবাই এসেছে কারখানার গেটে। সাহেবরা এসেছে। মিঃ মিত্র, আর মিঃ আগরওয়ালারা আগে থেকেই পুলিশ প্রহরার ব্যবস্থা করেছে। সেদিন উত্তেজিত শ্রমিকদের মোহনলালকে আক্রমণ করতে দেখেছে তাই এবার এইসব সাহেবরাও ভীত।

কারখানার উপর তাদের উপর মামলা হতে পারে। সেই থেকেই ওরা কড়া পাহারা বসিয়েছে সর্বত্র। কিন্তু আজ ওই ক'লাইনের চিঠিই শ্রমিকদের কর্মচারীদের মনোবল একেবারে ভেঙে দিয়েছে।

আজ তাদের পাশে সেই নেতারাও কেউ নেই। ফ্যাক্টরির কাজ বন্ধ হবার পর থেকে তারাও বিশেষ আসেনি। মোহনলাল একাই এসেছিল। তাকেও ওই ভাবেই ফিরিয়ে দিয়েছে শ্রমিক-কর্মচারীরা। আজ তারা নীরবে। এটা মেনে নিতে বাধ্য হয়।

তবু এবার নিজেরাই আলোচনা করে তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে। আর করার কিছুই নাই নীরবে আত্মসমর্পণ করতে হবে। তাই সারা টাউনশিপে নেমেছে মৃত্যুর স্তব্ধতা।

অফিসার্স ক্লাবের আলোগুলোও আজ জ্বলেনি। টেনিসের লনে সাহেবদের, মেয়ে বউদের র‍্যাকেট হাতেও দেখা যায় না।

বাবুদের রিক্রিয়েশন ক্লাবের মাঠে দুচারজন বসে আছে। কোলাহল কলরব নেই। বিজন সাইকেল নিয়ে চলেছে সীমাদের গ্রামের দিকে। উইলসনও খবরটা পেয়েছে। সে এখন ওদিকে তার সেই খড়ের বাংলোতে থাকে। সীমাও এসেছে, তাদের কারখানার প্রসঙ্গে কথা হচ্ছে, নতুন অর্ডারও এসেছে বিদেশ থেকে।

বিজনকে ঢুকতে দেখে চাইল ওরা। উইলসন বলে—

—কি বিজন! কারখানার চাকরি তো গেল! এবার পুরোদমে এখানের কাজ শুরু করো। তখনই বলেছিলাম যেভাবে কারাখানা চলছে তাতে আর বেশিদিন চলবে না।

বিজন বলে,

—নিজের দোষেই এই সর্বনাশ হলো।

উইলসন বলে,

—সবটা তোমাদের দোষে নয়। অবশ্য কিছুটা ছিল। তবে কারখানাকে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে সময়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে হয়। আধুনিক মেশিনারি দরকার তাতে লোকের কাজ কমে গেলেও তা করতে হবে। সেইটাই করা হয়নি।

বিজন বলে,

—ওই বিশ্বায়ন-এর জন্য দায়ী। উন্নতশীল দেশ একটা বড় দেশের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না। তারাই আমাদের সব বাজার দখল করে নিল, আমাদের ছোট বড় সব শিল্প মার খেল। অতীতে আমরা ইংরেজের অধীন ছিলাম, এখন আবার নতুন করে আমেরিকার কাছে মাথা বিক্রি করে না দিতে হয়।

—নো। উইলসন বলে—নেভার। ভারতের মাটিতে একটা নিদারুণ শক্তি লুকিয়ে আছে বিজন—সেই শক্তির সঠিক ব্যবহারের কথা কোনো সরকারই ভাবেনি। সেই শক্তিকে কাজে লাগাতে পারলে ভারত তার নিজের মাথা উঁচু করেই থাকবে। এই ছোট পরিসরে কি সেই শক্তির ক্ষমতা দেখনি? এখন সেইটাকে বৃহত্তর স্বার্থে কাজে লাগাতে হবে।

সীমার এই সমবায় কারখানা আজ এক আলোর দিশা। এখানের বহু লোকের মুখে অন্ন জুগিয়ে চলেছে। উইলসন বলে,

—এবার আমরাই ওই স্ল্যাগের পাহাড় লিজ নিচ্ছি—এখানে সিমেন্ট কারখানা করছি। কারখানা যাক্—ম্যান সাহেব যে স্ল্যাগের পাহাড় রেখে গেছেন তার থেকেই কোটি টাকার জিনিস হবে।

সীমা বলে,

—সে রকম একটা প্রজেক্ট করুন মিঃ উইলসন। আমিও ব্যাঙ্কের সঙ্গে কথা বলেছি, ওরাই বেশির ভাগ টাকাটা দেবে।

উইলসন বলে,

—ওসব হয়ে যাবে সীমা। বিজনও হাত লাগাবে আমার সঙ্গে। আমি আরও কয়েকজনকে বাছাই করে নেব ওই কারখানা থেকে।

রাত নামে। সীমা ফিরছে বাড়িতে। বিজনও সঙ্গে রয়েছে। এবার বিজনই কলকাতায় কাজের চেষ্টা করছে। এখন ওর ভাইরাও চাকরি বাকরি করছে। বোনের বিয়ে দিয়েছে, বাড়ির দিক থেকে এখন খানিকটা দায়মুক্ত। সে ভাবে এখানের চাকরি তো যাবেই। এই ভেবে সে কলকাতায় কাজের চেষ্টা করছিল। আর একটা

পত্রিকা অফিসে কাজও পেয়েছে। তবে মাইনে এখানের থেকে কম, কোনোমতে থাকা যাবে কলকাতায়।

তবু লেখার কাজ করতে পারবে। আবার নতুন করে তার লড়াই শুরু হবে। বিজন বলে,

—কলকাতায় একটা পত্রিকা অফিসে কাজ পেয়েছি।

সীমা চাইল ওর দিকে। রাতের স্তব্ধতার মাঝে একটা রাতজাগা পাখি আর্তনাদ করে ওঠে। ওদিকে কারখানা শহরের বুকে নেমেছে স্তব্ধতা। বনের ধারে ওদের ফায়ার ক্লে-র মাইন থেকে আলো জ্বলছে নিঃসঙ্গ অবস্থায়।

সীমা বলে,

—কলকাতায় কাজ পেয়েছ!

বিজন বলে—তেমন স্থায়ী কাজ কিছু নয়। খবরের কাগজে, অফিস তো নতুন। তাই তেমন কিছু দামি চাকরিও নয়। তবে কলকাতায় থাকতে পারব লেখালিখির কাজও করতে পারব। কোনো মতে দিন চলে যাবে। এখানের প্যালা তো চুকে গেল।

সীমা বলে,

—উইলসন সাহেব তো সিমেন্ট কারখানা করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছেন। কোটি টাকার প্রোজেক্ট। তো ভরসা পাচ্ছেন না। তুমিও চলে যাবে এই সময়।

বিজন জবাব দেয় না।

সীমার চোখের তারায় নীরব এক ব্যাকুলতা। ওদের পরিচয় বহু দিনের। নিতাইবাবু তখন কর্মঠ। বিজনকে তিনি উৎসাহ দিয়েছিলেন আরও কিছু করার জন্য। তার লেখার একনিষ্ঠ পাঠক ছিলেন। নিতাইবাবু বলতেন—দেখবে যুগ পরিবর্তন হবে। নতুন আনন্দ বেদনার ঘটনাও ঘটবে। তুমিও তার সাক্ষী থাকবে। বিজনও তার উৎসাহে নতুন করে লিখে চলেছে তার সাহিত্যের পটভূমিকা এই কোলিয়ারি এই কারখানা। চরিত্র এখানের মানুষ আজ এই জগৎ ছেড়ে চলে যেতে হবে বিচিত্র এক নগর জীবনে যে জীবনকে সে মেনে নিতে পারেনি।

তবু সেখানেই যেতে হবে তাকে। সীমা বলে,

—কী ভাবলে? চলেই যাবে এখান থেকে।

বিজন বলে,

—যেতে ভালো লাগছে না। তাই ভাবছি কী করব?

গাড়িটা এসেছে সীমার বাড়ির কাছে। সীমা বলে—রাত হয়েছে। আমি চলি। গাড়ি তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে। কাল আসছ তো?

বিজন বলে—আসব।

—এসো, আর এর মধ্যে ভেবেচিন্তে ঠিক করো কী করবে? এই অস্থায়ী চাকরির উপর ভরসা করে কলকাতায় গিয়ে কী করবে সেটাও ভেবো। চলি—

সীমা চলে গেল। বিজন ভাবছে কথাটা ওর চলে যাবার কথায় সীমা যে খুশি হয়নি সেটা ওর কথাতেই ফুটে উঠেছে আর সেই অসুখী ভাবটা বিজনেরও নজর

এড়ায়নি।

বিজন ভাবছে, উইলসন সাহেব যখন ধরেছে তখন সিমেন্ট ফ্যাক্টরি বানাবেই। আর ও সেই কারখানা ঠিক মতো চালাবে। আজকের শিয়ালডাঙার ধ্বংসস্তূপের পাশে নতুন করে গড়ে উঠবে, ওই কারখানা। উইলসন যে হারেনি, সে কিছু গড়তে পারে এখানের মানুষের জন্য। এটা দেখতে পায় বিজন। তাই সে কথাটা ভাবছে।

কারখানার অফিসে ভিড় করেছে শ্রমিকরা-বাবুরাও। সাহেবদের সেই উদ্ধত মেজাজও আজ নেই। তাদের সুখের দিন শেষ। যে দাবানলে আজ সমস্ত অরণ্য ঝোপঝাড় তরুদল ঘাস পুড়েছে সেই আগুনে জ্বলে ছাই হয়েছে সমীরুহ বনস্পতিও।

যাদের চাকরি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে তারা সহজেই স্বেচ্ছা-অবসর নিয়ে ফর্ম সই করে দিয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে যাদের মাত্র আট দশ বছর চাকরি হয়েছে, তাদের তো সারাজীবন পড়ে আছে, অনেকে বিয়ে থা করে সংসারও করেছে। ছেলেপুলেও হয়েছে। তাদের কী হবে?

বিজনও ভেবেছে কথাটা, তার চাকরি হয়েছে ন' বছর মাত্র। অবশ্য বিয়ে-থা করেনি, দায়দায়িত্ব তত নেই। তবু নিজেকে তো বাঁচতে হবে। এদের দলই প্রতিবাদ করে।

—আমরা ওই ফর্মে সই করব না।

বিজন বলে,

—তাহলে কোম্পানি তাদের হুকুম মানেনি বলে এক মাসের মাইনে ধরিয়ে দিয়ে স্যাক করে দেবে। অনেকে সেই কথাটাই ভাবছে। মিত্র সাহেবও বলেন,

—এমন ক্ষমতা আছে কোম্পানির।

অর্থাৎ তাদের এই ভাবে তাড়ানোর আইন আছে। ওরা ভাবছে কথাটা। মোহনলাল ঝড়ের আগে উড়ে আসা খড়কুটোর মতো হাজির হয়েছে। সে এখনও হাল ছাড়েনি। তার দলের কিছু লোককে সে বলে,

—একদম সই করবে না। আমরা আন্দোলন করব। দরকার হলে দিল্লি যাব। মন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন দেব। কারখানার প্রায় তিনহাজার কর্মীর মধ্যে আড়াই হাজার লোক ফর্ম সই করে দিয়েছে। তারা আর আন্দোলনে আগ্রহী নয়। বাকি শ'পাঁচেক লোক এখন নিজেদের অসহায় বোধ করে।

বিজনই বলে,

—মোহনবাবু, আপনি আমাদের জন্য অনেক করেছেন। মোহনবাবু বলে,

—আজও আমি তোমাদের পাশে থাকতে চাই। সংগ্রাম করতে চাই।

কেউ একজন বলে ওঠে,

—ওটা করেই তো আজ এখানে এনে দাঁড় করিয়েছেন। দয়া করে এবার যান। যা করার তা আমরাই ভেবেচিন্তে করব। মোহনলাল বলে,

—তবু একসঙ্গে দাবি জানালে একটা গুরুত্ব বাড়তো।

বিজন বলে—তার দরকার নেই।

ওরা সকলেই একে একে ফর্মপূরণ করে সই করে দেয়। ওরাও জেনে গেছে

কারখানা বন্ধ করবেই সরকার। তাকে আটকানোর সাধ্য আর নেই।

শিয়ালডাঙা আয়রন ওয়ার্কস্-এর মৃত্যুঘণ্টা বেজে গেল। কারখানার মধ্যে দিনরাত কাজ হতো। বিস্তীর্ণ এলাকা মুখর হয়ে থাকতো মানুষের কলরবে। যন্ত্রের নানা ধাতব শব্দে, ক্রেনগুলো ভারীভারী মাল নিয়ে যাতায়াত করতো।

এখন সেখানে শ্মশানের নীরবতা নেমেছে। সব আওয়াজ সব ব্যস্ততা থেমে গেছে। শুধু বিশালাকার কারখানা তার যন্ত্র দানবগুলিকে সাক্ষী রেখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তারা এই ধ্বংসের নীরব সাক্ষী, আর তারা কোনোদিন চলবে না। ক্রমে ঘুনো আগাছালতা তাদের শীতল নিশ্বাসে গ্রাস করে মৃত্যুর উপত্যকায় পৌঁছে দেবে।

সবাই চলে গেছে সব শান্ত। দুপুরের রোদ্দুর শুধু ঝাঁ ঝাঁ করছে। কয়েকজন পাহারাদার সেই মৃত কারখানার শবদেহ আগলে রয়েছে। চারিদিকে মৃত্যুপুরীর স্তব্ধতা।

বাবুদের অনেকেই মাঝে মাঝে অফিসে আসে। অফিসের কিছু স্টাফ পাওনা গণ্ডার হিসাব করতে এখনও আছে। তারাও কদিন বাদে চলে যাবে।

অফিসের সাহেবরা, যেমন—মিঃ প্রধান, মিঃ আগরওয়াল, মিঃ রায় এখন বিষহীন ঢোড়া সাপ। কোম্পানির গাড়ি নেই। বাংলোয় মালি-বেয়ারা, দারোয়ান আর নেই। শুধু তারা এখনও বাংলোয় রয়ে গেছে। তাদের মিসেসরাও স্বপ্নে ভাবেনি যে তাদের দিন এইভাবে শেষ হয়ে যাবে।

মিঃ সহায় এখন চেষ্টা করছে হরিয়ানার ওদিকে একটা ছোট কারখানাতে কাজ নিয়ে চলে যাবার জন্য, এখন মিসেস সহায়কেই বাজারে যেতে হচ্ছে। সহায় কাজের ফাইন্যাল করতে কলকাতায় গেছে। মিসেস সহায় এর আগে হেঁটে রাস্তায় বেরোতেন না। গাড়িতে বসে বাজার করতেন। ড্রাইভার কাজের লোক ব্যাগ, থলে বয়ে নিয়ে বেড়াতো, এখন ওরা কেউ নেই। তাদেরও চাকরি গেছে। মিসেস সহায়, এবার ওই নোংরা বাজারের মধ্যে আনাজপত্র কিনতে ঢুকেছে। লজ্জায় তার মাথা যেন কাটা যায়।

বাজারেও তেমন জমজমাট ভাব নেই। আগের মতো অনেকটা জায়গা নিয়ে বসে না এখন। আগের মতো আশপাশের বাবুরা ক্রেতারা এখন আসে না। আর ব্যাপারীরাও সাহেবদের জন্য দামি আনাজপত্র, অসময়ের ফুলকপি, টমাটো আর চালানী মাছ আমদানি করতো কলকাতা থেকে। ইলিশ পাবদা সবরকমই মাছই মিলতো।

—সেলাম মেমসাব।

ব্যাপারীরা অনেক মেমসাহেবদের চেনে, তাই সেলাম করে। মেমসাহেবের হাতে আজ বাজারের থলে। ওদিকে লোকটা কাটাপোনার দাম হাঁকে—পঞ্চাশ টাকা মেমসাহেব। একদম ফ্রেশ হাফ কিলো দিয়ে দিই। ওরা এই ভাবেই কিনতো, কম পরিমাণ নিতে তাদের সম্মানে বাধতো। আজ তাদেরও হিসাব করে চলতে হচ্ছে। মিসেস সহায় বলে—আড়াইশো দাও।

কথাটা বলতে তারও বাধে। তবু বলতে হয়, আনাজপত্র বাজার নিয়ে তাকে

রিক্সাতেই ফিরতে হয়। ওর মনে হয় পথের দুধারের লোকজন দেখছে ওদের এই দুর্দশা। ওরাও জেনে গেছে আজ এদের গাড়ি বেয়ারাও নেই। ওদের সঙ্গে মিসেস সহায়-এর কোনো পার্থক্য নেই।

কোনোরকমে বাড়ি ফিরে উত্তেজিত মিসেস সহায় বলে— ঢের হয়েছে চলো এখান থেকে। যেখানে রাজত্ব করেছি সেখানে এইভাবে থাকতে পারব না। লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে আমার।

হরিয়ানার চাকরির কী হলো?

—দেখি চেষ্টা তো করছি।

—তাহলে এই ফুটানির বাংলো ছেড়ে শহরেই গিয়ে বাড়ি ভাড়া করে থাকবে, ঢের হয়েছে। বাংলো ছেড়ে যা নেওয়ার নিয়ে কেটে পড়ো।

সেদিক থেকে মিঃ মিত্রের স্ত্রী রীনা অনেক সহজভাবেই এটাকে মেনে নিয়েছে। সে নিজে এর আগে রিকশাতেই ঘুরতো মিশতো সকলের সঙ্গে। বাবুপাড়ার গানের স্কুল, বাবুদের ক্লাবের অনুষ্ঠানেও যোগ দিত।

রীনা এই সর্বনাশটাকে অনেক কাছ থেকে দেখেছে। তাদের কলকাতায় একটা বাড়ি আছে। স্বামী-স্ত্রী দুজনের যা সঞ্চয় আছে তাতে চলে যাবে। কিন্তু সে দেখেছে এখানের কত পরিবার কী বিপদে পড়েছে। চাকরিই ছিল ভরসা ঠাটবাট বজায় রাখতে হতো। তাই কোনমতে চলতো তাদের।

এখন সর্বনাশ নেমে এসেছে। সামনের মাস থেকে আর মাইনে হবে না। এদিকে কোম্পানির অফিস থেকে হিসাব-কিতাব হয়। ওদের পাওনাটুকু পেতে কমাস লাগবে কে জানে। ওদিকে কোয়ার্টার ছেড়ে দিতে হয়েছে।

শিয়ালডাঙার বস্তির ঘরেই এখন ওদের একমাত্র আস্তানা। সেজন্য ওখানের ভাড়া বেড়ে গেছে। কোয়ার্টার ছেড়ে ছেলে-মেয়েদের গ্রামে পাঠিয়ে ওই মানুষগুলো ওখানে মাথা গুঁজেছে। তাদের ওই বাকি পাওনাটুকু পাবার জন্য পড়ে থাকতে হবে।

রীনার গানের স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে। গানের সুরও থেমে গেছে। সন্ধ্যায় এখন আলোও জ্বলে না।

অনেক উৎসাহী সভ্য চলে গেছে। দুচারজন যারা পড়ে আছে তাদেরও আমোদ-আহ্লাদ করার সময় ইচ্ছা কোনোটাই নেই। সুর যেন হারিয়ে গেছে। রীনা বনানীর ওখানে যায়। সেও ওর সমবায়ের কাজে সাহায্য করে। এখন বনানীর সমবায় ওই পরিত্যক্ত ফার্টিলাইজার টাউনশিপ থেকে উঠে গেছে শিয়ালডাঙার ওদিকে সীমাদের গ্রামে। সেখানে গড়ে উঠেছে বড় বড় শেড। ওইদিকে এখন বসেছে বিদ্যুৎচালিত তাঁত। বিরাট শেডে সেলাই মেসিন চলে অনেক। শহরের ব্যবসায়ীদের অনেক কাজই পায় তারা। অন্য শেডে চলছে চামড়ার ব্যাগ, ফোমের ব্যাগ তৈরির বড় কারখানা।

ওদিকের প্রান্তরে গড়ে উঠেছে ফায়ার ক্লে, পোর্সেলিন ফ্যাক্টরি অনেক মেয়েরা

কাজ করে। তাদের জন্য কয়েকটা তিনতলা বাড়িও রয়েছে।

শিয়ালডাঙার প্রদীপ নিভে আসছে।

রীনা বলে বনানীকে,

—তুমি সত্যিই একটা পথ দেখিয়েছ বনানী। আমরা নিজেদের গণ্ডি ছেড়ে বের হতে পারিনি। তুমি তা পেরেছিলে।

বনানী বলে,

—একটা আঘাতই আমাকে এই পথের সন্ধান দিয়েছিল। আমার মনে হয় স্বাধীনতা পাবার পর দেশের মানুষের যা করা উচিত ছিল সেটা করেনি। তাই এখন তার জন্য খেসারত দিতে হচ্ছে। এই আঘাতের দরকার ছিল এবার আগামী দিনের মানুষ হয়তো দেশের কথা বাঁচার কথা নতুন করে ভাববে। এই সমাজে একা আমি বাঁচব সুখে থাকব এটা ভাবাও ভুল।

রীনা দেখছে ওই কর্মীদের, মেয়েদের—ওরা আজ পথের ঠিকানা পেয়েছে। হঠাৎ কার ডাকে চাইল রীনা।

—নমস্কার।

রীনা দেখছে উইলসনকে। লোকটা কিন্তু আমোদেই আছে কাজ নিয়ে। ওদের নতুন সিমেন্টের কারখানা তৈরি হচ্ছে।

সীমাও বলে রীনাকে,

—চলুন দেখে আসবেন সাইটটা। আপনাকে পেলে আমাদের সমবায় আরও এগিয়ে যাবে।

রীনার মনে হয় মৃত শিয়ালডাঙার বুকে এরা নতুন জীবনের আশ্বাস এনেছে। কিন্তু তার থাকার উপায় নেই। মিঃ মিত্র ঠিক করেছেন চলেই যাবেন। এখানে এই স্তব্ধ পরিবেশে এই বাংলোয় রাজ্যহারা রাজার আর থাকা চলবে না।

মিত্র সাহেবকে রীনা বলে,

—পালিয়ে যেতে চাও লড়াইয়ের ময়দান থেকে। তোমাদের মিঃ উইলসনের কাছে শিক্ষা নেওয়া উচিত। দেখোগে ক'বছরে তোমরা এই জীবন্ত কারখানাকে শ্মশানে পরিণত করেছ। আর মিঃ উইলসন সব হারিয়ে নিজের জীবনের সব সুখশান্তিকে বিসর্জন দিয়ে আবার নতুন করে গড়ার কাজ করছেন। হাজার হতভাগ্য মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর চেষ্টা করছেন।

আজ মিঃ মিত্রও হেরে গেছেন। তিনি এই সর্বনাশকে রুখতে পারেননি—নিজেদের স্বার্থের কথাই ভেবেছিলেন। সেটা বুঝেই বলেন—কথাটা সত্যি রীনা, আমরা নিজেদের কথাই ভেবেছিলাম। সকলকে নিয়ে বাঁচার কথা নয়। আজ তাই উইলসনকে শ্রদ্ধা করি। ও সত্যি ভারতবর্ষ আর তার মানুষদের, আমাদের চেয়ে ঢের বেশি ভালবেসেছে। তাদের মঙ্গলের কথা চিন্তা করেছে।

টাউনশিপ শূন্য হয়ে আসছে। কারখানার ভোঁ বন্ধ, বহু বাংলো কোয়ার্টার খালি হয়ে যাচ্ছে। আলো জ্বলে না সেখানে। পথে তবু কোম্পানির আলো কিছু জ্বলে।

এর মধ্যে বেশ কিছু প্রাচীন গাছ কারা কেটে নিয়ে গেছে। রাতের অন্ধকারে নাকি কারখানার মালপত্র পাচার হয়। প্রহরীদের সঙ্গে তাদের দু একবার গুলিগোলাও চলেছে। তাই রাতের বেলায় পথে লোকজনও প্রায়ই নেই। বিজনের হোস্টেলও শূন্য হয়ে আসছে। এবার রান্নার ঠাকুর চাকরও বিদায় নেবে। তারা শহরে কোন হোটেলে চাকরি পেয়েছে। বিজনকেও এবার নতুন ঠিকানার খোঁজ করতে হবে। কলকাতাতেই চলে যাবে সে। তার হোস্টেলের একবন্ধু কলকাতায় চাকরি নিয়ে এক মেসে থাকে। আপাতত তার ওখানেই উঠবে সে। এতদিন এমনি ছিল। এই ছায়াঘন পথ, সাজানো শহর সব কেমন বিশ্রী হয়ে গেলো।

সেদিন রাতে অবিনাশবাবুর বাড়ি থেকে ফিরছে বিজন। অবিনাশবাবুর দোকান বন্ধ। প্রতিমার চাকরিটাই ভরসা, অবিনাশবাবু বলেন—মা তোমায় কিছু দিতে পারিনি। তোমার অন্ন আর কত খাব? খোকনকেও মানুষ করতে হবে। তুমি এখানেই থাকো। আমরা দেশেই ফিরে যাই। দুজনের খরচটা তো বাঁচবে।

প্রতিমা অবাক হয়, সে জানে ওই বৃদ্ধ প্রাণ দিয়ে খোকনকে ভালবাসে। তাই বলে,

—খোকাকে রেখে চলে যাবেন বাবা? আমি তো কাজে যাব ও কার কাছে থাকবে?

—তোমার মা তো আছেন!

অবিনাশবাবুর কথায় প্রতিমা বলে,

—না বাবা, ওদের সঙ্গে সম্পর্ক যখন ছেড়েই এসেছি আর সেখানে ফিরতে চাই না। তাছাড়া খোকনও আপনাকে ছেড়ে থাকতে কষ্ট পাবে। অবিনাশবাবুর চোখে জল নামে। তিনি বলেন,

—মা! কিছু পাবার স্বপ্ন তো দেখি কিন্তু যাদের কিছুই নেই তাদের কিছু পাবার অধিকারও নেই। তাই আমার সবই হারিয়ে যাবে।

প্রতিমা বলে,

—না বাবা, আপনারা যাবেন না। আজ আপনার ছেলে নেই আমি তো আছি।

বিজন ঢোকে, সে শুনেছে প্রতিমার কথা। তার মনে হয় চিরন্তন কোনো মা তার সর্বহারা সন্তানকে আশ্বাস দিচ্ছে। বিজন বলে,

—কাকাবাবু প্রতিমা ঠিক কথাই বলেছে। এই ভাঙনের মাঝে ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবেন না। একসঙ্গে লড়াই করতে হবে।

প্রতিমা বলে,

—কিন্তু তুমি কী করলে বিজনদা।

—মানে!

—তুমি পালিয়ে যাচ্ছো কেন কলকাতায়? আজ নতুন করে এত বড় কাজের ভার নিয়েছে সীমাদি। উইলসন সাহেবও বলছিলেন তোমার কথা। তুমি এখানেই কাজে না গিয়ে কেন কলকাতার মোহে দৌড়ছো? নিজের উন্নতির জন্য?

বিজন চমকে ওঠে। সে এভাবে কথাটা ভাবনি। সীমাও তাই চায়। কিন্তু বিজনের

তার দয়া নিতে বাধে। আজ সে বেকার, কাজের জন্যই তাকে শহরে যেতে হচ্ছে।

প্রতিমাও সবই শুনেছে। সীমার সঙ্গে ওর পরিচয়ের কথাটাও জানে অনেকে। কিন্তু বিজন কোনোদিন কিছুই চায়নি। আজও সে সীমার দয়া নিতে চায়নি। তাই সরেই যাচ্ছে। তবু সীমার কথা মনে পড়ে বারবার। ফিরছে বিজন নিজের হোস্টেলের দিকে। পথঘাট শুনশান, বাতাসে গাছের পাতার শব্দ ওঠে। হঠাৎ পথের আলোও নিভে যায়। পূর্ণিমার কয়দিন আগের তিথি। আকাশে চাঁদের আলোও রয়েছে। ছায়া পড়েছে পথের উপর। পথটা ওদিকে কারখানার গেটের দিকে চলেছে। ওদিকেই ছিল সেই বন্ধ বহুকাল আগেকার পরিত্যক্ত কোলিয়ারী চানক।

হঠাৎ একটা ছায়ামূর্তির মত কাকে দেখেছে বিজন। একট দীর্ঘকায় লোক। পরনে আগেকার আমলের কোটপ্যান্ট আর টুপি। ছায়ামূর্তিটা পায়ের শব্দ তুলে চলেছে পথ দিয়ে। আবছা দেখা যায় মূর্তিটা তবে স্পষ্ট হয় তার পায়ের শব্দ। ওই মৃত পরিত্যক্ত কারখানার দিকে চেয়ে থাকে মূর্তিটা দেখতে থাকে ভাঙা চিমনি—শেডগুলোকে। বাতাসে তার চাপা দীর্ঘ নিশ্বাস শোনা যায়। আবার সামনে চলতে থাকে। বিজনের সারা শরীরে রোমাঞ্চ জাগে।

মূর্তিটা ওই চানকের কাছে এসে শূন্যে মিলিয়ে গেল। আর কিছু দেখা যায় না। বাতাসে পাতার মর্মর ধ্বনি ওঠে।

বিজন চমকে ওঠে। তবে কি ম্যান সাহেবের অতৃপ্ত আত্মা এই পরিত্যক্ত খবর পেয়ে দেখতে এসেছিলেন। আজও তার বুকে জাগে দীর্ঘশ্বাস। যেদিন ইংরেজ তার থেকে কেড়ে নিয়েছিল, এই কারখানা তারপর স্বাধীন ভারতে এই কারখানার পুনরুত্থানের আশা করেছিলেন তিনি। কিন্তু আজ সব শেষ। সব হারিয়ে গেছে। তাঁর ব্যথিত আত্মা আজ আবার নতুন করে দুঃখ পেয়েছে। তাঁর হয়ত মুক্তিই ঘটবে না। সেই মহান আত্মা চিরপিপাসিত—অতৃপ্ত থেকে যাবে। বিজন তার দীর্ঘ নিশ্বাস শুনেছে। দেখেছে মাথা নীচু করে আজ সে ফিরে গেছে অদৃশ্য লোকে। আর কেউ কোনোদিন তার নাম করবে না। জানবে না তার বেদনার কথা।

বিজন সেই বিদেশির দীর্ঘশ্বাসে বেদনার ছায়া দেখেছিল। সীমাও এ পরিস্থিতির কথা ভাবে। তার সঙ্গে বিজনের বহুদিনের পরিচয়। অনেক ঘনিষ্ঠ তারা। সীমা জানে বিজনের অবস্থার কথা। তবু সে তার কাছে কিছুই চায়নি। নিতাইবাবু বলতেন—

—সে সোনার টুকরো ছেলে রে। সৎ-কর্মঠ, ওর উপর ভরসা করা যায়, ওরা জীবনে হারবে না কোনদিন।

সীমাও সেই কথাই ভাবছে। এত বড় কর্মযজ্ঞ শুরু করেছে। উইলসনও বলে সীমাকে।

—ওকে আনো সীমা। আমার বয়স হচ্ছে আমিই ওকে সব শিখিয়ে পড়িয়ে নেবো। ওইই তোমার স্বপ্নকে সফল করতে পারবে।

সীমা কাজের কথাই ভেবেছে এতদিন। নিজের মনের অতলে সেই স্বপ্নের কথা

ভাবার সময় পায়নি। এবার তাকে একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। জেঠুমণির কথাটা বারবার তার মনে পড়ে। মৃত্যুর সময়ও বলেছিলেন—বিজন, সীমার পাশে কেউ নেই। তুমিই ওর পাশে থাকবে।

সীমাও আজ পেতে চায়। হারাতে চায় না বিজনকে। বারবার মনে পড়ে বিজনের কথাই।

বিজন ফিরছে হোস্টেলের দিকে। আজ ওখানে তার শেষ রাত্রি এতগুলো বছর কেটেছে এখানে। জড়িয়ে আছে কত স্মৃতি। কাকাবাবুর ওখানে প্রথম এসে উঠেছিল চাকরি করতে এসে।

আজ তাই শেষবারের মতো দেখা করতে গিয়েছিল বিজন। কাকাবাবুও জানেন না কোথায় কী ভাবে কাটবে তাঁর জীবনের শেষদিনগুলো। নগ্ন অভাবের ছায়া ঘিরেছে ওদের সংসারে। একা প্রতিমা কত লড়াই করবে। তাই অবিনাশবাবুকেও চলে যেতে হবে। ওদের কষ্টের অন্নে আর তারা ভাগীদার হতে চান না।

বিজনের মনে হয় এসময় এদের জন্য তারও করার কিছু ছিল। কিন্তু উপায়ও নেই। তার জগতেই সে হারিয়ে যাবে। অবিনাশবাবু অবশ্য তার কাছে কোনো কিছুই চাননি। বিজন প্রণাম করে—কালই চলে যাচ্ছি কাকাবাবু।

অবিনাশ ওকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। বেদনায় তার চোখ দুটো জলে ভরে ওঠে। অশ্রুভেজা সুরে বলেন,

—সবাইকে একদিন হারিয়ে যেতে হয় বিজন। আমিও হারিয়ে যাব, তবু আশীর্বাদ করি যেখানেই থাকো সুখে থাকো। সুখের সন্ধান আমি পাইনি। তুমি যেন পাও বাবা।

বিজনের চোখেও জল নামে। আজ মনে হয় তারও অনেক কিছু হারিয়ে গেল। সীমার কথাও মনে পড়ে। চোখের সামনে ভেসে উঠে সেই অশরীরী আত্মার ছবিটা। তারও একদিন সব কিছু হারিয়ে গেছল। হোস্টেলে দু'একজন এখনও রয়েছে। তাই আলো জ্বলছে। বিজন দোতলায় তার ঘরে উঠতে যাবে। হঠাৎ ওদিকে লবিতে একটা সোফায় সীমাকে বসে থাকতে দেখে অবাক হয় বিজন।

সীমা এই রাতে তার এখানে আসবে এটা ভাবেনি বিজন। বিজন এগিয়ে আসে সীমার দিকে। সীমাও উঠে আসে ওর ঘরে। ওদিকে বিজনের সুটকেশ ব্যাগ প্যাক করা হয়ে গেছে।

ঘরের জিনিসপত্রও বাইরে ছড়ানো নেই। সীমা বলে—আজই যাবে?

বিজন বলে—এখানের পালা তো ফুরোলো। কালই চলে যাচ্ছি কলকাতায়।

সীমা বলে—চলে যাচ্ছো? কালই!

ওর কণ্ঠে বিষাদের সুর ফুটে ওঠে। বিজন বলে,

—সেদিন তো বললাম সীমা। একটা কাজ তো করতে হবে। এখানের চাকরি তো গেল। চলবে কী করে?

সীমা বলে,

—সেদিন উইলসন তোমাকে কী বলেছিলেন? ওঁর সহকারী হয়ে থাকবে ওই

নতুন ফ্যাক্টরির চার্জে। তোমার উপর আমার একটা ভরসা ছিল বিজন। কাকাবাবুও কথাটা বলেছিলেন।

বিজনও মনে করতে পারে নিতাইবাবুর কথাটা। সেই শ্রদ্ধেয় মানুষটাকে সেও কথা দিয়েছিল। কিন্তু ভেবেছিল সীমার মত ধনীর দুলালী সেই কথার কোনো দামই দেবে না। বিজনও কোনোদিন কোনোকিছুরই প্রত্যাশা করেনি। তাই নিজের পথই নিজে খুঁজে নিতে চেয়েছিল। কলকাতায় যাচ্ছে সে অনিশ্চিতের মধ্যে। সেখানে কী পাবে তা জানে না। তবু চলে যাবার কথা ভাবে সে।

কিন্তু সীমা যে এইভাবে সেই কথার গুরুত্ব দেবে তা ভাবেনি বিজন। সীমা বিশাল একটা কর্মযজ্ঞ শুরু করেছে। আজ সীমাও তাকে ওই কাজের মধ্যে পেতে চায়। সীমা বলে,

—তুমি পাশে থাকবে জেনেই এত বড় কাজে নেমেছি। চারিদিকে তো ভাঙনের পালাই চলছে বিজন। এত সব কারখানা চলে গেল, পরিত্যক্ত শহরগুলো শ্মশানের রূপ নিয়েছে। কিন্তু এই ভাঙনের মধ্যেও আবার নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখাতে চাই। এই কাজে তোমাকেও আমার দরকার।

বিজনও এবার নতুন করে ভাবছে কথাটা। কলকাতায় যেন সে চরম হারকে স্বীকার করেই পালিয়েছিল। কিন্তু সীমা আজ তাকেও যেন নতুন করে সংগ্রামের পটভূমিতে নিয়ে যেতে চায়। যেখানে তারা লড়াই করবে আবার জিতবে। নতুন ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে পারবে। সীমা বলে,

—এসব কথা জানার পরও যদি যেতে চাও তোমাকে বাধা দেব না। শুধু ভাবব আমি ভুল করেছিলাম। জেঠুমণিও তোমাকে চিনতে ভুল করেছিলেন। আমিও মিথ্যা স্বপ্নই দেখেছিলাম—সব মিথ্যা।

সীমার কণ্ঠস্বর বেদনায় ভরে ওঠে। বিজন দেখছে ওকে। এ যেন চিরন্তন এক নারী, যে একজনের কাছে অনেক কিছু পেতে চায়। নিজেকে উজাড় করে বিলিয়ে দেবে। বিজন আজ নিজেকে সব হারানোর পরও পরম ভাগ্যবান বলে মনে করে। তার শূন্য জীবনের পথের ধারে এমন কোনো স্নিগ্ধ সবুজ মরূদ্যান ছিল তা সে জানত না।

সীমা যেন আজ তার নিঃস্ব জীবনের মাঝে অনেক পাওয়ার সন্ধান দিয়েছে, যাকে ফিরিয়ে দেবার সাধ্য বিজনের নেই। বিজন বলে—সীমা! আমি কলকাতায় যাচ্ছি না।

সীমা বলে—সত্যি!

তার অশ্রুসজল চোখ তৃপ্তির ঔজ্জ্বল্যে ভরে ওঠে।

বিজন বলে,

—তোমার পাশেই থাকব। উইলসন সাহেবের মত গুরুর সঙ্গে থেকে নতুন কিছু করার স্বপ্নই দেখবো।

সীমা বলে,

—তুমি আমাদের ছেড়ে যেতে পারবে না তা জানতাম বিজন, তাই বড় মুখ করেই এসেছিলাম তোমার কাছে।

রাত নামে। স্তব্ধ মৃত্যুপুরীর বুকে বয়ে যায় ঝড়ো হাওয়া। শূন্যতার হাহাকার জাগে। এর মাঝে দুটি মন আবার নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখে।

কার্তিকবাবু-রতন এবার বিদায়ী সাহেবদের শেষ প্রণামী দিয়ে এই জীর্ণ কারখানার শেড মালপত্র যন্ত্রপাতি সব পুরোনো লোহার দরে কলকাতার কোনো লোহার কারবারীকে বিক্রি করে দেবার ঠিকা নিয়েছে।

ওদিকে বিস্তীর্ণ পাহাড় প্রমাণ উঁচু কয়েক মাইল ধরে জমে থাকা স্ল্যাগ ব্যাঙ্কের ইজারা নিয়েছে নতুন সিমেন্ট কোম্পানি। ওরা এবার সেখানে ক্রাশার বসিয়ে ডিনামাইট চার্জ করে সেই পাহাড় থেকে মাল বের করে ক্রাশিং প্লান্টে সাইজ মত ভেঙে ফ্যাক্টরি পাঠাচ্ছে বিরাট কনভেয়ার লাইনে। ওর থেকেই সিমেন্ট তৈরি হচ্ছে।

এদিকে পুরোনো কারখানাকে ভাঙছে ওরা—ভেঙে পড়ছে বহু কালের তৈরি শেড, ম্যান সাহেবের আমলের বিদেশি লোহা যন্ত্রপাতি চিমনিটাও ভেঙে পড়ে। সব মালপত্র ট্রাক বোঝাই হয়ে চলে যাচ্ছে। ক্রমশ শূন্যপ্রান্তরে পরিণত হচ্ছে বহু কারখানা। এদিকে শূন্যতার ছায়া। গেটেও প্রহরী আর নেই। কার্তিকবাবুর লোকেরাই রয়েছে। বাংলোগুলোও পড়ে আছে, দরজা-জানলা খুলে নিয়ে গেছে। বাগানে জঙ্গল গজাচ্ছে। আবার শিয়ালগুলো ফিরে এসেছে। টাউনশিপের পথঘাটও ভেঙেচুরে, ফেটেফুটে গেছে। মানুষজনও আর চলে না এপথ দিয়ে।

অবিনাশবাবুও আর দেশে ফিরে যাননি। আগে তিনি অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টে কাজ করতেন। লাখ লাখ টাকার হিসাব রাখতেন। বিজন আজ অবিনাশবাবুকে ওই নতুন কারখানায় এ্যাকাউন্টস-এর কাজে রেখেছে। প্রতিমাও কাজ করে সমবায়ে, ওদের ছোট পরিবারে আবার ফিরে এসেছে নিশ্চিন্ততা। ভাঙনের পটভূমিতে ওরা আবার নতুন করে বেঁচে ওঠার চেষ্টা করে।

উইলসনও বৃদ্ধ হয়েছে। বিজনকে পেয়ে সেও খুশি। সীমাও নিশ্চিন্ত হয়। ওদের চেষ্টাতেই তার কারখানার প্রোডাকশন শুরু হয়েছে। আর তাদের মালের গুণগত মান বেড়েছে। বাজারে চাহিদাও বেড়েছে। শিয়ালডাঙার লোহা কারখানার চিমনিটা আর নেই। ওটা ভেঙে বিক্রি করা হয়ে গেছে। নতুন কারখানার চিমনি বসেছে পাহাড়তলির ওদিকে। ওই পটভূমিতে আবার নতুন কর্মযজ্ঞ শুরু হতে চলেছে। সময় থেমে থাকেনি, কাজও থেমে থাকেনি, শুধু পরিবর্তিত হয়েছে নতুন পটভূমি আর সেখানের চরিত্রগুলো।

পরিত্যক্ত কারখানার মাঠ লোকজনহীন। দোকানপাটহীন। গাছগুলোও কারা কেটে নিয়েছে, সেখানে আগাছার জঙ্গল জন্মেছে। সেখানে একটা ভাঙা পড়ে থাকা টেবিলের উপর দাঁড়িয়ে ছেঁড়া ময়লা জামা কাপড় পড়া একজন লোক নির্জন বনভূমিতে শূন্যে দুহাত তুলে চিৎকার করে।

—ভাই সব। মালিকের অত্যাচার আমরা মুখ বুজে সইব না। এর প্রতিবাদ করবই। কঠিন প্রতিবাদ।

শ্রোতা কেউ নেই। তবু কিছুক্ষণ চিৎকার করে লোকটা ক্লান্ত পদক্ষেপে চলতে থাকে।

অতীতের দোর্দণ্ডপ্রতাপ মোহনলাল আজ রোগে ভুগে সমস্ত স্মৃতি হারিয়ে উন্মাদ হয়ে গেছে। সেই ঘোরে এই পরিত্যক্ত পুরীতে। এখন দর্শক-শ্রোতা, পাত্র-মিত্র আর কেউ নেই। শুধু অদৃশ্য থেকে একজন বেদনাবিধুর চাহনিতে এ সমস্ত চেয়ে দেখে। সে ওই ম্যান সাহেবের আত্মা। পরিত্যক্ত ধ্বংসস্তূপে শোনা যায় তার দীর্ঘনিশ্বাস।

বাতাসে শূন্যতার মাঝে জাগে শুধু হাহাকার। তবু শিয়ালডাঙার যাত্রা থামেনি। নতুন পটভূমিতে তার নতুন ইতিহাস রচিত হয়ে চলেছে।

বিজন এখন খুবই ব্যস্ত। এই ব্যস্ততার অবসরেও সে তার নতুন উপন্যাসের পটভূমিকা খুঁজে পেয়েছে। এই পটভূমিকাতেই সে লিখবে বিগত কালের কাহিনি। আজ নিতাইবাবু থাকলে তাকে বলতেন একাজ করতে। আজ সেই যুগ সেই কাল সেই মানুষগুলো সব হারিয়ে গেছে। জীবনরা আজ নিজেকে পতঙ্গের মতো জ্বালিয়ে দিয়েছে। আজ মোহনলালও ফিরছে শূন্য হাতে। সীমা, বনানী, প্রতিমা এদের নিয়েই সে তার উপন্যাস লিখছে। শিয়ালডাঙার কাহিনি। অনেক হারিয়ে গেছে তবু মানুষের জীবনযাত্রার গতি থেমে যায়নি। সেই ধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে কাল থেকে মহাকালের দিকে—নিজের গতিতে গতিময় হয়ে।